প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৬, আগস্ট ১৯৫৯ প্রকাশ ক
চক্রবর্তী, অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রী
প্রচ্ছদ এঁকেছেন : শৈল চক্রবর্তী ছেপেছেন : সুশীলকুমা
প্রেস, ১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা-৬

পরশুরাম

শ্রীচরণেষু

অচেনা পাড়ায় বাড়ি খুঁজে খুঁজে
চলেছি রাত্রিবেলা—
পথে নেই আলো, আঁধার আকাশে
গহন মেঘের মেলা।
পকেটে রয়েছে ঠিকানাটা লেখা,
অক্ষর তারও যাচ্ছে না দেখা—
একটি শুভ্র আলোকের রেখা
তোমার জানালা থেকে
পড়েছিল পথে—তারই মাঝে ধ'রে
ঠিকানা নিলাম দেখে।

"সম্বুদ্ধ"

কান্তি চৌধুরী আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন।

তখন আমরা শিশু, তিনি অতি বৃদ্ধ। দীর্ঘ রৌদ্রদগ্ধ গৌরবর্ণ মূর্তি, মাথায় বিপুল টাক, উন্নত নাসিকা।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় কান্তি চৌধুরীর বৈঠকখানায় আমরা যাইতাম। কান্তি চৌধুরী গল্প বলিতেন, আমরা শুনিতাম। যৌবনে কান্তি চৌধুরী প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন। সেই শিকারের গল্পই তিনি বলিতেন। আমরা শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। মুগ্ধ না হইলে কান্তি চৌধুরী রাগ করিতেন।

কান্তি চৌধুরী মারা গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গল্প মরে নাই। আমাদের স্মৃতিতে তাহারা বাঁচিয়া আছে।

সেই গল্প দুই-একটা আপনাদের শুনাইব। যেমন শুনিয়াছি, ঠিক তেমনটিই শুনাইব।

হাতীর হিম্মৎ

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

হাতীর ওস্তাদ ছিলেন স্যাণ্ডারসন সাহেব, অমন আর হয় নি। সেই স্যাণ্ডারসন গো, ডন আর আয়েনপুরের মানুষখাকীকে যিনি মেরেছিলেন। মাইসোর রাজ স্টেটে বহু বছর চাকরি ক'রে যান। বাঙলাদেশেও চাটগাঁয়ে এসে ছিলেন কিছুকাল। সত্যকার বিচক্ষণ লোক, শিকারীর যেমনটি হ'তে হয়। শিকার ক'রে ক'রে বেড়াতে গিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের নাড়ী-নক্ষত্র বার ক'রে ফেললেন। ডাক্তাররা আজও তার খোঁজ জানে না, বলে মশায় কামড়ালে জর হয়। বইও লিখে গেছেন, বড় হ'য়ে প'ড়ো সে বই—অনেক কথা শিখতে পাবে। আমার কিন্তু উদ্ভুট্টি কপাল, সেই বইয়ের কথামত চলতে গিয়েই এমন আশ্চর্য কাণ্ড দেখেছিলাম, সে ভাবতে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

আসামের দিকে একটি ছোট্ট নেটিভ-স্টেট, তার নাম বলব না—কেন বলব না সেটা গল্প শুনলেই বুঝতেই পারবে। সেই স্টেটের একটা বড় বন ইজারা নেবার কথা হচ্ছিল। বড় সাহেব বললেন, চৌধুরী, তুমি নিজে যাও, কেমন বন, কি বৃত্তান্ত, কাঠকুটো নিয়ে আসবার কি ব্যবস্থা, সব দেখেশুনে পাকা কথা ক'য়ে এসো।

চললাম।

ছোট্ট স্টেট, কিন্তু তাই ব'লে তার অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই, আদব-কায়দা নিখুঁত, জমজমাট। রাজার বয়স তখন বছর পঁয়তাল্লিশ। দশাসই চেহারা, এককালে কুস্তিপাঞ্জা লড়েছেন দেখলেই বোঝা যায়। বিরাট দেহ, বিরাট মন। বয়সকালে প্রকাণ্ড শিকারী ছিলেন, ইদানীং বয়স বেড়ে মোটা হ'য়ে পড়েছেন, নিজে বিশেষ বেরোন না, তবু উৎসাহ

তখনও সমানই আছে। রাজ্যে মন্ত্রী সেনাপতি পাত্তর-মিত্তির কিছুরই অভাব নেই, অভাব শুধু রাজপুত্তুরের—রাজা নিঃসন্তান। যুবরাজ হচ্ছেন ছোট ভাই, এঁর পরে তিনিই গদি পাবেন। রাজাকে দেখে পছন্দ হয়েছিল, এটিকে কিন্তু প্রথম থেকে কেমন ভাল লাগল না। একটু যেন আদুরে গোপাল, একটু যেন ছিঁচকে বুদ্ধি। তায় আসাম-মণিপুর অঞ্চল, দুই ভাইকে দেখে আমার কেবলই সেই গোবিন্দমাণিক্য আর নক্ষত্ররায়ের কথা মনে পড়তে লাগল। নক্ষত্র যে আমাকেও নক্ষত্র দেখিয়ে ছাড়বেন সেটা তখন জানতাম না, তবু মনের ভেতর কি রকম কু ডাকতে লাগল। একেই বোধহয় বলে প্রিসেন্টিমেণ্ট।

সে যাক। বন-টন ঘুরে দেখতে হবে, হেড অফিসে তার রিপোর্ট পাঠিয়ে জবাব আনব তবে কথাবার্তা পাকা হবে—বেশ কিছুদিন বাসের ধাক্কা। রাজ-বাড়িরই সদরে গেস্ট-হাউস, সেইখানে বাসা দিলে, আদর-যত্নের সীমা রইল না। সেই আদর-যত্নই কাল হ'ল।

মন্ত্রী নিজে অতিথি সেবার তদারক করেন, রাজা নিজে দু'বেলা এসে খবর নিয়ে যান। বলেছি তো, রাজা হ'লেও এঁর অভিমানের বালাই ছিল না, খাঁটি ভদ্রলোক।

আর যে-ক'টি লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন দু'জন, ডাক্তার আর রেসিডেণ্ট। ডাক্তারটি আধা-সাহেব ফিরিঙ্গি। বয়স ষাটের ওপরে. কিন্তু বুড়ো নন; যেমন বুদ্ধি তেমনই পড়াশোনা। সত্যিকার রাজবৈদ্য হবার মত লোক। কাজকর্ম তো বেশী ছিল না, পড়াশোনা আর নিজের ক্লিনিকটি নিয়েই পড়ে থাকতেন ভদ্রলোক, হেন বস্তু নেই যা জানতেন না। শুধু মানুষ ব'লে নয়, জীবজন্তু, গাছপালা—সকলের সম্বন্ধেই অগাধ উৎসাহ ছিল তাঁর। তায় রাজা-রাজড়া নিয়ে কারবার, তাদের আর যাই থাক বা না-থাক ব্রেনের বালাই নেই। আমাকে পেয়ে যেন বর্তে গেলেন ভদ্রলোক। পাহাড়ে বনে কোথায় কি নতুন গাছের নতুন পাখীর সন্ধান পেয়েছেন, তাদের কার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষত্ব কি—তার অনেক গল্প

আমাকে শোনালেন। বলতে লজ্জা নেই, অনেক কথাই তার বুঝতাম না, তবু শুনতে ভাল লাগত। মনে হত, যে ডাক্তার রাজার চাকরি করছে সে যেন শুধু একটা বাইরের খোসা, তার ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে আসল মানুষটি, সে তথ্যের সন্ধানী, সাধক ঋষি।

রেসিডেণ্ট সাহেবটি খাস বিলিতী। রেসিডেণ্ট বললাম, কিন্তু আসলে বোধহয় তার পদবী ছিল পলিটিক্যাল এজেণ্ট। নেটিভ স্টেটগুলোতে একজন ক'রে রেসিডেণ্ট থাকে জান তো—স্টেট ছোট হ'লে কাছাকাছি কয়েকটা স্টেট নিয়ে একজন থাকেন, পালা ক'রে তিনি এ-স্টেটে কিছুদিন ও-স্টেটে কিছুদিন ঘুরে বেড়ান। ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি নায়েব এঁরা, বিদ্যাবুদ্ধি থাক না থাক চালটিও থাকে তেমনই। এই সাহেবটা, যার কথা বলছি, বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে এটা ছিল একটা জন্তুবিশেষ। তবু হুকুমৎ বড় তারই। অমন আত্মম্ভরী দাম্ভিক জীবনে বেশী দেখিনি। তবু আছেন যখন, না সয়ে গিয়ে উপায় নেই। মহারাজা তাকে মেনে চলতেন, চলতে তিনি বাধ্য, কিন্তু তার সঙ্গ আদৌ পছন্দ করতেন না, নেহাৎ যেটুকু নইলে নয় তার বেশী মেলামেশাও করতেন না তার সঙ্গে। সে ত্রুটি কিন্তু পুষিয়ে দিতেন তাঁর ছোট ভাই, যুবরাজ। দিনরাত সাহেবের লেজে লেজেই ঘুরছে সে, যেন সেই সাহেবের মোসাহেবি করাই তার চরম ব্রত।

আর ছিল একটি জীব, মহারাজার আদরের হাতী জমজম। অমন হাতী আর দেখব না। পাক্কা সাত হাত উঁচু, পাহাড়ের মত দেহ, সর্বাঙ্গে যেন তেল পিছলে পড়ছে। থাকতও তেমনই তোয়াজে। মহারাজার প্রিয় বাহন, তাঁর যৌবনকালের শিকারের সঙ্গী, এখন শেষ বয়সে তার যত্নের কোন দিক দিয়ে কোন ত্রুটি না হয় সেদিকে মহারাজের সারাক্ষণ দৃষ্টি। নিজে দু'বেলা হাতে ক'রে তাকে দানা খাইয়ে দিতেন, কালে-ভদ্রে মিছিলে বেরুলে তখন এই জমজমই হ'ত তাঁর বাহন, অন্য হাতীর পিঠে তিনি উঠতেন না।

বন দেখলাম, রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলাম। এখন যে ক'দিন চিঠির জবাব না পাই আমার আর কোন কাজই নেই, নির্বিকল্প ছুটি। ওরই মধ্যে একদিন কথা উঠল, শিকারে যাব।

কথাটা প্রথমে কে তুলেছিল মনে নেই, কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব একেবারে মেতে উঠলেন। আর তিনি নাচলেই সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজকেও নাচতে হবে। উদ্যোগ আয়োজনে প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলল দুজনে।

মহারাজা আমাকে বললেন, বেশ তো, আসুন একহাত খেলে। আমার বনে জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই।

আমি বললাম, খেলে আসুন মানে? আপনি?

মহারাজা বললেন, আমি যাব না।

আমি বললাম, কেন?

মহারাজা বললেন, আমি আর বেরুই না এখন। বয়স হয়েছে।

আমি বললাম, ও ব'লে আমাকে ভোলাতে পারবেন না মহারাজা, বয়স কাদের হয় আর কাদের হয় না সে আমি চিনি। আমার সোজা কথা, আপনি না গেলে আমিও যাব না।

মহারাজা বললেন, তা কেন, আপনি যান না, ওদের সঙ্গেই খেলে আসুন।

ওরা মানে যুবরাজ আর রেসিডেণ্ট। তাদের সঙ্গে হল্লা ক'রে যাওয়া আমার ধাতে পোষাবে না। অথচ একজন তাঁর ওপরওয়ালা, অন্য জন তাঁর আপন ভাই—আমি হাজার হোক বিদেশী। কথাটা বলি কি না বলি ভেবে ইতস্তত করছি এমন সময় ভগবানই বাঁচিয়ে দিলেন। রাজবাড়ীর বাইরের লনে পাইচারী করতে করতে আমরা কথা বলছিলাম, একটি লোক দূরে এসে প্রণাম করে দাঁড়াল। চিনলাম, সে জমজমের মাহুত। মহারাজা ইশারা ক'রে কাছে ডাকলেন তাকে। বললেন, কি খবর?

মাহুত প্রণাম ক'রে বললে, হুকুম হয়েছে, জমজমকে নিয়ে যেতে হবে।

মহারাজার পাইচারী থেমে গেল। বললেন, কার হুকুম ?

—সাহেবের।

—তারপর ?

—জমজম গরম হয়েছে, মস্তের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

তখন এপ্রিল মাস। প্রচণ্ড গরম। ঐ সময়টাতে মদ্দা হাতীর কানের পাশ দিয়ে চামড়ার ছোট ছোট ছ্যাঁদা বয়ে জল গড়াতে থাকে, কস্তুরীর মত তার গন্ধ। শুদ্ধ ভাষায় একে বলে মদক্ষরণ, দিশী কথায় বলে মস্ত্। হাতীর তখন গা-মাথা গরম হ'য়ে যায়, কেউ কেউ বা একেবারে ক্ষেপেও ওঠে। তখন তাদের একেবারে ঠাণ্ডায় রেখে বিশ্রাম দেওয়াই নিয়ম, নইলে বিপদ।

মহারাজা একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, সে কথা বলেছিস ?

মাহুত বললে, বলেছি।

—কি হ'ল।

—বললেন, ওসব বাজে কথা, জমজম গেলে আমার ঝামেলা বাড়বে, আমি তাই মিথ্যে বানিয়ে বলছি।

অনেককালের বুড়ো মাহুত, সাদা দাড়ি বুক অবধি ঝুলে পড়েছে। বলতে বলতে তার চোখ চকচক করে উঠল, আগুন না জল বুঝলাম না।

মহারাজার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। বললেন, আচ্ছা, যা।

মিনিট দশেক নিঃশব্দে পাইচারী ক'রতে লাগলেন তিনি। তারপর হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, চৌধুরী, তৈরি হন গে, আমিও যাব।

আমি বললাম, যাবেন ?

মহারাজা বললেন, হ্যাঁ। জমজমকে যেতে দিতেই হবে, কিন্তু ওর পিঠে আমি আর কাউকে চড়তে দেব না।

দিন তিনেক পরে শিকারের মিছিল বেরুল। জমজমের পিঠে

মহারাজা নিজে। আর এক হাতীতে রেসিডেণ্ট আর যুবরাজ। এক হাতীতে আমি,আর ডাক্তার। এ ছাড়া আরও অনেক হাতী, অনেক শিকারী। খবর এসেছে মাইল দশেক দূরের এক গ্রামে বাঘে মানুষ মেরেছে, সেই দিকেই চললাম আমরা।

গাঁয়ের পাশে মাঠ জুড়ে নলখাগড়ার বন, তারই মধ্যে বাঘের বাসা। দলবল নিয়ে আমরা যখন গিয়ে বন ঘিরে ফেললাম তখন বেলা প্রায় দুপুর হেলে গিয়েছে। মহারাজা বললেন,' দেরি নয়, জঙ্গল ভাঙাও। এইদিকে আমরা ঘাঁটি আগলাব, বীটারবা ঐদিক থেকে তাড়া দিক।

তাই হ'ল। বীটারদের রওয়ানা ক'রে দিয়ে আমরা সেমি-সার্কল হ'য়ে দাঁড়ালাম—মাঝখানে মহারাজা, তাঁব বাঁয়ে আমার হাতী, ডান-দিকে যুবরাজ আর রেসিডেণ্ট। ছোট বন, ভাঙতে সময়ও লাগল না। আমরা তৈরি হ'য়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ওদিক থেকে বীটারদের হৈ-হল্লা কানে এল ; তাবপর বোধ হয় দশটি মিনিট কাটতে না কাটতে বন চিরে বাঘ বেরিয়ে এল। একদম জমজমের সোজাসুজি।

এ রকম বড় হয় না। জঙ্গল বীট করলে বাঘ প্রথমটা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতেই চেষ্টা করে। এটা বোধহয় ক্ষেপেই ছিল। ভাবগতিক দেখেও তাই মনে হ'ল—বনের বাইরে এসেও সে থামল না, বা পালাবার চেষ্টা করল না, মাঠ পার হ'য়ে সোজা জমজমের দিকে চার্জ করল।

মহারাজা বন্দুক তুলে প্রস্তুত হ'লেন, মাহুত তাঁর নজর ছেড়ে দেবার জন্যে জমজমের মাথার উপরে উবু হ'য়ে শুয়ে পড়ল। জমজম ঝানু শিকারী, সেও শুঁড় বাগিয়ে তৈরী হ'য়ে দাঁড়াল, বাঘ এলেই তাকে জড়িয়ে ধ'রে আছাড় মারবে।

হাতীর ঠিক হাত-আষ্টেক দূরে এসে বাঘ থমকে দাঁড়াল। অদ্ভুত একটা টেন্‌শনের মুহূর্ত। বাঘ দাঁড়িয়ে ফাঁক খুঁজছে কোন্ দিক দিয়ে সে আক্রমণ করবে। হাতীও তাকে রয়েছে, এলেই তাকে ধ'রে

ফেলবে। সেই তক্কে বাঘটাকে দেখে নিলাম : মাঝারি সাইজ, অপূর্ব সতেজ চেহারা। আর চার্জ দেখে যা ভেবেছিলাম তাই—বাঘিনী।

মানুষ-জাতের এই বিশেষত্বটি বাঘেদের মধ্যেও দেখা যায়—বাঘের চাইতে বাঘিনীর ঝাঁজ বেশী, অনেক বেশী সহজে ক্ষেপে যায় তারা।

দশ সেকেণ্ডের বেশী হবে না—সেই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকেই বাঘ নীচু হ'য়ে বসে পড়ল, গুঁড়ি মেরে হাতীর দিকে এক-পা দু-পা ক'রে এগিয়ে চলল। এইবার লাফাবে। মহারাজা বন্দুক তুলে নিশানা করলেন। কিন্তু তারই মাঝে কাণ্ড যা ঘটবার ঘ'টে গেল।

ও পাশের হাতীর ওপর থেকে একেবারে জোড়া বন্দুকের শব্দ হল—দুদ্দুম! রেসিডেণ্ট আর যুবরাজ গুলী ছুঁড়েছেন।

এটা নিয়ম নয়। যার সামনে বাঘ, গুলী ছুড়বার প্রথম অধিকার তারই—এই হচ্ছে শিকারের আইন। তা-ছাড়া ওভাবে গুলী করার বিপদও আছে, গুলী আমাদের গায়ে লাগতে পারত।

তা লাগল না। কিন্তু বাঘকেও লাগল না, লাগল তার ল্যাজে। ল্যাজে খেলানো বুদ্ধি তো, কত আর হবে।

তারপর যা ঘ'টে গেল, সে মুখে ব'লে বোঝানো যায় না। চোখের পলকে কখন যে বাঘ লাফিয়ে গিয়ে জমজমের ওপরে পড়েছে সে যেন দেখতেই পেলাম না। ঠাহর যখন হ'ল তখন বাঘ হাতীর শুঁড় বেয়ে উঠে থাবার পর থাবা মেরে তার শুঁড় চোখ আর কপাল ফালাফালা ক'রে দিচ্ছে; হাতীও শুঁড় বাঁকিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। রক্তের ধারায় তখন তার দুই চোখ প্রায় অন্ধ, বারবার ক'রে বাঘের গায়ে শুঁড় পেঁচিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু বারবারই শুড় ফসকে যাচ্ছে। বাহাদুর হাতী। সমানে লড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার মুখে শব্দ নেই, পেছিয়ে যাবার চেষ্টা নেই। মহারাজা বন্দুক তুলে বসে আছেন। কিন্তু সে অবস্থায় গুলী ছোঁড়া যায় না। আমার হাতেও বন্দুক কিন্তু ছুঁড়তে পারছি না—হাতীকে লাগবার ভয়। জমজমের মাহুত শুয়ে প'ড়ে হাতী চালাবার ডাণ্ডস দিয়ে বাঘের মাথা সই ক'রে ধপাধপ বাড়ি কষাচ্ছে।

তারই একটা খোঁচা কোন গতিকে বাঘের চোখে-টোখে লেগে থাকবে, হঠাৎ ঘেঁয়াও ব'লে সে পেছনে লাফিয়ে পড়ল। তারপর বিদ্যুতের মত বেগে যুবরাজের হাতীর পাশ কাটিয়ে সোজা বনে গিয়ে ঢুকল। মানুষ চিনেছিল বলতে হবে:

সেই দিকেব শিকারীর তখন সে বাঘের ওপরে গুলী চালাবার কথা। কিন্তু যারা চালাবে তারা কোথায়? যুবরাজ তখন ভয়ে আড়ষ্ট। রেসিডেন্টের হাতের বন্দুক খ'সে প'ড়ে গেছে। তবু হাজার হোক সাহেব-বাচ্চা, উপস্থিত বুদ্ধিটা বজায় ছিল। বাঘকে আসতে দেখে আঁউ-আঁউ-আঁউ ক'রে এমন একখানা বিকট আওয়াজ ছাড়লে, সে বিষম আওয়াজ শুধু খাস বিলিতি গলা থেকেই বেরোনো সম্ভব— বাঙালীর চোদ্দপুরুষে অমন হাঁক ছাড়তে জানে না। মানুষের আর্তনাদ তো নয়, যেন বি. এন. আরের ইঞ্জিনের বাঁশি।

জমজমের দুই চোখ তখন প্রায় অন্ধ। সেই বিকট চীৎকার শুনে তারও কি হল কে জানে। হঠাৎ সে হাঁক দিয়ে লাফিয়ে উঠল, তারপর আচমকা পেছন ফিবে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগালে। মাহুত তাকে সামলাতে পারে না। বিপদ বুঝে মহাবাজ হাওদা থেকে লাফিয়ে পড়লেন। আমি আমার হাতীতে তাঁকে তুলে নিয়ে জমজমের পিছনে ছুটলাম। খানিক দূব এসে তার মাহুতকে পাওয়া গেল, পথের ধারে মাটিতে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে, রাস্তার ওপরে গাছের ডাল ঝুঁকে ছিল, তাইতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছে। মাথায় পাগড়ি ছিল ব'লে তাই রক্ষা, নইলে মাথা ফেটে চৌচির হ'য়ে যেত।

একটু সুস্থির হ'য়ে মহারাজা বললেন, বাঘ কোন্ দিকে গেল?

ডাক্তার বললেন, বাঘ আজ আর থাক। এবার সোজা বাড়ি।

মহারাজা বললেন, হাতী?

মাহুতের তখন জ্ঞান হয়েছে। বললে, দৌড়ে তাকে ধরা যাবে না। তার জন্যে ভাবনা নেই, সে ঠিক ঘরে ফিরে যাবে।

তাই হল। রাজবাড়িতে পৌঁছে খবর পেলাম, জমজম তার

খানিক আগে একাই ফিরে এসেছে, সোজা গিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকেছে। মহারাজা বললেন, ডাক্তার, চল আগে তাকেই দেখে আসি।

গিয়ে দেখলাম, ঘরের একেবারে পেছনের দিকে অন্ধকার কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। তখনও সে হাঁপাচ্ছে, তখনও তার কপাল বেয়ে শুঁড় বেয়ে রক্তের ধারা গড়াচ্ছে।

মহারাজা কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত রাখলেন, আদরের সুরে ডাকলেন, বাহাদুর!

ডাক শুনে জমজম চমকে উঠল, তারপব তার দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

ডাক্তার দেখে শুনে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

পাঁচ-ছদিন পরে ডাক্তার বিষণ্ণ মুখে এসে দাঁড়ালেন : হাতীর ঘা প'চে উঠেছে। বাঘেরা কাঁচা মাংস পচা মাংস খায়, দাঁত মাজে না— তাদের কামড় তাই প্রায়ই সেপটিক হয়ে ওঠে। তার ওপর জমজমের তখন মস্ত্ অবস্থা, শরীর গরম।

মহারাজা বললেন, তারপব?

ডাক্তাব মাথা নেড়ে বললেন, বাঁচাতে পারব না। গ্যাংগ্রিনের লক্ষণ টের পাচ্ছি।

মহারাজা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, ক'দিন?

ডাক্তার বললেন, তা বলা যায় না। অন্তত পনেরো দিন তো বটেই। এক মাসও হ'তে পারে।

মহারাজা বললেন, খুব কষ্ট পাবে?

ডাক্তার বললেন, তা তো পাবেই। যত দিন যাবে যন্ত্রণা ততই বাড়বে।

মহারাজা আবার চুপ ক'রে রইলেন। ডাক্তার বললেন, আপনার যদি ইচ্ছে হয়, কলকাতা থেকে অন্য ডাক্তার ডাকান। হয়তো তাঁরা এসে সামলাতে পারবে।

মহারাজা নড়ে চড়ে সোজা হ'য়ে বসলেন। বললেন, কেউ পারবে না ডাক্তার। তুমি যদি না পার তবে আর কেউই পারবে না। তোমার চেয়ে বেশী আপন ভেবে ওর চিকিৎসা কে করবে তার নাম জান ?

ডাক্তার বললেন, তবু তো এমন হ'তে পারে, আমার যেটা জানা নেই—

মহারাজা অধীর হয়ে বললেন. না না না! আমার বাবার আমলের ডাক্তার তুমি, তোমাকে ছেড়ে করে আমরা অন্যকে ডেকেছি ? যাও এখন, যা পার গিয়ে ক'রে দেখ।

তার পরের দিন রাত্রে হাতীর চীৎকারে আর কাতরানিতে একটুও ঘুমোতে পারলাম না। দুপুর রাত্রে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলাম, দীর্ঘ একটি দেহ দুই হাত পেছনে ক'রে লনের ওপর ধীরে ধীরে পাইচারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। মহারাজা। সমস্ত রাত হাতীর চীৎকার চলল, সমস্তটি রাত মহারাজা তেমনিভাবে পাইচারী ক'রে কাটালেন।

ভোরবেলাই ডাক্তারকে ডাকালেন। বললেন, কি দেখলে ?

ডাক্তার বললেন, ম্যাগট হয়েছে।

মহারাজা নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, ব্যস, মেরে ফেল এবার। আর কষ্ট দিও না।

ডাক্তার কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

মহারাজা বললেন, কিন্তু একটি কথা, বিষ নয়। আমার বাবা ওর পিঠে ব'সে শিকার খেলেছেন, আমি খেলেছি। শিকারীর মৃত্যু বীরের মৃত্যু, তা থেকে ওকে বঞ্চিত ক'রো না। গুলী করে মার।

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বললেন, তাই হবে।

বললেন, কিন্তু মারে কে। যাকে তাকে দিয়ে জমজমকে আঘাত করানো চলবে না। মহারাজা বললেন, আমি নিজেই মারতাম, ওর প্রতি আমার সেই হ'ত শেষ কর্তব্য। কিন্তু আমি পারব না। চৌধুরী, আমার এই উপকারটি ক'রে দেবেন ?

আমি বললাম, মাপ করবেন মহারাজা। আমি শিকারী, জহ্লাদ নই।

মহারাজা বললেন, ডাক্তার, তুমি?

ডাক্তার বললেন, না। ও আমার ত্রিশ বছরের বন্ধু।

বলতে বলতে অমন শান্ত মানুষ, তাঁরও চোখ হঠাৎ জ্ব'লে উঠল। বললেন, তার জন্যে ভাববেন না মহারাজ। বাঁধা জানোয়ারকে মারতে লজ্জা পাবে না, বরং তারই ছবি তুলে বৌকে পাঠিয়ে দেবে, এমন বীরপুরুষের খোঁজ আমি জানি। তার জন্যেই এর আরম্ভ হয়েছে, এর শেষও সেই করুক।

তাই ঠিক হ'ল, রেসিডেণ্টই হাতীকে মারবেন।

রাজবাড়ি থেকে অনেক দূরে, মাঠের মধ্যে হাতীকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। মহারাজা নিজের হাতে শেষবার আদর ক'রে খাবার খাইয়ে তাকে বিদায় দিলেন, সঙ্গে এলেন না। সঙ্গে চললেন যুবরাজ, রেসিডেণ্ট আর ডাক্তার, আর রইলাম আমি। বুড়ো মাহুতও এল না, অন্য মাহুতরা দড়ি ধ'রে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল।

পথ থেকে দূরে ছোট্ট একটি মাঠ, তার চারদিকে পাহাড় আর বন। সেই মাঠের মাঝখানে হাতীকে এনে দাঁড় করানো হ'ল। রেসিডেণ্ট সেজেগুজে এসেছেন, হাতে হাতী-মারা ভারী বন্দুক। তাঁর সেদিন সাজের বাহার দেখে কে। অতবড় হাতীকে মারবেন, মেরে তার ফোটো তুলে দেশে পাঠিয়ে দেবেন, বিলেতের কাগজে দু'জনের ফোটো উঠে যাবে—মহাবীর শিকারী। হাতীর পায়ের শিকলটা ফোটোতে না উঠলেই হ'ল।

সেই রোগে জরজর হাতী, তাইতেই কর্তার তম্বি কত! বললেন, ডাক্তার, ওকে বেঁধে দাও, যদি গায়েই এসে পড়ে?

ডাক্তার বললেন, তাও বটে, আর ওর যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই।

মাঠের মাঝখানে খোঁটা পুঁতে হাতীর চার পা চারটি খোঁটায় বেঁধে দেওয়া হ'ল। ডাক্তার আমাকে বললেন, চৌধুরী, একটি অনুরোধ

আমি আপনাকে করব—হাতীর ভাইটাল স্পটটি আপনি দাগ দিয়ে চিনিয়ে দিন, ও ব্যাটার কাণ্ডজ্ঞানের ওপরে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই।

আমি বললাম, বেশ।

হাতীর গায়ে মই লাগিয়ে আমি তার পিঠে গিয়ে উঠলাম। দুই চোখ বরাবর লাইন টেনে, তার মাঝখান থেকে খাড়া তিন ইঞ্চি ওপরে হচ্ছে হাতীর ভাইটাল স্পট, সামনে থেকে গুলী এইখানে বিঁধলে একদম মগজে গিয়ে পৌঁছয়। এটা স্যাণ্ডাবসনের মাপ।

জায়গাটি ঠিক ক'রে নিয়ে, তার চারদিক ঘিরে দেড় ইঞ্চি প্রমাণ একটি সার্কল আমি চক দিয়ে হাতীর কপালে এঁকে দিলাম। নেমে এসে রেসিডেণ্টকে বললাম, এবার মার গুলী, ঠিক ঐ সার্কলের মাঝখানে।

সায়েব দুই পা ফাঁক ক'রে বন্দুক নিয়ে দাঁড়াল, আধঘণ্টা ধরে নিশানা করল, তারপর গুলী ছুঁড়ল।

বইয়ের কথামত হাতীর তখন ধপ করে ম'রে পড়ে যাবার কথা। তা কিন্তু সে গেল না, চীৎকার ক'রে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। সেই লাফের চোটে তার পায়ের শেকল-টেকল সব খোঁটা উপড়ে ছিঁড়ে চ'লে এল। হাতী আর দাঁড়াল না। রাঙা টকটকে দুই চোখে চারদিকে একবার চেয়ে দেখল, তারপর এক দৌড়ে পাহাড়ের তলাকার বনে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

ডাক্তার কপালের ঘাম মুছে বললেন, ঢের হয়েছে চৌধুরী, আর নয়। চল এবার বাড়ি ফিরে যাই।

আমি বললাম, হাতী?

ডাক্তার বললেন, ও থাক। বনের ছেলে বনের কোলে ফিরে গেছে, সেখানে হয়তো মরণটা অন্তত শান্তিতে হবে ওর। আর ওকে ঘাঁটাব না।

আমি বললাম, কিন্তু মহারাজা?

ডাক্তার বললেন, তাঁকে যা বলবার সে আমিই বলব'খন। তুমি চল, আর দেরি ক'রো না।

তাগাদার কারণ বুঝলাম, উজবুকটার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে চাইছেন না। সে তখন কাতর মুখে তার ক্যামেরা মুড়ে গাড়িতে তুলছে। আমরা দু'জনে হেঁটে চ'লে এলাম।

চার-পাঁচদিন কেটে গেল, হাতীর নাম নিয়ে আর কোন আলোচনা নেই। তাবপর একদিন রাত্রে ডাক্তার হঠাৎ আমার ঘরে এলেন। বললেন, চৌধুরী, খবব আছে।

বললাম, পাওয়া গেছে তাকে ?

ডাক্তার বললেন, তাকে পাইনি, তার খবর পেয়েছি। মানুষ মেবেছে।

—সে কি! কোথায় ?

ডাক্তাব বললেন, দেখবে চল।

বাজবাডিব বাইরে ছোট্ট হাসপাতাল, সেইখানে নিয়ে ডাক্তার লাস দেখালেন। একটা জোয়ান পুরুষ, তাকে দ'লে পিষে একেবারে পিণ্ড বানিয়ে ফেলেছে, মানুষের দেহ ব'লে চেনা যায় না। বনের পথে প'ড়ে ছিল, হাটুবে লোক দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

আমি বললাম, কিন্তু এ যে তারই কাজ, তা বুঝলেন কি করে ? তাকে কেউ দেখেছে ?

ডাক্তাব বললেন, না। আমাব অনুমান।

—এমন অনুমানের হেতু ?

ডাক্তার বললেন, আছে, সে তোমাকে এখনও বলব না। তবে আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তবে আশ্চর্য ব্যাপার।

—কি ?

—বলেছি তো এখনও বলব না। আরও কিছুদিন দেখে নিই।

—তার মানে, আরও মানুষ মারবে সে ?

—যদি মারে তবেই বুঝব আমার অনুমান ভুল নয়।

এরপর উপর্যোপরি সাত-আট দিনের মধ্যে প্রায় দশ-বারোটা লোক হাতীর হাতে মারা পড়ল। প্রত্যেক বারেই ডাক্তার আমাকে ডেকে নিয়ে দেহ দেখালেন : সেই একই ব্যাপার, দেহটাকে দ'লে পিষে একেবারে পিণ্ড বানিয়ে ছেড়েছে। আমি বললাম, মানুষের ওপরেই জাতক্রোধ হয়ে গেছে ওর। মেরে মেরে যেন গায়ের জ্বালা মিটছে না।

ডাক্তার বললেন, সে তো হবারই কথা—মানুষের বুদ্ধি আর বিবেচনার যে বিলিতী স্যাম্পল দেখে গেছে! কিন্তু আমি শুধু তাই ভাবছি না, ভাবছি প্রকৃতির কি অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পেলাম এর মধ্যে!

আমি বললাম, কি আবার রহস্য?

ডাক্তার বললেন, তোমারও চোখে পড়ে নি? আশ্চর্য। আচ্ছা, একটুখানি ইঙ্গিত আমি তোমাকে দিচ্ছি। যে লাসগুলো এসেছে তাদের দেখেছ ভাল ক'রে?

আমি বললাম, ভাল ক'রে মন্দ ক'রে জানি না, দেখেছি।

—বিশেষত্ব কিছু লক্ষ্য করেছ?

—বিশেষত্ব আর কি। অত্যন্ত একটা উন্মত্ত আক্রোশ সে মিটিয়েছে এদের ওপর দিয়ে, মৃতদেহগুলোকে পর্যন্ত থেঁতলে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে, এই যা। সেই কথাই তো বলছিলাম, লোকজনকে সতর্ক ক'রে দেওয়া উচিত, যেন এর সামনে না প'ড়ে যায়।

ডাক্তার বললেন, সে করা হ'য়ে গেছে। চারদিকে বিশ মাইল অবধি ঢেঁড়া দেওয়া হয়েছে, যেন মানুষ সাবধানে চলাফেরা করে—লোকজন যাতায়াতের পথের ওপরেই এর রোখ, পথের মধ্যে কাউকে একা পেলে আর রক্ষে নেই। তোমাকেও কিন্তু সতর্ক ক'রে দিচ্ছি আমি—একা একা কক্ষণো বেড়াতে বেরিয়ো না, দিনের বেলাও নয়।

আমি বললাম, আমি তো রাজবাড়ি থেকে দূরে যাই না।

ডাক্তার বললেন, নাই বা হ'ল, কাছে আসতেই বা তার কতক্ষণ। এ তো তারই পুরোনো বাড়ি, এর অন্ধিসন্ধি সবই সে চেনে।

পরদিন সকালবেলা ডাক্তার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আবার লাস এসেছে। আমাকে কিন্তু তিনি লাসের কাছে নিয়ে গেলেন না সেদিন, নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বারান্দায় জনকতক বুনো লোক বসে ছিল, তাদের একজনকে ঘরে ডেকে নিয়ে এলেন। বললেন, এরাই এনেছে। এরা কি বলে শোন। বল হে, বাবুকে বল, কি রকম করে ওকে মারল হাতী।

আমি বললাম, তার মানে? ওরা মারতে দেখেছে?

সে লোকটা বললে, হ্যাঁ হুজুর। আমাদেরই দলের লোক, হাটে যাচ্ছিলাম আমরা।

—তারপর?

—পাহাড়ের ওপর দিয়ে পথ, সেই পথে সার বেঁধে আমরা আসছি। হাতী কখন আমাদের পিছু নিয়েছে জানি না, পেছন থেকে এমন চুপে চুপে চ'লে এসেছে কেউ কিচ্ছু টের পাই নি। সব-পেছনে ছিল ঐ লোকটা, একেবারে এসে তাকে ধ'রে ফেলেছে।

—তারপর?

—তারপরই হুজুর অবাক কাণ্ড। হাতী মানুষ মারে পায়ের তলায় ফেলে বা শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মেরে। এ হাতী তা করলে না, চিবিয়ে খেয়ে ফেললে মানুষটাকে।

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম, তার মানে?

সে বললে, তার মানে তাই। শুঁড়ে ধ'রে ধ'রে লোকটাকে মুখে পুরে চিবোতে লাগল, চিবিয়ে চিবিয়ে সর্বাঙ্গ থ্যাঁতলা ক'রে দিয়ে, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। আমরা তখন দৌড়ে ছিটকে যে যেখানে পেরেছি লুকিয়ে পড়েছি। সেইখান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম।

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা, তুমি যাও। লোকটা বাইরে গিয়ে

বসল। ডাক্তার বললেন, বুঝলে কিছু ?

আমি বললাম, কি এ ? ইনস্যানিটি ?

ডাক্তার বললেন, বলতে পার। কিন্তু খবরদার, একা একা কক্ষণো বেরিয়ো না।

ডাক্তার তো বললেন বেরিয়ো না ; কিন্তু আমার মাথায় তখন ভূত চেপেছে। নিজের ঘরে ফিরে এসে, ব'সে ব'সে তাই ভাবতে লাগলাম। রুগ্ন আহত হাতীকে আমি মারতে চাই নি, সেটা হ'ত জহ্লাদবৃত্তি। কিন্তু এখন ? এই হিংস্র উন্মত্ত হাতী মানুষের শত্রু ; একে যেভাবে হোক মারায় পাপ নেই। আর এমন অস্বাভাবিকভাবে মানুষকে আক্রমণ করছে, তাই থেকেই বোঝা যায়, সে আর প্রকৃতিস্থ নেই, সে জমজম নেই। তবে ? আমার মন স্থির হ'য়ে গেল। যে করেই হোক এই হাতীকে আমি মারব—শিকারী হিসাবে সেটা হবে আমার সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন।

সেইদিনই বিকালে আমি ডাক্তারকে কথাটা বললাম। ডাক্তার বললেন, একে এখন মারাই দরকার। কিন্তু মারবে কি করে ?

আমি বললাম, ফাঁদ পাতলে হয় না ?

ডাক্তার বললেন, অনেক চেষ্টা হয়েছে। গর্ত খুঁড়ে, বিষাক্ত খাবার রেখে, বিষাণ পেতে—আয়োজনের ত্রুটি হচ্ছে না। কিন্তু সকল ব্যাপারেই এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছে যে, ধূর্তামিতে তাকে এঁটে উঠতেই কেউ পারছে না।

আমি বললাম, কেউই পারছে না, এও কি একটা কথা ?

ডাক্তার আমার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, তুমি কি ফন্দি এঁটেছ আমি বুঝেছি। ওসব মতলব ছাড়, বিদেশী মানুষ, কেন বিপদে পড়বে !

আমি আর কথা না ব'লে চ'লে এলাম।

আমার ফন্দিটা ডাক্তার ঠিকই আঁচ করেছিলেন।

ফন্দি আর কিছু নয়, শিকারের লোভ দেখিয়ে তাকে ধরা। খাবারের লোভে সে না আসতে পারে, কিন্তু মানুষ মারবার যার এত বড় বোখ মানুষ দেখলে সে লোভ সামলাতে পারবে না। আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম, নিজেই তার বেট হব, বন্দুক নিয়ে একা-একা বনের পথে ঘুবে বেড়াব, দেখি কেমন সে দেখা না দিয়ে পাবে।

রাজবাড়ির বাইবের মহলে আমার ঘর, কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে যাওয়া আমাব পক্ষে শক্ত নয়। গেলামও ত'াই। একদিন, দু'দিন, তিনদিন। একা একা বনেব পথে পাহাড়ের পথে ঘুবে বেড়াই, চারদিকে নজর রেখে রেখে চলি। কিন্তু হাতীও যেন আমাব ফন্দি আঁচ কবে ফেলেছিল, আমি আর কিছুতেই তার দেখা পাইনে। অথচ তখনও সে ঠিক মানুষ মেবে চলেছে—কখনও বাজবাড়ির কাছে, কখনও বা দূবে। দেখে শুনে মনে হ'ল, ধুত্তোব, এ পাজি হাতীকে সত্যিই এঁটে ওঠা গেল না। কি হবে, আর বন্দুক নিয়ে বেরোব না, পণ্ডশ্রম।

কিন্তু মজা এই, বন্দুক না নিয়ে যেদিন প্রথম বেরোলাম সেইদিনই হাতীও দেখা দিলে।

রাজবাড়ির ঠিক সামনেই মস্ত বড় একটা টিলা, তার ওপর দিয়ে পথ বেঁকে গিয়েছে। টিলাব ওপরে গাছপালা, মহারাজার যত্নে সে বন প্রায় বাগানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নানারকম ফুলের আর পাতা-বাহারের লতা মহারাজা সেখানে এনে লাগিয়েছিলেন, এটা তাঁর বেড়াবার স্থান। আমবাও যেতাম।

সেদিন বিকেলবেলা মহারাজা, ডাক্তার, আমি, আরও কয়েকজন সবাই মিলে সেইখানে বেড়াচ্ছি। বেড়ানো শেষ হ'য়ে এল, মহারাজা বললেন, চলুন, ফিরে যাই।

ফেরার পথে ডাক্তারের হঠাৎ চোখে পড়ল, টিলার মাথায় কি-একটা নূতন রকমের অর্কিড ফুটে রয়েছে। ডাক্তারের এসব ব্যাপারে অসম্ভব শখ ছিল, বলেছি। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, আপনারা

এগোন, আমি ঐ ফুলটা পেড়ে নিয়ে আসছি। অন্য সবাই এগিয়ে গেলেন। ডাক্তার পাহাড় বেয়ে উঠে গেলেন, আমি পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দু'মিনিটও হয় নি, হঠাৎ পেছন থেকে বিষম একটা দুর্গন্ধ আমার নাকে এল—গ্যাংগ্রিনের পচা গন্ধ। চমকে পেছন ফিরে তাকিয়েই আমার চক্ষুস্থির! হাতী—তখন সে আমার চেয়ে জোর পঞ্চাশ হাত মাত্র দূরে।

হাত খালি, দৌড়ে পালাবার তখন পথও নেই, সময়ও নেই। মৃত্যু আসন্ন বুঝে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে হাতীর দিকেই তাকিয়ে রইলাম। তাকিয়েই কিন্তু একটি অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। হাতী আমার দিকে এগিয়ে আসছে, কিন্তু হেঁটে বা দৌড়ে নয়। মাটির ওপরে শুঁড়ি মেরে বসেছে সে, ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে, ঠিক বেড়াল যেমন ক'রে ইঁদুরের দিকে এগোয়। শুঁড়টাকে লম্বা ক'রে সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, নাগালে পেলেই আমাকে খপ্ ক'রে ধ'রে ফেলবে।

তার সেই অদ্ভুত চলার রকম দেখেই বিদ্যুতের মত একটা কথা আমার মনে হ'ল : এইভাবে এসে আমার কাছে পৌঁছতে ওর অন্তত পাঁচ মিনিট সময় লাগবে—সেই পাঁচ মিনিট আমার অবসর—এর মধ্যে যদি কোনক্রমে পালাতে পারি। শুনে বোলো না কান্তি চৌধুরী পালাচ্ছে—তখন পালানো ছাড়া উপায় ছিল না। আর দেরি করলাম না, সোজা সামনের খাড়া পাহাড় বেয়ে দৌড়ে উঠে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ওপর থেকে ডাক্তারও চীৎকার ক'রে উঠলেন।

আমি তখন ছ' সাত হাত উঁচুতে উঠে গেছি। ডাক্তারের চীৎকার শুনে দৌড়তে দৌড়তেই চেয়ে দেখতে গেলাম তিনি কত দূরে—সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে এক আছাড়। গড়িয়ে যদি পড়ি তো পড়ব একেবারে হাতীর মুখে। মরিয়া হয়ে অন্ধের মত হাত বাড়াতেই দড়ির মত কি একটা হাতে ঠেকল—প্রাণের দায়ে সেটাকেই মুঠো ক'রে ধরলাম।

একটা ফুলের লতা—গাছ থেকে এরা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে, গুড়ুচীর মত। আমি ধরতেই আমার ওজনে আর পড়ার ঝাঁকুনিতে সেটা আমাকে সুদ্ধ দোল খেয়ে দূরে সরে গেল, আবার ফিরে এসে আমাকে পাহাড়ের গায়ে এনে ফেললে, আমি পা বাড়িয়ে ধাক্কা সামলালাম।

টার্জানের ছবি দেখেছ? আমার তখন সেই অবস্থা। ঝুলতে ঝুলতেই চট্ করে মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। শিকার ফস্‌কে যায় দেখে হাতী তখন লাফ দিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে পায়ের ধাক্কা মেরে আমি দোল খেয়ে সরে গেলাম। আবার দোল খেয়ে ফিরে এলাম। হাতী ইতিমধ্যে আমি যেখানটাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেইখানে এসে পড়েছে—তার একদিকে পাহাড় অন্যদিকে ঢালু, যাকে বলে খড্। লাফের ঝোঁকে হাতী এসে সেই খডের কিনারায় পড়ল। আমিও ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে দোল খেয়ে এসে তাকে ঠেলা মারলাম—ঝোঁক সামলাতে না পেরে হাতী উলটে খডের মধ্যে প'ড়ে গেল।

লতা ছেড়ে দিয়ে আমি পথের ওপরে নেমে পড়লাম—আমার তখন সর্বাঙ্গে কালঘাম দেখা দিয়েছে, মাথা ঘুরছে। ডাক্তারও ততক্ষণ দৌড়ে নেমে এসেছেন। চটপট হাত চালিয়ে আমার জামার বোতাম তিনি খুলে দিলেন, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিয়ে বললেন, বিশ্রাম কর। It's a miracle I saw!

আমি বললাম, miracle কিছুই নেই ডাক্তার, ওটা নেহাৎ প্রাণের দায়ে করা।

ডাক্তার বললেন, তোমার কথা বলিনি আমি, বলেছি অন্য জিনিসের কথা। বসে থাক।

বলে তিনি খডের কিনারায় গিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে হাতীকে দেখতে লাগলেন। আমিও উঠে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচের মাঠে হাতী তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে, নিশ্চল মৃতদেহ।

ডাক্তার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

বললেন, চৌধুরী, আমার একটি কথা রাখবে?

বললাম, বলুন।

ডাক্তার বললেন, এর কথা এখনই কাউকে বলবে না—ধর ঘণ্টাখানেক। আর আমি এখন যা করব তাও কাউকে বলবে না। রাজি?

বললাম, রাজি।

ডাক্তার বললেন, তুমি এখন কেমন বোধ করছ, quite fit?

বললাম, হ্যাঁ।

—তাহ'লে এইখানেই একটু থাক তুমি, এখন আর ভয় নেই। আমি আসছি।

ডাক্তার প্রায় দৌড়েই চলে গেলেন। আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন। তাঁর হাতে মস্ত বড় একটা ব্যাগ। আমাকে টেনে নিয়ে বললেন, চল।

হাতীর কাছে গিয়ে দু'জনে বসলাম। ডাক্তার ব্যাগ খুলে ছুরি-কাটালি বার করলেন। বললেন, ওর ব্রেনটা আমি নেব। মহারাজ যদি জানতে পান তবে আমার মুণ্ডু নেবেন, তাই তোমাকে সতর্ক করা। বুঝেছ?

বললাম, হ্যাঁ।

চটপট হাত চালিয়ে হাতীর মাথা ডাক্তার ফেড়ে ফেললেন, মস্তিষ্কটাকে আস্ত বার ক'রে নিয়ে বোতলে পুরলেন। তারপর আবার মাথাটাকে শেলাই করে জুড়ে দিলেন, যেন হঠাৎ কারো নজরে না পড়ে। বললেন, আজকের রাতটা যাক, শেয়ালে আর নেকড়ে বাঘেই সব চিহ্ন লোপ ক'রে দেবে।

ব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে আমরা যখন বাড়ি এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়েছে।

রাত দুপুরে ডাক্তার এসে আমাকে ডাকলেন, চৌধুরী, দেখবে এস।

গিয়ে দেখি, হাতীর মগজটিকে তিনি টেবিলে সাজিয়ে রেখেছেন। মগজের পেশীর ভাঁজ আর পাকগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা বই থেকে ছবি বার করে বললেন, এই দেখ হাতীর ব্রেনের চার্ট।

আমি তুটোকে মিলিয়ে দেখলাম। দেখে বললাম, এক রকম তো নয়!

ডাক্তার বললেন, নয় তো? এবার এইটে দেখ।

আবেকটা ছবির পাতা তিনি খুলে দিলেন—তার সঙ্গে মগজটার ভাঁজেব মিল অনেক বেশী।

বললেন, এটা কিসেব ব্রেন জান? বাঘের।

—এও কি সম্ভব? বললাম, বলতে চান এই হাতীটার মগজ—

—হ্যাঁ, বদলে বাঘের মগজ হ'যে যাচ্ছিল। ভাল হ'য়ে বোসো, বলছি।

তারপর ডাক্তাব যা বললেন আমাকে, সে অদ্ভুত কথা। শুনেছিলাম, কিন্তু আজও যেন বিশ্বাস হয় না। বললেন, প্রথম দিনের মৃতদেহটা দেখেই আমার মনে খট্‌কা লেগেছিল। তার গায়ে দাঁতের দাগ। হাতী কামড়ে মানুষ মারবে কেন?

তারপর যত দিন যেতে লাগল, ততই সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি—এ হাতী কামড়েই মানুষ মারছে। যে সন্দেহ আমার মনে দেখা দিয়েছিল, তার স্থির প্রমাণ পেলাম আজ, যখন দেখলাম সে ঠিক বাঘের মত আড়ি পেতে তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছে।

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, কিন্তু এমন হবার হেতু?

ডাক্তার বললেন, প্রকৃতির সকল রহস্য মানুষের আজও জানা নেই। কিন্তু খানিকটা এর আমি আন্দাজ করতে পারি।

ক্ষ্যাপা কুকুর শেয়ালে কামড়ালে মানুষ ক্ষেপে যায়, ঠিক সেই জীবের মত করে ডাকতে থাকে, জান? তার ধারণা হয়, সে ঠিক সেই জানোয়ার হ'য়ে গেছে। একে বলা যায় obsession বা suggestion

reflex। জলাতঙ্কও তাই—জল দেখে ভয় পায় না রোগী, পায়, যাতে ছায়া পড়তে পারে এমন যে-কোন জিনিস দেখে—কারণ সে ছায়াতে সে সেই জানোয়ারের ছবি দেখতে পাবে, এই তার আতঙ্ক। তোমাদের সুশ্রুত একে দর্পণাতঙ্ক বলেছেন, সেইটেই খাঁটি কথা। তেলাপোকা-কাঁচপোকার গল্প শুনেছ? কাঁচপোকা যখন তেলাপোকাকে ধরে, আতঙ্কে তেলাপোকার চেহারা বদলে কাঁচপোকার মত হ'য়ে যায়।

এই জমজম চিরদিন বাঘ শিকার করেছে, কখনও হারে নি। বৃদ্ধ বয়সে এই তার প্রথম হার, প্রথম মার খাওয়া। তার ওপর সাহেবের সেই চাৎকার। সবসুদ্ধ একটা বিষম আতঙ্কে সে বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিল। বাকিটা ঘটিয়েছে রেসিডেণ্টের বন্দুকের গুলী। গুলীটা ব্রেনে ঢোকে নি, কিন্তু ব্রেনকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়েছে, তার শৃঙ্খলা বদলে দিয়ে গেছে।

আমি বললাম, ডাক্তার, এ আপনার বিদ্যে, আমার কথা বলার সাধ্যি নেই। কিন্তু আমার যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

ডাক্তার বললেন, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমার কথা, চল্লিশ বছর আগে তোমাদের বাঙলা দেশেই এই তথ্যের আমি সন্ধান পেয়েছিলাম। ভাগ্যের বলে এই জীবনেই তার চরম প্রমাণ পেয়ে গেলাম—I am satisfied।

আমি বললাম, বাঙলা দেশে কি পেলেন?

ডাক্তার বললেন, আমি তখন কলেজের ছাত্র। ঈস্ট বেঙ্গলের এক জায়গাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক অদ্ভুত গল্প শুনলাম—একজনদের গর্ভিণী গাইকে বাঘে ধরেছিল, বাঘ তাড়িয়ে গাইকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে। কিছুদিন পরে তার বাছুর হ'ল, বাছুরের গায়ে অবিকল বাঘের রং। সে বাছুর বাঁচেনি। বাঁচবার কথাও নয়। কিন্তু কেন এটা হয়েছিল, বলতে পার? আতঙ্কগ্রস্ত গাই সারাক্ষণ সেই বাঘের কথাই ভেবেছে। এইজন্যেই বোধহয়

তোমাদের শাস্ত্রে নিয়ম আছে, গর্ভিণীর ঘরে ঠাকুর-দেবতার ছবি রাখতে হবে। খুব ভাল নিয়ম।

আমরা বলিলাম, তারপর ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, তারপর আবার কি ? পরদিন হাতীকে খুঁজে পাওয়া গেল, ধূমধাম ক'রে গোর দেওয়া হ'ল, রেসিডেণ্ট সাহেব তিন বোতল মদ ব্রাহ্মণ ভোজনে উড়িয়ে দিলেন।

পাইথনের প্যাঁচ

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

একটা কথা তোমাদের পুঁথিপত্তরে খুব দেখতে পাই—অমুক মেকারের আর অমুক বোরের বন্দুকটা ছিল ব'লে তাই—একটা গুলি ছুড়লাম আর বাঘটা দুম ক'রে প'ড়ে ম'রে গেল।

শুনে হাসিও পায়, রাগও ধরে। আরে বাপু, খালি বন্দুকের জোরেই যদি বাঘ মরত, তাহ'লে পৃথিবীর সেরা শিকারী হ'ত বন্দুক কোম্পানীর বড়সায়েবরা। এই তো আমিও রয়েছি কান্তি চৌধুরী, আর আমি যে বন্দুক দিয়ে শিকার করি তারও মতন হাজার গণ্ডা বন্দুক হাজার গণ্ডা মানুষের ঘরে ঘরে ঝুলছে। কই, খুঁজে বার কর দিকিনি আর-একটা কান্তি চৌধুরীকে, বুঝি মুরোদ। বাঘরা কি ভাবে, গুলি খাবার আগে ডেকে শুধিয়ে নেয়—কোন্ কোম্পানীর বন্দুক গো, কত সাইজের গুলি? তারপর সাব্যস্ত করে আজ মরা যেতে পারে কি পারে না?

আসল কথা, বাঘ বন্দুকের মেকার দেখেও মরে না, বোর মেপেও মরে না—বাঘ মরে গুলি খেয়ে। সে গুলির পেছনে থাকে মানুষের হাত আর চোখ, আর থাকে তার কপাল। কান্তি চৌধুরী হবার কপাল যার থাকে সে কান্তি চৌধুরী হয়, যার থাকে না সে হয় না, এই হচ্ছে সোজা কথা, ব্যস্।

কপাল বললাম, তাই ব'লে ভেবো না পুরুষকার ব'লে কিছু নেই। আসলে ঐটেই বড় কথা; কপালের পেছনে থাকেন যিনি, তাঁর নাম ব্রেন। এই ব্রেন যার আছে সে-ই যা করবার ক'রে নেয়, নেই যাদের তারা ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখে আর বুক চাপড়ায়।

কপাল আমাকে একখানা দিয়েছেন ভগবান ঠিকই ; কিন্তু ব্রেনটিও নেহাৎ ফ্যালনা দেন নি। এ কথা নিজের মুখে বলতে লজ্জার কারণ দেখি নে। মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতাম, লজ্জা পাবার কারণ হ'ত। ব্রেনের জোরেই ক'রে খেলাম সারাটা জীবন—ব্রেন আমার আছে কি নেই শুধিয়ো আর পাঁচজনাকে।

এই ব্রেন আছে ব'লেই একথাও জোরসে হেঁকে বলতে পারি, পেছনে ব্রেন যদি না থাকে তবে হাজার বন্দুকেও বাঘ মরবে না। আর ব্রেন যার আছে সে খালি হাতেও হাসতে হাসতে বাঘকে ঘায়েল ক'রে দিয়ে আসবে—বেঁচে থাকতে যে জানে তাকে মারে কে ?

এই আমাকেই দেখ না। জীবন-ভর বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে এলাম, ভাবো কি সবই স্রেফ বন্দুকের জোরে ? মোটেই নয়। জীবনে বহুবার এমন সময় এসেছে যখন বন্দুক তো বন্দুক, পেন্সিল-কাটা ছুরিও একটা হাতে নেই। তবু বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি। শুধু পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছি তা নয়—কান্তি চৌধুরী পালায় না, শত্রুকে ঘায়েল ক'রে তবেই বাড়ি ফেরে।

বাজে বক্তৃতায় কাজ কি, একবারের একটি ঘটনা বলছি শোন। খুব বেশীদিন আগের কথা নয় ; জায়গাটাও কাছে-পিঠে। বিশ্বাস না হয় যে-কোনদিন গিয়ে ঘুরে দেখে আসতে পার—যেতে-আসতে কুল্যে একটি টাকা খরচ।

এ কথাটিও গোড়াতেই ব'লে রাখছি, শিকারের গল্প এটা নয়। ওকে আমি মারি নি, বলতে গেলে সে নিজেই আত্মহত্যা ক'রে মরেছিল—আমি নিমিত্ত মাত্র।

এই তো সেদিনকার কথা—ক'টা বছরই বা হবে। অফিস থেকে রিটায়ার করেছি, শিকার খেলা-টেলাও ছেড়ে দেব-দেব করছি। ওটা হয় ; বয়স বেড়ে গেলে তখন আর জীবহত্যায় রুচি থাকে না, মনটা কেমন ধর্মকর্মের দিকেই ঝুঁকে যেতে চায়। তবে হ্যাঁ, মানুষকে বাঁচাবার জন্যে যদি জানোয়ারকে মারা দরকার হয় তখন কি আর মন

সিটিয়ে থাকবে—সে ডাক পেলে শিকারীকে আসন ছেড়ে উঠে আসতেই হবে, সে হচ্ছে তার কর্তব্যের আহ্বান।

সেটা গ্রীষ্মকাল। হালিশহরে আমার একটি অফিসের বন্ধু থাকতেন। তাঁর ছেলের বিয়ের বৌভাত, নেমন্তন্ন করেছেন। দেহটা তেমন ভাল নেই, তবু না গেলেও চলে না। ট্রেন ধ'রেই চ'লে গেলাম।

হালিশহরে স্টেশন আছে, কিন্তু গ্রামের বসতি যেখানে, সেটা স্টেশন থেকে অনেক দূর। রাস্তাও ভাল নেই—গাঁয়ে যেতে হয় নৈহাটি বা কাঁচড়াপাড়ায় নেমে। আমিও কাঁচড়াপাড়া হ'য়ে গেলাম। ঐদিকেই রাস্তাটা ভাল।

হালিশহর গ্রামটা এককালে বর্ধিষ্ণু ছিল, রামপ্রসাদের বাড়ি ছিল এইখানে। এখন সে-কালের কিছু নেই। দেশের বাসিন্দারা বেশীর ভাগই দেশ-ছাড়া। গাঁ-ময় জঙ্গল আর জঙ্গল। বিরাট বড় বড় বাড়ি সব, আপাদমস্তক বনে আর জঙ্গলে ছেয়ে আছে; যেটা যত-বড় বাড়ি তার মাথায় তত বড় বড় বটগাছ। থাকেও তেমনি। জঙ্গলের মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দুটি-চারটি মানুষ, কোনমতে মাথা গুঁজে রয়েছে, আর বাকি গ্রামটা জুড়ে রাজত্ব করছে শেয়াল আর সাপ—লেপার্ডেরও উপদ্রব নেই এমন নয়।

সে যাক, যা বলছিলাম।

কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে নেমে, মাইল দুয়েক হেঁটে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার যখন রওয়ানা হ'লাম তখন বেলা হেলে গিয়েছে। একে অবেলায় ঐ খাওয়া, তায় জঙ্গুলে দেশ, দিনের আলো একটু থাকতে স্টেশনে এসে পৌঁছনো ভাল। ফেরার পথে তাই আর বড় রাস্তা ঘুরতে গেলাম না, গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তার শর্টকাট কাঁচড়াপাড়ায় এসে পৌঁছেছে, সেই পথ ধরলাম।

গরমের দিন, তায় নেমন্তন্ন বাড়ি। আমিও কাজেই ফুলবাবুটি সেজে গেছি। পায়ে পম্পশু, পরনে তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় সিল্কের চাদর। বন্দুক নিয়ে যাইও নি, যাবার কথাও নয়।

তখন কি আর জানতাম আমার ভাগ্যদেবতাও সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছেন।

কাঁচা মাটির পথ, তাতে দু' এক দিনের মধ্যেই কালবোশেখীর বৃষ্টি একপশলা হ'য়ে থাকবে—নরম হ'য়ে রয়েছে, সে পথে তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় না। তায় আমার সেই লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে হাঁটার অভ্যাস—সে ছাই কেবলই পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ বেলাও প্রায় শেষ। মনে মনে ধুতি চাদরকে গাল পাড়ছি, আর সেই ধ্যাড়ধেড়ে কোঁচাকে যতদূব সম্ভব পুঁটুলি ক'বে ধ'রে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাতে চেষ্টা করছি।

কাঁচড়াপাড়া পৌঁছতে কাঁচা রাস্তা মাইলখানেক, তার পরেই পাকা রাস্তা। আধাআধি বোধহয় গিয়েছি, এমন সময়ে ভাগ্যদেবতা দেখা দিলেন।

সেখানটাই পথ একেবারে দু'ভাগ হ'য়ে বেঁকে গিয়েছে। বাঁক ফিবে দেখি আমার সামনে সামনে যাচ্ছে একটা বুড়ী—এক হাতে লাঠি, এক হাতে কি একটা ঝুড়ি-মতন, কাঁকালে ঠেসে নিয়ে ঠুকঠুক ঠুকঠুক ক'রে চলেছে।

আমি হনহন ক'বে এগিয়ে যাচ্ছি, বুড়ীকে পাশ কাটিয়ে পেছনে ফেলে যাব। বুড়ীটা আবার বোধহয় কানে কম শোনে, আমি যখন তার পনের বিশ হাত মাত্র দূরে তখনও সে টেরই পাচ্ছে না একটা মানুষ আসছে। আমি আর কি করি, পথের একেবারে কিনারা ধ'রে চলেছি, নইলে যা সরু পথ, হুমড়ি খেয়ে বুড়ীর গায়েই পড়তে হবে।

ঠিক সামনেই মস্তবড় একটা বটগাছ, রাস্তার ওপর ছড়িয়ে আছে, প্রায় অন্ধকার ক'রে রেখেছে জায়গাটাকে। নিরেট পাতার ছাদ আর মোটা মোটা ডাল, ডাল থেকে অসংখ্য সরু-মোটা ঝুরি সাদা সাদা কাছির মত ঝুলে আছে।

আমাকে তোমরা সেকেলে বলবে, কিন্তু ও পাইনই বল আর ঝাউই বল, বটের কাছে কেউ নয়। বটগাছের মধ্যে সবসুদ্ধ একটা বিরাট মহিমা আছে, যার তুলনা পৃথিবীর আর কোন গাছেই নেই।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। গাছটিও প্রকাণ্ড—গাছের ছায়া আর সন্ধ্যার ছায়া, দুয়ে মিলে গাছটাকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে আমিও তাই বারবারই চোখ তুলে তুলে তার দিকে তাকাচ্ছিলাম।

বুড়ীর তখন প্রায় পাশাপাশি এসে পড়েছি। আমাদের ঠিক মাথার ওপরে সেই বটগাছ। বুড়ীর পাশ কাটিয়ে পা বাড়াতে বাড়াতে আবার আমি ওপর দিকে তাকালাম।

তাকিয়েই আমার গায়ের সব রক্ত যেন এক সেকেণ্ডের মধ্যে হিম হ'য়ে জমে গেল। বুড়ীর ঠিক মাথার ওপরে বটের একটা ঝুরি, ঝুলতে ঝুলতেই লম্বা হ'য়ে ক্রমশ নীচের দিকে এগিয়ে আসছে। তার রংও সাদা নয়, সাদায় আর কালোয় চিত্তির-বিচিত্তির।

তখন আর ভাববার অবসর নেই। বুড়ীকে প্রাণপণ জোরে এক ধাক্কা মারলাম, সে ছিটকে পাঁচহাত দূরে স'বে গিয়ে, পথ থেকে গড়িয়ে মাঠে পড়ল। আমিও পথ ছেড়ে এদিককার মাঠে লাফিয়ে পড়লাম।

বটের ঝুরি ততক্ষণে গাছ ছেড়ে মাটিতে পৌঁছে গেছে। বিরাট পাইথন—সেই এক নজরেই যেটুকু তাকে দেখে নিলাম তাতেই বুঝলাম, কিছু না হ'লেও সে পুরো চৌদ্দটি হাত লম্বা হবে। তার মানে আমার মত আড়াইটে কান্তি চৌধুরী তার পেটের ভেতরে লম্বালম্বি হ'য়ে শুয়ে থাকতে পারে।

মাঠে প'ড়ে আমি মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছি, তাকিয়ে দেখতে যাচ্ছি বুড়ীটা কতদূর গেল, এব মধ্যে পাইথনও সচল হ'য়ে উঠল। বুড়ীকে ধরবার জন্যেই সে তাক করেছিল, তাক ফসকে যেতে এবার তার রাগই বল বা লোভই বল পড়ল আমার ওপর। আমি খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছি কি দাঁড়াই নি, পাইথন সোজা আমার দিকে তাড়া ক'রে এল।

দু'জনের মধ্যে তফাত জোর হাত-আষ্টেকের—তখন দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই। আমি টেনে ছুট দিলাম মাঠের মাঝখান বরাবর। পাইথন পেছনে তাড়া করল।

পাইথনকে লোকে জানে বিরাট আলিসান দেহ, সে যে অমন ছুটতে পারে এ ধারণা আমারও কোনদিন ছিল না। দৌড়ঝাঁপে আমার চিরদিনই খ্যাতি ছিল, এককালে অনেক রেসে অনেক প্রাইজ নিয়েছি। কিন্তু দেখলাম, এর সঙ্গে পেরে ওঠা আমার পক্ষেও অসম্ভব। প্রথম দৌড়ে এক ধাক্কায় আমি তাকে পেছনে ফেলে হাত বিশ-ত্রিশ এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তার পর থেকে সে-ই আমাকে ক্রমশ ধ'রে ফেলতে লাগল।

বেশীক্ষণ নয়, দু' মিনিট হবে কি চার মিনিট জোর—তারই মধ্যে মনে হ'ল আর আমি পারছি না। একে তো বয়স হয়েছে তখন, তায় ঐ রাক্ষুসে খাওয়া—সমস্ত দেহটা মনে হচ্ছে যেন বিশ মণ ভারী। ওদিকে সে মাঠের জমিও যেমন এবড়ো-খেবড়ো তেমনই কাদা-প্যাচপেচে, প্রতি পায়ে পিছলে যাই বা হোঁচট খেয়ে পড়ি। তাতেও যদি বা বাঁচতাম, ষোলোকলা পূর্ণ করেছেন আমার ঢাকাই ধুতির লম্বা কোঁচা, থেকে থেকে তিনি কেবলই আমার দু'পায়ে জড়িয়ে ধরছেন। টান মেরে ফেলে দিয়ে যে দৌড় দেব তারও উপায় নেই, ছুটতেই দম পাচ্ছিনে, থেমে দাঁড়িয়ে কষির গিঁট খুলি কখন।

পেছনে সেই কালান্তক যম সমানে ছুটে আসছে, ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। তার হিস্-হিস্ শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। মনে মনে বলছি, এবার গেলাম মা কালী, পার তো রক্ষে কর।

পারবার শক্তি আর এবারে মা-কালীরও নেই। সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। মরব জানা কথাই, তবু তার মধ্যেই একটি কথা থেকে থেকে মনে উঁকি মারছিল, আর যা হোক বুড়ীটাকে তো বাঁচিয়েছি। সে তখন কি করছে কে জানে, হয়তো বা আমাকেই গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছে।

কিন্তু বুড়ী যাই করুক, আমারও কিছু একটা করা দরকার। বুড়ীকে বাঁচাব ভেবেছিলাম, সেটা হয়েছে। কিন্তু আমাকে তাই ব'লে মরতে হবে তারই বা কি মানে। অথচ বাঁচবার পথ যে কী আছে

তাও তো ভেবে পাইনে।

পাড়াগাঁ। তায় সন্ধ্যার মুখ, বনের ধার। কাছে-পিঠে লোক-জনের আবাস নেই যে ডাকলে ছুটে আসবে। আর তখন ডাকছেই বা কে—আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানছি তাও গলায় আটকে যাচ্ছে। এক যদি কেউ দৈবাৎ এসে পড়ে—কিন্তু এসে পড়েই বা কি করবে! সে যমকে তো আর ল্যাজ ধরে টেনে ফেলে দেওয়া যায় না!

তোমাদের ভগবানও যাই বল নেহাৎ একচোখো। আমি বেচারী পায়ে পায়ে পিছলে যাচ্ছি হোঁচট খাচ্ছি, সে ব্যাটা সাপের পা-ই নেই তো পেছলাবে কি। সে বেশ অমায়িক চিত্তে আমার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল—ধরে আর কি! দৌড়তে আর পারছি না। অথচ না দৌড়েই বা যাব কোথায়। একবার যদি তার নাগালের মধ্যে পড়ি তাহ'লেই ব্যস্। আর দেখতে হবে না—সঙ্গে সঙ্গেই নাগপাশে জড়িয়ে আমাকে জেলি ক'রে দেবেন তিনি, তারপর চেটেপুটে খেয়ে ফেলবেন।

এক রক্ষা, মাঠের ওপর দিনের আলো তখনও রয়েছে, পথের মত সে জায়গাটা আবছা হ'য়ে আসেনি। অন্ধকার হ'লে আর বাঁচন নেই। সেই আলোটুকু থাকতে থাকতে যদি কোন উপায় করতে পারি। মনে মনে বললাম, কান্তি চৌধুরী, এই মিনিট কুড়ি-পঁচিশ সময় তোমার আছে, এর মধ্যে যা পার ক'রে নাও।

দৌড়তে দৌড়তেই এক আধবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছিলাম। সাপ সমানে আমার পেছনে ছুটে আসছে। তাকাতে গেলে দৌড়ের স্পীড কমে যায়, তবু তাকানোর যে এক অদ্ভুত নেশা, কেবলই যেন কে আমার মুখটাকে ঘুরিয়ে পেছনে টেনে নিয়ে যায়। তাকাই, দেখি, আবার ছুটি।

ততক্ষণ বোধহয় মাইল খানেক অন্তত ছোটা হয়ে গেছে। মাঠের শেষ নেই, না আমিই চক্রাকারে ঘুরছি কে জানে। বাড়ি ঘর

কোথাও একটা চোখে পড়ছে না। ছুটতেও আর পারছি না। এমন সময় চোখে পড়ল, সামনে খানিক দূরেই একটা চারা আম গাছ।

গাছে উঠে রেহাই পাব না, পাইথন আমার চেয়ে ঢের ভাল গাছে চড়তে জানে। তবু সেই গাছটাকে দেখে মনে হল যেন বিপদের মুখে বন্ধুর সাক্ষাৎ পেলাম। একটানা ঢালা মাঠ, তার মধ্যে যে-কোন একটা খাড়া জিনিস দেখলেই মনে কেমন একটা ভরসা আসে। ভাবছি যদি একবার ঐ গাছটিতে গিয়ে উঠতে পারি, তো আর কিছু না হোক সাপ যখন গুঁড়ি বেয়ে উঠতে যাবে, ডালের ঝাপটা মেরেও তাকে কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব।

কিন্তু সাপ তখন আমাব জোব হাত-আষ্টেক পেছনে—নেহাৎ দৌড়েব ওপর আছি ব'লেই সে আমাকে ধ'রে ফেলতে পারছে না। আরও একটু পেছনে তাকে ফেলতে যদি না পারি, গাছে উঠবারই ফুরসৎ পাব না। ওদিকে পায়ের অবস্থাও কাহিল। পাম্পশু কোথায় গেছে তাব পাত্তা নেই, দুই পা কেটে রক্তাবক্তি, মাটিতে আর পা ছোঁযানো যাচ্ছে না, এমনই অবস্থা।

তবু আশার আভাস পেয়ে মনটা এবই মধ্যে চাঙ্গা হ'য়ে উঠল। গলায় চাদরটা তখনও জড়ানো। ছুটতে ছুটতেই সেটাকে খুলে নিলাম, তালগোল পাকিয়ে সাপের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। চাদরটাকে পেয়ে যদি তার ওপর ঝাল মেটাতে যায়, তবু সেই ফাঁকে একটু সময় পাব।

চাদর পেয়েও সাপ থামল না, তবু একটু কাজ হ'ল। হালকা সিল্কের চাদর, মাটিতে পড়তে পড়তেই খুলে উড়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল, সাপের চোখে কয়েক সেকেণ্ডের মত ধোঁকা লাগিয়ে দিলে। সেই সময়টুকুর মধ্যে আমি আরও কয়েক হাত সামনে এগিয়ে গেলাম।

কিছুই নয়; তবু ঐ যেটুকু ফাঁক পেলাম, ওরই মধ্যে আমার মাথাটা অনেকখানি স্থির হ'য়ে এল। এতক্ষণ কিছুই ভাবতে

পারছিলাম না, খালি ছুটছিলাম, এবার হঠাৎ যেন চিন্তা করবার শক্তিটা ফিরে এল।

সাপ তখন আমার থেকে হাত কুড়ি-বাইশ দূরে। গাছের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যে তখনও প্রায় দুশো গজ বাকি।

হঠাৎ একটি জিনিস চোখে পড়ল। আমি গাছের দিকে সোজা ছুটছি। একটু আগেই গাছটা ছিল আমার একটুখানি বাঁ-ধার ঘেঁষে। সেটা এর মধ্যে আমার ডান ধারে চলে এল কি করে?

জবাবটাও তক্ষুণি মনে এল। মানুষের ব্রেনে একটা সেণ্টার আছে, তার কাজই হচ্ছে মানুষকে বাঁকা পথে চালানো। না না, সুমতি কুমতির কথা নয়, একেবারেই নির্জলা পথ-চলার ব্যাপার। মানুষ একেবারে সিধে হাঁটতে বা ছুটতে পারে না। যতই সিধে চলতে চেষ্টা করুক, একটু না একটু বেঁকতে তাকে হবেই। শীতকালে মাঠের মধ্যে লোকের পায়ে পায়ে পথের ছিলে পড়ে, সে ছিলে কেবলই এঁকে-বেঁকে চলে, দেখেছ? ঐ জন্যে।

এই কথা মনে হ'তেই আরও একটা কথা মনে হ'ল। মানুষরা যেমন সোজা ছুটতে পারে না, সাপরাও তেমনই এঁকেবেঁকে ছুটতে পারে না ব'লে শোনা যায়। একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক না। মরতে তো বসেইছি। মনে হ'তেই আমি এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করলাম। তাতে আর কিছু না হোক একটা কাজ হ'ল—এতক্ষণ ছুটছিলাম যেন অবশ মনে; এখন এদিকে যাই কি ওদিকে যাই ভাবতে গিয়ে বুদ্ধিটা একটু তাজা হ'য়ে উঠল, পা-ও যেন একটু হালকা বোধ হ'ল।

কিন্তু সাপ এঁকেবেঁকে ছুটতে পারে না, সম্পূর্ণ বাজে কথা। অন্তত এ সাপটা দেখলাম বেশ পারছে। দেখা গেল বাঁকাপথে ছুটতে গিয়ে লাভ হয় নি কিছুই, মিছে গাছটার থেকেই যেন অনেকটা দূরে স'রে গিয়ে পড়েছি। তখন আবার ফিরে সেমি-সার্কেল ক'রে গাছের দিকে এগুতে গেলাম, সাপও পেছনে চলল।

বেঁকতে বেঁকতে আবার পেছনে তাকালাম। সাপও বেঁকে প্রায় সেমি-সার্কেল হয়েছে; ঠিক বাঁকের মুখে রেলগাড়ি যেমন দেখতে হয়। শিকার ফস্‌কে পালায় দেখে সে তখন ক্ষেপে উঠেছে—খানিকটা যায় আর হাঁ ক'রে সামনে লাফিয়ে পড়ে, খপ্‌ ক'রে আমাকে ধ'রে নেবার মতলব।

সে হাঁ আর সে লাফ, দেখলে হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। আবার মুখ ফিরিয়ে সামনে তাকালাম। আবার পেছন ফিরে চাইলাম। সাপ আবার হাঁ ক'রে লাফ দিলে। ভাবলাম, আর কতক্ষণ বা, ঐরকম একটি লাফের মাথায় আমার পা-টিকে ধ'রে ফেলবে, বাস, দেখতে দেখতে আমি তার পেটে চ'লে যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুতের মত আরেকটা কথা আমার মাথায় এল। অসম্ভব আশা, সেটা নিজের মনেও বুঝছিলাম; কিন্তু তখন ডুবতে বসেছি, খড়ই হোক, আর কুটোই হোক, হাতের কাছে যাকে পেলাম তাকে ছেড়ে দেবার মত দুঃসাহস নেই। ভাবলাম, মনে যখন হ'লই কথাটা, দেখি একবার চেষ্টা ক'রে যা থাকে কপালে। তারপর মরণ, সে যখন আসবার আসবেই। তাকে ঠেকাবার সাধ্যি আছে কার!

সেমি-সার্কেল ক'রে ছুটছিলাম, সে পথ আর সোজা করলাম না, সার্কেল হ'য়ে ছুটতে লাগলাম। সার্কেল হ'য়েও ঠিক নয়, সে সার্কেলের বেড়ও ক্রমেই কমিয়ে আনতে লাগলাম—ঠিক কেন্নুই যখন তাল পাকিয়ে টাকা হ'য়ে যায়, তার মতন। সাপও আমার পেছনে পেছনে ঘুরে আসতে লাগল।

আমিও ছুটছি, সাপও ছুটছে, সার্কেল ক্রমেই ছোট হচ্ছে। সাপ ছুটতে ছুটতে সমানেই ছোবল মেরে যাচ্ছে। ছোবলেরও একটা তাল আছে—কয়েক হাত ছোটে, একটা ছোবল মারে, আবার ছোটে, আবার ছোবল মারে।

কতক্ষণ অন্তর ছোবল দিচ্ছে সে, সেটা আমি লক্ষ্য ক'রে দেখে নিলাম। তার সঙ্গে তাল রেখে আমিও দু' একবার লাফ মেরে সামনে

এগিয়ে গেলাম, মানে ছোবলের তালটি পায়ে রপ্ত ক'রে নিলাম। তারপর সার্কেল আরও ছোট করে আনলাম।

তার মানে একেবারে সন্থ মৃত্যুর মুখে পা বাড়িয়ে দেওয়া। অথচ বাঁচতে হ'লে তখন সেইটেই একমাত্র পন্থা। সার্কেল তখন এত ছোট হ'য়ে এসেছে, সাপ প্রায় গোল হ'য়ে ঘুরছে। তার মাথা আমার হাত চারেক মাত্র পেছনে, তার ল্যাজের ডগাটা আমার হাত দুই-তিন সামনে।

এইবার শেষ চেষ্টা। ভগবানকে স্মরণ ক'রে মনকে শক্ত ক'রে নিলাম। তারপর হঠাৎ সার্কেল আরও ছোট করে দিলাম, সাপের ল্যাজের ডগা আমার পায়ের মাত্র একহাত সামনে। আরও একটু ভেতরে মোচড়—এবার সাপের ল্যাজ আর আমার পা পাশাপাশি। বিদ্যুতের মত মুখ ফিরিয়ে দেখে নিলাম, সাপের মুখ আমার পায়ের মাত্র একহাত পেছনে।

জয় মা কালী! সাপের ছোবলের তালটা মনে মনে আরেকবার আউড়ে নিলাম; তারপর হঠাৎ একটি পা থেমে দাঁড়িয়েই, লাফ দিয়ে সার্কেলের বাইরে এসে পড়লাম। সেই মুহূর্তেই সাপও গর্জন ক'রে সামনের দিকে লাফ মারলে।

আমি আর পেছনে তাকালাম না—সোজা দৌড়ে আমচারার গায়ে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম। প্রথমটা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে মাটিতেই পড়ে গেলাম; তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে চাইলাম। জয় মা কালী—যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে, মা-ই বাঁচিয়েছেন।

শেষবার লাফ যখন দিই, তখন সাপের ল্যাজ আর আমার পা ছিল একই জায়গাতে। শেষের ছোবলটিতে সাপের মুখ ঠিক সেইখানে এসে পড়েছে। আমার পা তখন আর সেখানে নেই, ছিল তার ল্যাজের ডগা। লাফের মুখে সেই ডগাটিকেই সে কামড়ে ধরেছে—তারপর আর কি!

সাপের দাতগুলো থাকে আঁকশির মত বাঁকানো। তাই দিয়ে

টেনে টেনে সে খাবারকে মুখেরমধ্যে চালান ক'রে দেয়। একবার গিলতে শুরু করলে আর সে-জিনিস ছেড়ে দিতে পারে না, গিলতেই থাকে। তাই-ই হ'ল; ল্যাজের ডগাটি মুখে পেতে সে সেইটাকেই খপাখপ গিলে চলল। আমার তখন সর্বাঙ্গ অবশ—আমি সেই গাছের গুঁড়িতে ঠেশ দিয়ে দেখতে লাগলাম।

ভীষণ দৃশ্য! গাছের গায়ে হেলে দাঁড়িয়ে আমি হাঁপাচ্ছি আর কাঁপছি; আমার মাত্র হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে সেই ভীষণ সাপ নিজেকে নিজে গিলে খাচ্ছে। ল্যাজের ডগা থেকে হাত দুই-তিন আন্দাজ ইতিমধ্যেই তার পেটের ভেতরে চলে গেছে, সমস্ত দেহটা বেঁকে গিয়ে দেখতে হয়েছে একটা মিনা-করা অনন্তর মত: তখনও একটু একটু ক'রে ল্যাজটাকে সে গিলেই চলেছে। পাইথনরা হুড়মুড় ক'রে গেলে না—একটু থামে, আবার একটুখানি ন'ড়ে ওঠে, চোয়াল আর মুখ সামনে এগিয়ে দিয়ে খাবারটাকে মুখের মধ্যে টেনে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে দেহটাকেও সামান্য একটুখানি সামনে এগিয়ে নেয়, এমনি ক'রে ক্রমে সবটাকে গ্রাস করে।

সন্ধ্যার ছায়া তখন নেমে এসেছে। শত্রুর মৃত্যু, তবু তখন আর দাঁড়িয়ে দেখবার মত আমার অবস্থা ছিল না। অন্ধকারে এই মাঠে পথ খুঁজে পাব কি ক'রে, আর প্রাণ যখন বাঁচলই, ট্রেন কেন ধরব না? যেটুকু সময় সম্ভব আমি দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিলাম। তারপর যখন বুঝলাম, আর তার ল্যাজ উগরে ফেলে আমার পেছু নেবার সাধ্য নেই, চোঁচা টেনে দৌড় লাগালাম—একছুটে একেবারে স্টেশনে।

আমরা বলিলাম, তারপর?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, তারপর আর কি। টিকিট কিনলাম, ট্রেনে উঠলাম, কলকাতায় এসে পৌঁছলাম।

আমরা বলিলাম, আহা, আপনার কথা নয়, সাপটার কি হ'ল?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, নাও কথা। তার আর কি হবে—ম'রে

গেল। নিজেকে নিজেই খেয়ে ফুরিয়ে ফেললে, না আধখানা গিলে পড়ে রইল,—রাত্তিরে শেয়াল আর বাঘরা এসে বাকিটুকু শেষ ক'রে দিয়ে গেল, তা অবিশ্যি জানি নে—খবরের কাগজে সেকথা কিছু বেরোয় নি।

আমরা বলিলাম, কি বেরিয়েছিল তবে ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, কিছুই বেরোয় নি। পরদিন কি আর সে সাপের পাত্তা কেউ পেয়েছে, যে কাগজে খবর দেবে ?

মন্ত্রের মহিমা

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

তোমরা আজকাল সায়েব হয়েছ, মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস কর না। অথচ এরই জোরে আমাদের পূর্বপুরুষরা অদ্ভুত সব কাণ্ড ক'রে গেছেন।

আমরা বলিলাম, আপনি বিশ্বাস করেন এসবে?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, কেন করব না। নিজের চোখে যার প্রত্যক্ষ ফল দেখেছি, তাকে বুজরুকি ব'লে উড়িয়ে দেবার মত দুঃসাহস আর যারই থাক্ কান্তি চৌধুরীর নেই। শোন বলছি।

তখন আমার বয়স বেশী নয়। নতুন নতুন শিকার খেলছি, মনেও তাজা উৎসাহ গায়েও গরম রক্ত, খাঁটি ইয়ং বেঙ্গল যাকে বলে। তবে তোমাদের সঙ্গে একটা জায়গাতে আমাদের তফাৎ ছিল—তোমরা না দেখেই অবিশ্বাস কর, আমরা অন্তত দেখে অবিশ্বাস করতাম।

খুলনা জেলার বাগেরহাট অঞ্চলে একটা বড় জমিদারি আছে, তার নাম মোরেলগঞ্জ। ওখানকার লোকে বলে সরালিয়া। খুব উর্বর জায়গা। সোঁদরবনের বাদা, ডাঙায় যেমন গাছ আর দুধোলো গাই, জলে তেমনই মাছ। এই মোরেলগঞ্জে একবার গেলাম। মোরেলগঞ্জের এস্টেটে চাকরী করতেন এক পিসেমশাই, তাঁর ওখানে। মোরেলগঞ্জের জমিদারি ছিল মোরেল সায়েবের। তাঁর নামেই মহালের নাম। বিরাট জমিদারি। মোরেল সায়েবের ছোট ভাই ছিলেন একজন। যেমন বড় শিকারী তেমনই প্রকাণ্ড জোয়ান। আর ছিল তাঁর দুর্দান্ত গোঁ। যা একবার ধরতেন তা থেকে আর কিছুতেই তাঁকে ফেরানো যেত না। মারাও গেলেন এই গোঁ-এর জন্যেই, বুনো মোষের হাতে। একা হাতে মাটিতে দাঁড়িয়ে মোষকে গুলি ছুঁড়েছিলেন,

ঘোষ ছুটে এসে তাঁর ওপরে পড়ল। দু' দুটো নরঘোষ। একা তাদের সামলাতে পারলেন না, মারা পড়লেন। অথচ, ঘোষেরা তাঁকে দ'লে পিষে থেঁৎলে মাটিতে বেটে দিয়ে গেল, তবু তিনি একটি পা হটতে রাজি হ'লেন না। বড মোরেল সায়েব ছুটে গিয়ে পেলেন শুধু কাদায় মাখানো খানিকটা ছেঁড়া নাড়িভুঁড়ি, কিন্তু সেও ঠিক সেই গাছটিরই তলায়, এক ইঞ্চিও তার এদিকে ওদিকে নয়। মোরেল সায়েবও সেই দুঃখেই স্টেট বেচে দিয়ে দেশে চ'লে গেলেন। এখন সে জমিদারির মালিক লাহাবাবুরা। সে কথা যাক, আজকাল খুলনা থেকে রেলে বাগেরহাট, সেখান থেকে স্টীমারে একেবারে মোরেলগঞ্জেই গিয়ে নামা যায়। তখন রেল-স্টীমার হয়নি, খানিকটা পায়ে হেঁটে খানিক নৌকোয় যা হোক ক'রে গিয়ে তো পৌঁছলাম। ভাদ্র মাস, তায় আবার কপাল-গুণে এমনই বাদল নেমেছে যে ঘরের ভেতরেই ছ'তো মুড়ি দিয়ে থাকবার দশা, বাইরে বেরোয় কার সাধ্যি।

প্রথম দিন-দু'য়েক অবশ্য মন্দ কাটল না। ঘরের ভেতরেই ব'সে শুয়ে দিন কাটছে; গরম গরম পোলাও খিচুড়ি আর মাছভাজা, মুড়ি-কড়াই-ভাজা আর পেঁয়াজের ফুলুরি, যত পার খাও, আর ব'সে ব'সে গল্প শোন। সোঁদরবনের দেশ। বাড়ির উঠোনে বাগানে সুঁদরী-গাছের চারা। সে দেশে গল্প মানেও তাই বাঘের গল্প। মোরেল সায়েবের ভায়ের শিকারের গল্প, তার মারা যাওয়ার গল্প, তখনও লোকের মুখে মুখে ফিরছে। সেই গল্প শুনি, আর ভাবি এমন দিন কি আমার ভাগ্যে আসবে, যেদিন শিকারী ব'লে মরবার পরে লোকে আমার নাম করবে।

দিন-দুই পরেই কিন্তু বিরক্তি ধরতে লাগল। মুড়ি, কড়াই, পোলাও, খিচুড়ি ভাল জিনিস। গল্প শোনা আরও ভাল। কিন্তু শুধু তাই নিয়ে দিবারাত্রি কাঁহাতক থাকা যায়। যে পারে সে পারে। কান্তি চৌধুরী পারে না, না নড়ে-চড়ে ব'সে ব'সে থাকলে তার হাতে পায়ে খিল ধ'রে যায়। অথচ আকাশ একটু না ধরলে যাবই বা

কোথায়। বেড়ানো তো খুব হ'ল, পথ-ঘাটের যা দশা হয়েছে, ফিরে চ'লে আসব তার পর্যন্ত উপায় নেই, কথা ছিল নৌকোয় করে বন দেখতে যাব, ওখানে যাবার গরজও ছিল তাই। কিন্তু কোথায় বা নৌকো আর কোথায় বা বন!

এমনি ক'রে আরও দিন তিনেক কাটল। আমি প্রায় মনে মনে স্থির করেছি আর জোর দুটি দিন, ব্যস—তারপর আর কান্তি শর্মা কারো কথা শুনছেন না। সোজা টেনে লম্বা দেব যা থাকে কপালে।

কপালে কিন্তু ভাল জিনিসই ছিল।

রবিবারে পৌঁছেছি, বিষ্যুৎবার পেরিয়ে যায়, আকাশের আর রং ফেরে না। মনে মনে মহা বিরক্ত হ'য়ে সেদিনও শুতে গেলাম। ভোরের দিকে মনে হ'ল কেমন যেন গরম লাগছে। উঠে বাইরে এলাম। বৃষ্টি থেমেছে। আকাশের মেঘও কেটে আসছে। জ'লো হাওয়ার চোটে এ ক'দিন শীত-শীতই করছিল সারাক্ষণ। সে হাওয়াও আর নেই, বরং হঠাৎ শীতটা কেটে গিয়ে কেমন বদ্ধ গুমোট লাগছে। মনে মনে হাতজোড় ক'রে বললাম, দোহাই বাবা, ছেড়েছই যদি, দয়া ক'রে অন্তত আর দুটো দিন দেখা দিও না।

ভোর হ'ল। রোদ ঠিক নয়, তবু যেন একটু আলো ফুটল। বললাম, যদি একটুকুনও ধ'রে থাকে, আজ বিকেল নাগাদ একবার বেরুব। বিকেল নাগাদ কিন্তু অপেক্ষা করতে হ'ল না।

বেলা তখন দশটা হবে, আমি বারান্দায় ব'সে বই পড়ছি আর তাকিয়ে দেখছি, আকাশ ব্রাউন থেকে সাদা হয়েছে, কোথাও কোন ফুটো দিয়ে নীলের আভাস ফুটে বেরোয় কি না। পিসেমশাই বাইরের ঘরে ব'সে কাগজপত্র দেখছেন, সেটা তাঁর অফিসের সময়। হঠাৎ ডাক এলো—কান্তি, দেখে যা তো!

গেলাম। গিয়ে দেখি, ফরাসের ওপরে পিসেমশাই আর জন দু'চার এখানকারই ভদ্রলোক—কেউ বা কর্মচারী কেউ বা প্রতিবেশী। ফরাসের বাইরে একটা টুলের ওপরে বসে লম্বা জোয়ান মতন একটা

লোক। দেখে মনে হ'ল বেশ পরিশ্রান্ত। খালি গা, ময়লা গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। পিসেমশাই বললেন, বাঘের কথা বলছিলে, এই নাও, জ্যান্ত বাঘের খবর এসে হাজির।

বললাম, কোথায়?

পিসেমশাই বললেন, ফুলহাতায়।

ফুলহাতার নাম শুনেছি, এঁদেরই একটা মহাল। নায়েব-কাছারি আছে সেখানে। নৌকোয় একবেলার পথ। বললাম, কি হয়েছে ফুলহাতায়?

পিসেমশাই বললেন, এই তো, নিজের কানেই শোন না। কই রে, কি বলছিলি বল্ এবারে, শুনি?

বেঞ্চির লোকটি মুখ তুলে তাকালে। বললে, আজ্ঞে হুজুর, ইনি?

পিসেমশাই বললেন, আমার একটি আত্মীয়। বয়স কম হ'লে হবে কি, খুব বড় শিকারী। বাঘ ভালুক ঢের মরেছে এর হাতে।

লোকটি গামছা দিয়ে গলার বুকের ঘাম মুছল। বললে, আর কি বলব হুজুর। বললামই তো যা বলবার। এখন আপনি যা হয় একটা বিহিত করুন।

আমি বললাম, হয়েছে কি?

পিসেমশাই বললেন, ফুলহাতা কাছারি থেকে এসেছে ও। নায়েব মশাইকে বাঘে মেরেছে কাল রাত্রে।

এই নায়েব মশাইয়ের নামটি এই ক'দিনের মধ্যেই শুনেছিলাম। খুব নাকি ভাল কর্মচারী, আর বেশ সজ্জন। বরিশাল না ফরিদপুর জেলায় বাড়ি, এঁদেরই এস্টেটে চিরদিন কাজ করেছেন, মুহুরি থেকে ক্রমে নায়েব অবধি হয়েছেন। এরা সকলেই তাঁর প্রশংসা করতেন।

বললাম, বল তো, ব্যাপারটা কি শুনি। কোথায় ধরলে তাঁকে?

সে বললে, কোথায় আর, কাছারিরই উঠানে।

তার মানে? কাছারি-বাড়ি পাঁচিল-ঘেরা নেই?

—না আজ্ঞে, মফঃস্বল কাছারি, তার পাঁচিল কি হবে। দরোয়ান

রয়েছে ষণ্ডা ষণ্ডা আধকুড়ি, পাইক রয়েছে, বন্দুক রয়েছে, তায় বাবুদের অতবড় নাম ডাক—সে কাছারির মাঝখানে বাঘ এসে ঢুকবে কে ভেবেছে!

উপস্থিত লোকদের একজন বললেন, নিয়তি।

আর-একজন বললেন, তা তো বটেই। কপালে যদি লেখা থাকে, কুলেব আঁঠির ভেতর থেকে সাপ বেরিয়ে আসে।

পিসেমশাই একটুখানি হাত তুলে এদেব থামিয়ে দিলেন। বললেন, আমিই বলছি। কাল, রাত তখন সামান্যই হবে—

সে লোকটি বললে, বাত কোথায়, সবে তখন সন্ধ্যে পেরিয়েছে কি পেরোযনি।

পিসেমশাই বললেন, তাই। সেরেস্তাব কাজকম সেরে বেরুচ্ছিলেন তিনি। ধর্মভীরু লোক, দিনের কাজ কখনও পবদিনের জন্যে ফেলে রাখতেন না। তাই বেরুতেন সবাব শেষে, এক একদিন রাত বেড়ে যেত। তা যাক, বেরিয়ে, সিঁড়িতে দাড়িয়ে দোরে তালা লাগাচ্ছেন, পেছন থেকে বাঘ আচমকা এসে ঘাড়ে পড়ল। আব শব্দটিও করতে পাবলেন না, একেবারে তুলে নিয়ে চলে গেল তাঁকে।

আমি বললাম, তারপর?

সে লোকটি বললে, তারপর আর কি। উঠোনে আবছা অন্ধকারে হঠাৎ ধুপ করে একটা আওয়াজ, তারপরই চুপচাপ—পাশের বারান্দায় ছিল দারোয়ান রামভজন তেওয়ারি, তার হ'ল সন্দেহ। কোন্ হ্যায়রে—বলে ডাক ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ল। এসে দেখে, কেউ কোথাও নেই। বড় বড় বাঘা কুকুর আছে অনেকগুলো, তাদের হাঁক দিয়ে বললে, লে লে লে!

ডাক শুনে কুকুর কিন্তু ছুটে এলো না। চ'টে গিয়ে তাদের পিটতে গেল, দেখে কুকুরবা খাটের তলায় কুঁকড়ি মেরে শুয়ে কুঁই কুঁই করছে। তারা বাঘের গন্ধ পেয়েছে।

সেই উপস্থিতদের একজন বললেন, ওটা টের পায়, অন্তর্যামী জীব।

অন্যজন বললেন, তাছাড়া কুকুরের ঘ্রাণশক্তি তো অত্যন্ত প্রবল হয় কিনা!

পিসেমশাই বললেন, এসব ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, তক্ষুণ-তক্ষুণি মানুষ আর জানোয়ার সবগুলোকে নামে নামে ধ'রে মিলিয়ে দেখা, সবাই ঠিক আছে কি নেই। তাইতেই জানা গেল নায়েব মশাইকে পাওয়া যাচ্ছে না। সিঁড়ির ওপরে তাঁর খড়ম আর হুঁকো, চাবির থোলো তখনও তালার গায়ে ঝুলছে। তারপর কি আর বুঝতে বাকি থাকে!

আমি বললাম, তারপর, খোঁজ-খবর করা হ'ল না আর?

সে লোকটি বললে, হয়নি আবার! নায়েব মশাই ছিলেন কাছারি সুদ্ধ লোকের বড় ভাই বলুন বড় ভাই, বাপ বলুন বাপ। সেই রাতে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম আমরা, ডালকুত্তা নিয়ে বন্দুক নিয়ে আলো নিয়ে কাছারির চারধারে যতদূর পারা গেল—আধ মাইলখানেক পর্যন্ত পাতি-পাতি ক'রে খুঁজে এলাম।

আমি বললাম, পাওয়া গেল না?

সে বললে, গেল, তাঁর গায়ের চাদরখানা, আর রক্তের দাগ। তার সঙ্গে সঙ্গে বাঘেরও পায়ের দাগ। মস্তবড় থাবা, এতখানিটা ক'রে হবে। ব'লে হাত দিয়ে মেপে দেখালে।

সারারাত ধ'রে খুঁজেছি আমরা, এখনও সকাল হ'তেই আরও মেলা লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সব। আমিও সারারাত ঘুরেছি। ভোর হ'তে তশীলদারবাবু বললেন, যাও সদর কাছারিতে খবর দাও। তাই ছুটে ছুটে আসছি।

পিসেমশাই বললেন, বড়বাবুকে খবর আমি পাঠাচ্ছি। তুমি ব'সো একটু জিরিয়ে নাও।

বড়বাবু মানে সদর ম্যানেজরে, মাইলখানেক দূরে তাঁর কাছারি।

সে লোককে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে পিসেমশাই উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, নিজেই যাই। আমাকে বললেন, যাবে নাকি?

আমি বললাম, চলুন।

সব শুনে ম্যানেজারের হুকুম হ'ল—তক্ষুণি আরও বন্দুক নিয়ে আরও লোকজন ফুলহাতা রওয়ানা হোক, এ বাঘকে মারতেই হবে। জমিদারের ইজ্জৎ নিয়ে কথা, বুঝতেই পার। পিসেমশাই তাদের নিয়ে যাবেন। আমিও সঙ্গে চললাম। ম্যানেজার বললেন, যদি আপনি পারেন তবে সে কথা স্টেট ভুলবে না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যাহোক দুটি নাকে-মুখে গুঁজে আমরা নৌকোয় উঠলাম, দুখানা ডিঙিতে জন চোদ্দ-পনের লোক। সন্ধ্যে হয়-হয় এমন সময় গিয়ে কাছারিতে পৌঁছলাম।

আমাদের অভ্যর্থনা করলেন তশীলদার। ম্যানেজারের হুকুম, আবার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনিই নায়েব থাকবেন। পিসেমশাই তাঁকে হুকুম জানালেন, কিন্তু এত বড় খবর পেয়েও ভদ্রলোক কিছুমাত্র উচ্ছ্বাস করলেন না। বুঝলাম নায়েবের মৃত্যুটা খুব লেগেছে। নিজের পদবৃদ্ধিও তাঁর মৃত্যুরই দরুণ, একথাটা ভেবে শান্তি পাচ্ছেন না।

স্থির হ'ল রাতটা কাছারিতে কাটিয়ে ভোর থেকেই আমরা খুঁজতে বেরুব। সারারাত প্রায় কেউই ঘুমোলাম না আমরা, জল্পনা-কল্পনা আর উদ্যোগ আয়োজনে রাত কেটে গেল। প্রজাদের ভেতর থেকেও অনেক লোক শিকারী বা বীটার ব'লে নেওয়া হবে, সেই রাতের মধ্যেই তাদের কাছে খবর চ'লে গেল। ভোর হ'তে না হ'তেই আমরা ছোট ছোট দল বেঁধে প্রায় শ-দেড়শো লোক বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে বন্দুক, লেজা-বল্লম, আর কুকুর।

খুঁজে খুঁজে কিন্তু কিছুতেই পাইনে। মাঝে মাঝে বনের ভেতর তার পায়ের দাগ পাই, বেশ খানিকদূর দাগ ধ'রে ধ'রে এগিয়ে যাই, তারপর হঠাৎ সে দাগ যেন হাওয়ায় উড়ে যায়। অথচ জমিতে পথে জলকাদা, নরম মাটি, তার মধ্যে হঠাৎ পায়ের দাগ না প'ড়ে যায়ই বা কোথায়। বারবার এমনই হ'তে লাগল। গেঁয়ো শিকারীদের দেখলাম, ক্রমেই মন নেতিয়ে পড়ছে, এ বাঘ সত্যিকার বাঘ না ভূত-বাঘ, তাই নিয়েও তারা কান-ফিসফিস করছে।

এই ব্যাপারটা মারাত্মক। বীটার আর শিকারীর যদি মনে একবার এই ভয় ঢুকল তবে আর তাকে বিশ্বাস নেই, আচমকা বিপদ বাধিয়ে ছাড়বে; নিজে তো ভয় পেয়ে সর্বকর্মের বাইরে চ'লেই যায়, সময়কালে জবুথবু হ'য়ে পড়ে, অন্যেরও ঘাড়ের বোঝা হ'য়ে পড়ে। তাছাড়া, ভয় জিনিসটাই সংক্রামক, বিশেষ ক'রে এই ধরনের ভয়। একজন যদি ধুয়ো তুলল তো অন্যেরা সঙ্গে সঙ্গেই সেই এক রা ছাড়তে সুরু করবে।

আমি তাই কখনোই একে প্রশ্রয় দিই না। এখানেও স্রেফ ধমকেই এদের সে গা-ছমছমানিকে সারিয়ে দিলাম। বললাম, ভয় যার আছে, সে আমার পেছনে এস, আমাকে না নিয়ে তো আর বাঘ তার নাগাল পাবে না! সাহস তাদের কতদূর ফিরল তা জানিনে, তবে মুখের ওপরে টুঁ শব্দটিও কেউ করল না। কাজ কিন্তু কিছুই হ'ল না, সন্ধ্যে অবধি বন ঠেঙিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

পরদিনও তাই, তার পরদিনও তাই। পিসেমশাই বললেন, ও আর নেই, ভেগে গেছে। বাসিন্দা বাঘ নয় তো, হয়তো নদী পেরিয়ে এসেছিল, আবার ফিরে গেছে।

তা হয়। কিন্তু আমার রোখ চেপেছে, তখন বললাম, সে হবে না, আমি এর শেষ পর্যন্ত না দেখে হাল ছাড়ব না।

পিসেমশাই বললেন, আহা কি মুস্কিল, সে যদি নদী পার হ'য়ে চ'লে গিয়ে থাকে, এখানে খুঁজে তাকে আর পাবে কোথায় তুমি?

আমি বললাম, গিয়ে থাকে, আবার ডেকে ফিরিয়ে আনব।

চলল আরও দু'দিন। সকালবেলা বেরোই, সারাদিন বনে বনে ঘুরি। সন্ধ্যেবেলা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসি। এদিকে যত দিন যাচ্ছে, সবারই যেন উৎসাহ ক্রমে ঝিমিয়ে আসছে, বীটাররাও আর তেমন গা করতে পাচ্ছে না, বকশিশের লোভ দেখিয়ে কোনমতে কাজে লাগাতে হচ্ছে তাদের। রোজ রাতে গরু, মোষ, শূয়োর, কুকুর বের ক'রে রাখা হচ্ছে, খোঁয়াড় পাতা হচ্ছে, বাঘ তার ধারেও ঘেঁসে না।

একটা জিনিস কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না। পিসেমশাই বলছেন বাঘ এখানে নেই, চ'লে গেছে। কিন্তু এখন চ'লে সে যাবে কেন? এপারে মানুষের বসতি, মানুষ বল গরু মোষ বল, অগুণতি। ওপারটা মাঠ আর বন-বাগান। তাও সুপুরি নারকোলের বাগান, সুঁদরিবন নয় যে তার মধ্যে নানা রকমের বুনো জন্তু ব'সে থাকবে। তবে এমন খাদ্য পাবার জায়গা ছেড়ে নদী পার হ'য়ে চ'লে যাবার তো কথা নয়। যদি বল আমরা জঙ্গল বীট করছিলাম, জঙ্গল বীট করলে বাঘ লুকিয়ে যায়। লুকোচুরি ক'রে ফেরে বটে, কিন্তু দেশ ছেড়ে চ'লে যায় না। তাতে হার স্বীকার করা হ'ল, এটা তারা বোঝে। বাঘের মধ্যে আর যাই থাক বা না থাক, স্পোর্টিং স্পিরিটের অভাব নেই, বিপদ নিয়ে খেলতেই তারা ভালবাসে।

অথচ নায়েব মশাইকে নিয়েছে সে পাঁচ-ছ'দিন হ'য়ে গেল। যদি বল ছ'দিন ধ'রেই তাঁকে খেয়েছে, তবু আজ অন্তত তিনটি দিন তার অনাহারে থাকবার কথা। এই ক'দিনের মধ্যে অন্য কোন মানুষের বা কোন গরু-মোষের ওপরে আক্রমণের খবর পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। চ'লে যায় নি যদি বলি, তবে এই ক'দিন সে খাচ্ছে কি?

পিসেমশাইকে আমি কথাটা বললাম। শুনে তিনি বললেন, আমিও তো তাই বলছি, সে এখানে ব'সে নেই। তুমি মিথ্যেই বন ঠেঙিয়ে মরছ।

আমি বললাম, তা নয়। আর একটা কথা বলুন তো আমাকে। আপনাদের এই নায়েব মশাইটি, এর দেহটি কেমন ছিল?

পিসেমশাই বললেন, মানে স্বাস্থ্য?

আমি বললাম, তা নাও হ'তে পারে। পরিধি?

পিসেমশাই বললেন, তা ভালই বলা যায়, মানে এই স্টেটের এতবড় একটা মহাল, একটানা চোদ্দ বছর এখানে নায়েবী করে গেছেন, বুঝতেই পার।

তা পারলাম অবশ্য। কিন্তু তাই যদি হয় সেই আড়াই মণ

জোয়ানকে মুখে নিয়ে এক লাফে পালিয়ে গেল যে বাঘ, তারও তো চোয়ালটি কম হবার কথা নয়। বলতে কি, মনটা একটু দ'মেই গেল আমার। সে বাঘ কখনও তিনদিন না খেয়ে থাকবার পাত্তর নয়। অথচ নদী পেরিয়েও যায় নি সে, নদীর পার ধ'রে ধ'রে কাদায় নেমে আমি রোজ দেখে এসেছি, কোথাও চরে তার পায়ের দাগ পাইনি, জলে নামবার কোনও প্রমাণ পাইনি। তবে?

অবশ্য, হ্যাঁ, একটা কথা হ'তে পারে। কথায় বলে মোরেলগঞ্জের স্টেট—সেই স্টেটের এতবড় একটা মহালের নায়েব ছিলেন, তাও একদিন দু'দিন নয়, এক নাগাড়ে ঝাড়া চোদ্দটি বছর—তেল ঘি গায়ে কতটুকু জমিয়ে নিয়েছিলেন তার আন্দাজ পিসেমশাইয়ের কথাতেই পেয়েছি। বনের বাঘ এমন বাহারে খাবার পেয়ে আর সামলাতে পারে নি, হয়তো একবারেই সবখানি পেটে পুরেছে। তার ফলে বাকি ক'টা দিন আর তার শিকার খুঁজবার দরকার হয়নি, ঘটি হাতে ক'রে কেটে যাচ্ছে।

এমন সোজা কথাটা আগে কেন মাথায় আসেনি, ভেবে লজ্জা পেলাম। কিন্তু তাই যদি হয় তবে এই হচ্ছে সুযোগ, এ সুযোগ ছাড়া হবে না। ভুগে ভুগে সে কাতর আছে, মুখেও রুচি নেই, হঠাৎ মানুষ মারতে আসবে না। এই তক্কে তাকে কায়দা করতেই হবে আমার। নইলে, পেট ধ'রে গেলেই আবার তার পেটে আগুন জ্বলবে, আবার তার তেজ বেড়ে যাবে।

পিসেমশাইকে অবশ্য এত কথা ভেঙে বললাম না আমি। মানে কথাটা যতই সত্যি হোক, তার মধ্যে নায়েব মশায়ের মোটা ভুঁড়ি নিয়ে ইঙ্গিত আছে, পিসেমশাই তাঁর পুরোনো বন্ধু, হয়তো ঠিক বুঝবেন না কথাটা। ভাববেন আমি তামাসা করছি।

কথা বলছি না দেখে পিসেমশাই বললেন, একথা জিজ্ঞেস করলে কেন?

বললাম, আমিও তাই ভাবছিলাম, যা বললেন, ঐ রকম জোয়ানই

যদি হন, তবে একটানে তাঁকে যে মুখে ক'রে নিয়ে গেল সে বাঘও তো সামান্য কথা নয়। তাকে মারতেই হবে, আমাদের হাল ছেড়ে দিলে হবে না। আপনি সব বীটারকে খবর দিন। আরও বেশী ক'রে বীটার চাই।

নতুন নায়েব, মানে আগেকার তশীলদার, চুপ ক'রে শুনছিলেন। এবার তিনি বললেন, আমি একটি কথা বলব?

আমি বললাম, অবশ্য! কি বলুন না।

নায়েব বললেন, একটি কথা হঠাৎ মনে পড়ল। মনে আছে, প্রথম দিন এসে আপনি বলেছিলেন, বনে যদি চ'লে গিয়ে থাকে বাঘ, তো তাকে আবার ডেকে আনতে হবে।

বললাম, হ্যাঁ, কি তার?

নায়েব বললেন, সেই বুদ্ধিটিই একবার ক'রে দেখবেন? ডেকেই আনা যায় কি না?

আমি বললাম, তার মানে, খোঁয়াড় পেতে? বা বেট বেঁধে? কিন্তু সে চেষ্টাও তো কম হ'ল না। বাকির মধ্যে আছে এখন মানুষ দিয়ে বেট করা। কিন্তু তেমন মানুষ পাব কোথায়?

নায়েব বললেন, সে কথা নয়। ডেকে আনবার কথাই বলেছি আমি। মানে আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না এসব, কিন্তু—

পিসেমশাই বললেন, কিসের কথা বলছেন আপনি, মন্তর তন্তরের?

নায়েব বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পিসেমশাই আমার দিকে তাকালেন। বললেন, তুমি হয়তো শুনে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু মন্তরের জোরে বাঘকে সাপকে টেনে আনা যায় একথা বিশ্বাস করে এমন লোক এদিকে এখনও পাওয়া যায়।

আমার অবশ্য এতে অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না। নতুন নায়েব মশায়ের বাড়ি এই জেলাতে, খুলনা শহরের কাছাকাছি কি গ্রামে। ও অঞ্চলের লোক মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক কড়িচালা বান মারা এসবে বিশ্বাস করে, আমি জানতাম।

বললাম, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন কথা নেই আমার, কাজ যদি হয় মনে করেন, আমি নিশ্চয়ই রাজি আছি। কিন্তু করবে কে ?

নায়েব বললেন, আছে লোক। এই কাছাবির পাশেই থাকেন। বলেন তো ডাকাই।

পিসেমশাই বললেন, বেশ তো।

তক্ষুণি লোক পাঠান হ'ল। নাম শুনলাম, কৈলাসনাথ চক্রবর্তী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, পূজো-আচ্চা হোম নিয়েই থাকেন। তন্ত্রমন্ত্রের চর্চাও আছে, শক্তিমান ব্যক্তি। এদিককার লোক তাঁকে সিদ্ধপুরুষ ব'লেই জানে।

পরিচয় শুনে নিতে নিতেই এসে হাজির হ'লেন। হ্যাঁ, চেহারা বটে, সিদ্ধ পুরুষের চেহারা যদি হ'তে হয় তো এমনি। লম্বা চওড়া দশাসই দেহ, টকটকে ফর্সা রং, নধর নিটোল মুখখানি যেন আধপাকা টম্যাটো, টুস্‌কি দিলে রক্ত ফুটে বেরুবে। পরনে রক্তাম্বর। খালি গা, পৈতে নেই—বাহুতে কপালে রক্তচন্দনের লাইন কাটা। সার্থক কৈলাসনাথ নাম রেখেছিলেন, বাপ মা। কৈলাসনাথই বটে, যেমন গড়ন ভুঁড়ি, তেমনি মাথার জটা—বাঘটা ছালটারই যা অভাব। দেখে চোখ ভ'রে যায়।

এসে বললেন, স্মরণ করেছেন কেন ?

কী চমৎকার গম্ভীর ভরাট গলা! কোথায় লাগে তোমাদের শিশির ভাদুড়ী। দেখে মনে হ'ল, আহা এমন লোক থিয়েটারে না গিয়ে যাগ-যজ্ঞ ক'রে ম'রতে এল কেন!

সে যাক। পিসেমশাই আর নায়েবে মিলে ব্যাপারটা তো বুঝিয়ে দিলেন। শুনে কিছুক্ষণ যেন ধ্যানস্থ হ'য়ে রইলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, একটা উপদ্রব হ'য়েছে, এ রকম কথা আমার কানেও এসেছিল বটে। তবে কি জানেন, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, নিজের জপ-তপ নিয়ে থাকি। এসব পার্থিব ব্যাপারের ছিটেফোঁটা খবর কানেই আসে। ঠিক মন দেবার অবকাশ পাইনে।

পিসেমশাই বললেন, তাহ'লে এখন, কি বলেন ?

চক্রবর্তী বললেন, বলার আর কি আছে। মানুষের প্রাণ বাঁচানো নিয়ে কথা—করতেই হবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আসবে তো ?

চক্রবর্তী আমাব দিকে চেয়ে হাসলেন। ছেলেমানুষ ভোলানো হাসি। বাবা মন্ত্রের টানে স্বয়ং আদ্যা শক্তি এসে দেখা দেন, এ তো বনেব পশু। তবে একটি কথা। আমি শুধু এনেই দেব তাকে, বধ কবাব ভাব আমাব নয়।

ছ'দিন ছ'বাত ধ'বে যজ্ঞেব আযোজন হ'ল। সে কত বকমের কাঠ, কত বকমেব ঘি আব ফুল পাতা ডালপালা। আগামী শনিবারে অমাবস্যা তেবোস্পর্শ একসঙ্গে পড়েছে, ঐটিই শুভদিন।

আয়োজন হ'ল। কাছাবিব মস্তবড় উঠোন, তাব মাঝখান চেঁছে নিকিয়ে যজ্ঞেব জায়গা করা হ'ল। ঠিক সন্ধ্যেবেলায় চক্রবর্তী কাজে বসলেন।

তন্ত্রমন্ত্রেব বেশী কিছু বুঝিনে। কিন্তু সেদিন যা দৃশ্যটি দেখেছিলাম, সে আমাব সারা জীবন মনে থাকবে। প্রকাণ্ড উঠোন, মাঝখানে হোমেব জায়গা। সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, একা চক্রবর্তী, বাঘছালে বীবাসনে ব'সে। দীর্ঘ দেহটি আসনেব ওপরে সোজা টান হ'য়ে আছে, ছুটি হাত কখনও কোলের ওপবে চিৎ ক'বে রাখছেন, কখনও বা ধুনীতে একটু জল কি ঘি ফেলে দিচ্ছেন। তান্ত্রিকদের ক্রিয়ায় বোধহয় বাইবেব অনুষ্ঠান কম, ঐ একটু মাঝে মাঝে আগুনে জল বা ঘি ছিটিয়ে দিলেন, হয়তো ছুটো ভিজে চাল বা পাতা ফেলে দিলেন। কিংবা হয়তো খানিকটা জপ করলেন, ব্যস। ওদিকে কাছারির লেঠেলবা মিলে রাজ্যের ফুল আব ধূপধুনো এনে জড়ো করেছে, গন্ধে জায়গাটা যেন গম্‌গম্ ক'রছে। চারদিকে গোটা-আষ্টেক ধুনুচি থেকে অনর্গল ধূপ আর অগুরুর ধোঁয়া উঠছে, হাওয়ায় ছড়িয়ে যাচ্ছে, মাঝখানে চক্রবর্তীর সাদা ধবধবে দেহটি যেন পাথরের

মূর্তির মত সোজা হ'য়ে আছে—ধোঁয়ার বেড়া ভেদ ক'রে খানিক দেখা যাচ্ছে খানিক হয়তো যাচ্ছে না—একটা অদ্ভুত দৃশ্য। চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় যেন আমিও আর এ জগতে নেই, এ যেন অন্য কোন জগতের কাণ্ডকারখানা। এই ব্যাপার। কিন্তু, হচ্ছে একটা জীবনকে বিনাশ করবার জন্য, ভাবতেও যেন মনে লজ্জা বোধ করছি।

উঠোনে এই; উঠোনের বাইরে, চারপাশের ঘরগুলোর দাওয়ায় বারান্দায় আমরা এক-একজন এক-এক জায়গাতে ব'সে। বেশী লোক নয়। পিসেমশাই, নায়েব, আমি, আর বাছা-বাছা শিকারী জন-আট-দশ, উঠোনের চারদিক ঘিরে। এক একজনে সুবিধেমত এক একটা জায়গা নিয়ে বসে গেছি। তাদের হাতে প্লেনবোর বন্দুক, পাশে লেজা। আমার হাতে রাইফেল।

মন্ত্র যদি সত্যি হয়, বাঘ যদি সত্যিই আসে, ফিরে না যায় তার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি আমরা। এ ছাড়া বাইরের লোক কেউ নেই; বাজে লোক এসে পাছে হল্লা করে, তাই কাছারির পাইকদের বাইরের সীমানায় সীমানায় মোতায়েন করা হ'য়েছে।

কতক্ষণ ধ'রে হোম চলল বলতে পারব না। সবশুদ্ধ সে এমনই একটা অ্যাটমসফিয়ার, আমরা পর্যন্ত যেন স্থান আর কালের হিসেব ভুলে গেলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, আমরা কেউ টুঁ শব্দটি করছি না। শুধু মাঝে মাঝে চক্রবর্তীর নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। এক-একবার শ্বাস বন্ধ ক'রে তিনি জপ করছেন, আবার সেই শ্বাস ছেড়ে দিচ্ছেন, তার শব্দ। কচিৎ হয়তো বা একবার বু-বু-বু-বু ক'রে গালবাদ্য করছেন।

এত লোক, এত কাজ, সবই কিন্তু হচ্ছে অন্ধকারে। ভাদ্রমাসী অমাবস্যার রাত; তায় বৃষ্টি পড়ছে না বটে কিন্তু আকাশ একেবারে মিশকালো মেঘে ঢাকা, তারার আলোটুকু অবধি দেখা যাচ্ছে না। উঠোনেও আলো নেই, শুধু চক্রবর্তীর সামনে ধুনীর আগুনটি একবার ঝিমিয়ে আসছে, একবার দপ ক'রে জ্বলে উঠছে; আবার ঝিমিয়ে

যখন জ্বলে উঠছে তখন তার আভায় চারপাশের ধোঁয়ার কুণ্ডলীও খানিক লাল খানিক সাদা রঙে ঝকঝক ক'রে উঠছে, চক্রবর্তী মশায়কে তার মাঝখানে একটু বেশী স্পষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছে। আবাব আগুন প'ড়ে যাচ্ছে, ধোঁয়ার রঙ চক্রবর্তীর চেহাবা দুই-ই আবার প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

এমনি ক'রে বহুক্ষণ চক্রবর্তী জপ প্রাণায়াম কি করলেন। তারপর গলা খুলে মন্ত্র পড়তে সুরু করলেন। সে কি মন্ত্র আমি জানি নে—তাব মানেও বুঝি নি, কথাও মনে নেই। শুধু তার আওয়াজটি মনে আছে। একে সেই অন্ধকাব বাতেব জমজমাট হাওয়া, তায় চক্রবর্তীর ঐ চমৎকার গলা আর উচ্চারণ, তার ওপর আবার মন্তরও একেবারে আসল সংস্কৃতে, যেমন তার কথাব বাঁধুনি তেমনি তার সুরের জমক। সবসুদ্ধ যেন একটা নেশা ধরিয়ে দিলে সবাইকে। শুনতে শুনতে আর জ্ঞান রইল না আমি কে, কোথায় ব'সে আছি।

অনেকক্ষণ ধ'রে একটানা ভাবী গলায় মন্তর পড়লেন চক্রবর্তী। মানে তার বিশেষ বুঝি নি বলেছি, তবু যেন মনে হ'ল মন্তরের ভেতবেই কাকে তিনি খুব জোর দিয়ে দিয়ে ডাকছেন—এস, এস, চলে এস, চলে এস।

তারপর যা কাণ্ড হ'ল, ভাবতে এই দেখ এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মন্তর শুনতে শুনতে আমরা প্রায় বিবশ অচেতন হ'য়ে গেছি, এমন সময় হঠাৎ মন্তবের আওয়াজ থেমে গেল। চক্রবর্তী বসে ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন; টান হ'য়ে দাঁড়িয়ে, দুই হাত সামনে সোজা ক'রে দিয়ে, হাতের তাম্রকুণ্ড থেকে একবারে অনেকখানি ঘি সেই ধুনীর ওপরে ঢেলে দিলেন। আগুন একেবারে দপ ক'রে তাঁর বুক অবধি উঁচু হ'য়ে লাফিয়ে জ্ব'লে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গেই ওদিকেও ভীষণ ব্যাপার ঘ'টে গেল। মন্তরের সুর শুনতে শুনতে আমার চেতনা প্রায় অবশ হ'য়ে এসেছিল। মন্তর

থামা আর চক্রবর্তীর দাঁড়িয়ে উঠে আহুতি দেওয়া, এরই মধ্যে আমারও একটুখানি চটকা ভেঙেছে; বাইরের অন্য জিনিস কানে চোখে পৌঁছবার মত অবস্থাটা একটু ফিরে এসেছে। আহুতির আগুনটা ঠিক লাফিয়ে উঠেছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই কাছারির বাইরে থেকে একটা আচম্‌কা আওয়াজ কানে এল—কেঁউ-উ উ-উ! কুকুর যেন প্রাণভয়ে আর্তনাদ করছে। এই ডাকের মানে আমি জানি। চমকে সিধে হ'য়ে বসলাম, হাতের রাইফেল অজান্তে কখন আল্‌গা হ'য়ে এসেছিল, মুঠো ক'রে তাকে চেপে ধরলাম।

তারপরই যে কি হ'ল ভাল ক'রে চোখেও দেখতে পারলাম না। চক্রবর্তী তখনও দাঁড়িয়ে, তখনও তিনি হাত নামিয়ে নেন নি। মনে হ'ল প্রকাণ্ড হলদে একটি চাদর যেন ঝড়ে উড়ে পেছন থেকে তাঁর পিঠে এসে পড়ল, খাড়া দেহটি সামনে ঝুঁকে নুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গর-গর ক'রে একটি সূক্ষ্ম অথচ গম্ভীর আওয়াজ কানে এল। ধড়-মড় ক'রে লাফিয়ে উঠে, রাইফেল ঘুরিয়েই ঘোড়া টেনে দিলাম। তারপর ভাল ক'রে চোখ মেলে চাইলাম, চক্রবর্তীও নেই, বাঘও নেই। শুধু ধুনীর আগুনটা ছত্রাকার হ'য়ে উঠোনময় ছড়িয়ে পড়েছে।

আমরা বলিলাম, তারপর?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, তারপর আর কি। সেই রাত্রেই আলো নিয়ে বন্দুক নিয়ে আবার বেরোলাম, বহু দূর বন পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে এলাম, কোথাও কিছু নেই। কোন্ পথে যে বাঘ এল কোন্ পথে বেরিয়ে গেল তার পর্যন্ত হদিস পেলাম না।

পরদিন নদীর ধারে সে বাঘের পায়ের দাগ পেলাম, নদী পেরিয়ে সে ওপারে গিয়ে উঠেছে। তখন আর তার পেছনে ছোটা নিরর্থক—সোঁদরবন ঠেঙিয়ে বাঘ মারা যায় না। আর বাঘ যদি বা পাই সেই বাঘটাই যে হবে, তার প্রমাণ কোথায়?

আমরা নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলাম।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন,—কি, কি হল?

আমরা বলিলাম, কিন্তু বলছিলেন মন্তরের শক্তির কথা, কই, তা তো হ'ল না ?

কান্তি চৌধুরী মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, এতক্ষণ শুনলে কি ব'সে ব'সে আমার মাথা ! মন্তরের জোর নয় তো বাঘ এল কোত্থেকে, চক্রবর্তীকে খেলে কে !

আমরা ভয়ে ভয়ে বলিলাম, কিন্তু এটা যেন কিরকম হয়ে গেল। মানে, আপনি ঠাট্টা করছেন না তো ?

কান্তি চৌধুরী রুখিয়া কহিলেন, ঠাট্টা ? ঠাট্টা বুঝিস তোরা ?

আমরা দুঃখিত হইয়া বলিলাম, বুঝি নে ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, না। বুঝলে এই গল্প এতকাল ধ'রে শুনতে পারতিস না। যাঃ ভাগ !

নামের নমুনা

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

ভাদ্র মাস, ভ্যাপসা গরম। বাইরে বিষম বৃষ্টি, আপিসে পাখার তলায় ব'সে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। যতীনবাবু এসে বললেন, কান্তিবাবু, মশায়, বেড়াতে যাবেন?

যতীনবাবুকে মনে আছে নিশ্চয়ই, সেই যাঁদের দেশে গিয়ে খানসায়েবকে দেখেছিলাম! তার পরে আরও কয়েকবার গেছি সেখানে, আরও শিকার খেলেছি। বললাম, এরই মধ্যে? এই তো সেদিন এলেন দেশ থেকে! যতীনবাবু বললেন, দেশে নয়। একেবারে উলটো দেশে। বাঙাল দেশে—বরিশাল জেলায়। যাবেন? আমি বললাম, বরিশালে কেন হঠাৎ? যতীনবাবু বললেন, হঠাৎ নয়, অনেক দিন থেকেই তাগিদ আসছে। বাঘের উৎপাতে নাকি টেঁকা যাচ্ছে না গ্রামে, মেরে দিয়ে আসতে হবে। আমি বললাম, তবেই হয়েছে! এই বর্ষায় বরিশাল জেলা—সে বাঘ তো ছিপ-বঁড়শি ফেলে ধরতে হবে! যতীনবাবু বললেন, আরে না না, স্থলও চার ভাগের এক ভাগ আছে পৃথিবীতে। কবে যাবেন তাই বলুন। এনায়েৎও যাচ্ছে। আমি বললাম, এনায়েৎ? ব্যাপার তাহ'লে ঘোরালো বলুন? যতীনবাবু বললেন, তা তো একটু বটেই। ওই কথা রইল তা'হলে, আমি তাকে খবর দিচ্ছি।

যথাকালে শেয়ালদায় এসে ট্রেনে চ'ড়ে বসা গেল। আমি যতীনবাবু, এনায়েৎ—এনায়েৎ তার সেই বিরাট বোম্বাই বল্লম ঘাড়ে ক'রে এসেছে। বললাম, শুধু বল্লমে কি বাঘ মরবে এনায়েৎ?

এনায়েৎ বললে, তা কি বলা যায়! কোন বাঘ অন্তরে মরে, কোন বাঘ মন্তরে মরে। নিজের হাতিয়ার নিজের হাতে থাকা ভাল।

গাড়ি ছাড়ল। যতীনবাবুকে বললাম, বলুন দেখি এইবার, শুনি ব্যাপারটা।

শুনলাম। বরিশাল থেকে এক স্টেশন আগে নলছিটি, সেখান থেকে মাইল চারেক দূরে। গ্রামের নাম হয়বৎপুর। বাঘের উৎপাত চলছে প্রায় বছর খানেক ধ'রে। বড় বাঘ নয়, স্ট্রাইপ্‌স্‌ সে দেশে নেই, লেপার্ড। কিন্তু তারই বিক্রমে গ্রামের লোক অস্থির হয়ে উঠেছে। গরু ভেড়া ছাগল পাঁঠা হরদম চ'লে যাচ্ছে, এমন ধূর্ত বাঘ—গ্রামের লোকে, আশপাশের লোকে নানা রকমে চেষ্টা ক'রেও কিছুই করতে পারছে না। আমি বললাম, বীট ক'রে দেখা হয়েছে? যতীনবাবু বললেন, তা জানি নে। মাচান করা হয়েছে, বিষ-খাবার দিয়ে দেখা হয়েছে, খোঁয়াড় পাতা হয়েছে। সব ফেল।

খোঁয়াড় হচ্ছে, বাঘ ধরা ফাঁদ। আস্ত আস্ত বাঁশের খোঁটা পুঁতে চৌকো ঘর করা হয়, তাতে দুটো কামরা। এক কামরায় ছাগল-কুকুর একটা পুরে দেয়, অন্য কামরা দিয়ে বাঘ ঢোকে, অমনি দোর বন্ধ হয়ে যায়। ইঁদুর-ধরা বাক্সের মত। আমি বললাম, তা হয়, লেপার্ডরা গ্রামে থাকে, মানুষের কাছে-পিঠে বসবাস, মানুষকে তাই ভয়ও কম করে, মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে ধূর্তামিও রপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কোথায় বরিশাল জেলায় বাঘ—আপনার কাছে খবর পৌঁছল কি ক'রে? যতীনবাবু বললেন চট ক'রে। একজন আছেন সেখানে, সুবাদে মামাশ্বশুর। বিষয়ী লোক, ধানপান কিছু আছে, গরুবাছুর ক্রমাগত খোয়া গেলে তাঁর সমূহ লোকসান। তিনিই অতএব স্মরণ করেছেন। বললাম, তা ভাল। মামাশ্চাস্যৌ শ্বশুরশ্চেতি, বাঘ মরুক না মরুক, খ্যাটের জোগাড়টা মন্দ হবে না আশা করা যায়।

খুলনায় ট্রেন থেকে নেমে স্টীমারে চড়লাম। নলছিটিতে পৌঁছে

স্টীমার যখন ভোঁ দিলে, ভোরের আলো মাত্র ফুটে উঠেছে। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। বড় ফ্ল্যাট নয়। খোলা পন্‌টুন একটা, সেইটেই জেটি।

স্টীমার ছেড়ে চ'লে গেল। যতীনবাবু সিঁড়িতে নেমে গেলেন নৌকো ডাকতে। আমি চারিদিকটা তাকিয়ে দেখে নিলাম। নদী সেখানে পূবে-পশ্চিমে লম্বা, পূবে এগিয়ে উত্তরে বেঁকে গেছে, বাঁকের মাথায় দূরের আকাশ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, সূর্য ওঠে-ওঠে। নদী কানায় কানায় ভরা, বর্ষার ঘোলা জল—প্রায় দুধের মত রঙ, ওপারে নদীর চড়াভর্তি ধানের ক্ষেত, এদিকে নলছিটির স্টীমারঘাট সদ্য ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে। যতীনবাবু সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছেন, ও মাঝি, ভাড়া যাবে? মাঝিরা একজন সাড়া দিলে, কোথায় যাবেন? যতীনবাবু বললেন, হয়বৎপুর। মাঝি বললে, তা যেতে পারি। যতীনবাবু বললেন, কত নেবে? পাল্‌টে প্রশ্ন শুরু করলে, কজন যাবেন আপনারা? মালপত্তর কি? এই ঘাট থেকেই যাবেন তো? কখন উঠবেন নৌকোয়? হয়বৎপুর যাবেন? কলকাতা থেকে এসেছেন? দেশ কোথায় আপনাদের?

ইতিমধ্যে উলটো দিক থেকে আরেকটি স্টীমার এসে হাজির। ইনি বরিশাল থেকে এলেন, খুলনায় যাবেন। ভিড়ল, লোকজন নামালে, তুললে, ভোঁ দিয়ে ছেড়ে চ'লে গেল। আকাশ ফুড়ে সূর্যও খানিকটা উঠে পড়েছে ততক্ষণ, লাল রঙ সাদা হয়ে গেছে।

এদিকে আর দেখবার কিছু নেই, যতীনবাবুর দিকে এগিয়ে গেলাম। মাঝির জেরার জবার দিতে দিতে ততক্ষণ তিনি ঘায়েল হ'য়ে পড়েছেন প্রায়। আমি বললাম, কি হ'ল, যাবে না নৌকো? মাঝি একগাল হেসে গদগদ হয়ে বললে, দেখেন তো কর্তা, আপনাদের নিয়ে যাব না তো বাঁচব কি ক'রে আমরা? আমি বললাম, তা নৌকোটা ছেড়ে দাও না দয়া ক'রে, আমরাও না হয় বাঁচি। মাঝি বললে, আজ্ঞে, আমিও তো যাবই বলছি।

দিশী ভাষা, অদ্ভুত শুনতে, সে ভাষা ব'লে শোনাতে পারব না তোমাদের, কথাগুলোই ব'লে দিচ্ছি। এনায়েৎ বললে, যাবেই যদি তো বাধছে কোথায়? মাঝি বললে, বাধবে কেন, আপনারা এসে উঠলেই আমি ছেড়ে চ'লে যাই। আমি বললাম, ভাড়া কিছু ঠিক ক'রে নিয়েছেন যতীনবাবু? মাঝি বললে, সেজন্যে আটকাবে না। আপনাদের সঙ্গে দবাদরি কবে ক'রে থাকি আমরা? ভাড়া যা সবাই দেয় তাইই দেবেন। আর দেরি করবেন না, গোণ ব'য়ে যাচ্ছে।

মাঝি নৌকো এগিয়ে সিঁড়ির গায়ে এনে বাঁধল। এনায়েৎ বাক্স বিছানা বন্দুকেব বাক্স বল্লম একটা একটা ক'বে তার হাতে এগিয়ে দিচ্ছে, মাঝি ধ'বে ধ'রে নিয়ে নৌকোর ভেতরে সাজিয়ে রাখছে। মাল তোলা হ'লে আমরা উঠব।

মাল তোলা প্রায় শেষ, আমবা উঠতে যাচ্ছি, পাশের নৌকোর মাঝি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, হয়বৎপুরে যাবেন আপনারা, কোন্ বাড়ি?

এটা এদেব ব্যাবাম, সব বকমেব কথা অহেতুক জিজ্ঞেস করতে থাকা। যতীনবাবু বললেন, নীলু মুখুজ্জে। জান? নীলবতন মুখুজ্জে, বামুনচাকলার? সেই বাড়ি।

আমাদের মাঝি তখন শেষ একটা বাক্স হাত বাড়িয়ে ধ'রে নিচ্ছে। ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে কথাটা শুনল, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। একটু কি ভাবলে, তাবপর বাক্সটা ঠেলে দিয়ে বললে, রাখ ভাইসায়েব, ওইদিকে নামিয়ে নাও। বাক্সের এক মুড়ো তার হাতে, এক মুড়ো এনায়েতের হাতে, মাঝখানটা সিঁড়ির বেলিঙের ওপরে ভর দিয়ে রাখা। ব'লেই সে হাত ছেড়ে দিলে! এনায়েৎ আচম্‌কা ঝোঁক সামলে বললে, কি হ'ল? মাঝি বললে, আমার শরীর কি রকম লাগছে, আমি যেতে পারব না। আমি বললাম, শরীর কি রকম লাগছে? মাঝি যতীনবাবুর দিকে চেয়ে বললে, মাথাটা ঘুরে উঠল, কাল জ্বর হয়েছিল কিনা! আপনারা অন্য

নৌকোয় ক'রে যান। আমি বললাম, আর কে যাবে হে নিয়ে? পাশের মাঝিকে বললাম, তুমি যাবে? সে মাথা নেড়ে বললে, আমি আজ্ঞে নতুন মানুষ, সেদিকের খাল চিনি নে। যতীনবাবু বললেন, খাল তো একটাই, তার আর চেনাচিনি কি! যাবে তো চল, আমি চিনিয়ে দেব। সে বললে, আজ্ঞে না, আমি একা ফিরে আসতে পারব না। যতীনবাবু অন্য মাঝিদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা কেউ যাবে? দেখা গেল, কেউই জবাব দিচ্ছে না, মানে কেউই যেতে রাজি নয়। আমি বললাম, হঠাৎ হ'ল কি এদের, ও যতীনবাবু? যতীনবাবু বললেন, আমিই বুঝতে পারছি না। কি হে, কি হ'ল তোমাদের? এবার জবাব দিলে এক আধবুড়ো মাঝি, বললে, সে-পথে এখন যাওয়া যাবে না বাবু, খাল বন্ধ। আমি বললাম, এইমাত্র গোণ ব'য়ে যাচ্ছিল, এরই মধ্যে খাল বন্ধ? হ'ল কি খালের? এনায়েৎ বললে, জলের তলায় বুড়ে গেছে হয়তো। আমি বললাম, মানে আসল কথাটা হচ্ছে, তোমরা কেউ যেতে রাজি নও। বুড়ো বললে, আজ্ঞে, তা কেন হবে? যতীনবাবু বললেন, তাই তো হচ্ছে। কিন্তু না-ই যদি যাবে, এতক্ষণ কেন বললে না? আমরা মেল-স্টীমার ধ'রে ঝালকাঠিতে ফিরে যেতাম, সেখান থেকে নৌকো নিতাম। আমি বললাম, তাই চলুন না হয়। যতীনবাবু বললেন, তাই হয়তো যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তখন বললে মেলটা ফস্‌কাত না। এখন এই টাপুড়ে নৌকোয় জোয়ার উজিয়ে ঝালকাঠি পৌঁছতেই বেলা দুপুর হ'য়ে যাবে। আমি বললাম, তা তো বটেই। কিন্তু এরা এমনটা করছে কেন বলুন তো? এনায়েৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে বললে, মামাশ্বশুরের দেশ কিনা, তামাসা করল একটু জামাইবাবুর সঙ্গে। আমি বললাম, তাহ'লে কি করা ঠিক করলেন যতীনবাবু? যতীনবাবু বললেন, তাই তো ভাবছি, এখন ঝালকাঠি ঘুরতে যাওয়া মানে বাড়ি পৌঁছতে দিন কাবার। আমি বললাম, কিছু নয়, এদের বাঁদরামি—পয়সা কামাবার ফিকির, জানে এখন দায়ে প'ড়েই

আমরা ঘুর-পথে যাব, দুগুণ ভাড়া দেব। সে দিচ্ছি নে, এইখান থেকেই যদি ফিরে যেতে হয় কলকাতায়, তাই যাব বরং। কিন্তু নৌকো ছাড়া অন্য কিছু নেই? যতীনবাবু বললেন, অন্য কি থাকবে আর। জল-কাদার দেশ, টমটম-পাল্কির চলন নেই এ দেশে। আমি বললাম, পাল্কি কেন, হাঁটাপথ নেই কি? যতীনবাবু বললেন, তা আছে। কিন্তু সে পথে এখন দারুণ কাদা, সে ঠেলে যাবেন কি ক'রে? আমি বললাম, সাঁতরে যাব, তবু এদের পায়ে ধরব না। চলুন আপনি, কোন্ দিকে পথ?

স্টেশন-মাস্টারের জিম্মায় মালপত্র রেখে দিয়ে, বন্দুকগুলো শুধু ঘাড়ে ক'রে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। মালের জন্যে পরে লোক পাঠাব।

কাঁচা রাস্তা, বেশ খটখটে, কাদা প্রায় নেই। দু' ধারে জলভরা ধানক্ষেত, তার ওপরে সকালবেলার রদ্দুর, চমৎকার লাগছে হাঁটতে। মাইল তিন সাড়ে তিন সোজা রাস্তা—তার ডালপালা নেই, তার পর গ্রামের শুরু। পথ জেনে নিতে হবে, দুজন লোক উল্টো দিক থেকে আসছে। যতীনবাবু ডেকে শুধোলেন, বলতে পারেন, নীলু মুখুজ্জে মশায়ের বাড়িটা কোন্ দিকে হবে?

কথা শেষ হ'ল না, লোক দুটো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজনে একবার চোখোচোখি করলে, একজন ফিসফিস ক'রে অন্যজনকে কি বললে, তারপর ফিরে উল্টোমুখে হাঁটা দিলে। আমরা ভ্যাবাচ্যাকা। যতীনবাবু তবুও অন্য লোকটিকে ডাক দিলেন, জানেন ভাই পথটা?

যে লোক আমাদের দিকে ফিরে চাইল, তার চোখ-মুখে যেন ভয় ফুটে বেরুচ্ছে। বললে, আজ্ঞে না, জানি নে। ব'লেই লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের ছাড়িয়ে চ'লে গেল। আমি বললাম, হ'ল কি ব্যাপার? যতীনবাবু বললেন, আমিও তাই ভাবছি। আমি বললাম, বাড়ির নাম শুনেই ভয়ে আঁৎকে উঠছে এরা, সেই বাড়িতেই কি বাঘের বাসা নাকি? আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় পাচ্ছে এরা? যতীনবাবু

বললেন, ভাব দেখে তো তা মনে হয় না, ভয়টা যেন এদের নিজেদেরই। এনায়েৎ বললে, ভয় ব'লে ভয়, ভয়ের ঠেলায় খালের ভরা-ভাদ্দর জল শুকিয়ে গেল, নৌকো চলল না বলে।

আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছে, মাঝিরা ভয়ে আসতে চায় নি।

কিন্তু এত ভয় কিসের? বাঘ যদি থাকেও বা, ধরলাম না হয় সেই বাড়িতেই বাঘের বাসা। তবু, মানুষজনও তো রয়েছে সেখানে। বললাম, যতীনবাবু, বাঘের খবর যা পেয়েছেন, ম্যান-ইটার কি? যতীনবাবু বললেন, তা তো শুনি নি। গরু-ছাগল নিচ্ছে, এইটুকুই জানি। কেন? বললাম, ম্যান-ইটার হ'লে এদের ভয়ের হেতুটা কিছু বুঝতাম। যতীনবাবু বললেন, হতেও পারে। হয়তো ম্যান-ইটার শুনলে ঘাবড়ে যাব আসতে চাইব না ভেবে ওটুকু আর খুলে বলেন নি তাঁরা।

এনায়েৎ খুব ভ্রূ কুঁচকে কি ভাবছে। খানিক পরে বললে, এই নীলু মুখুজ্জে লোকটা কে? এঁদের নৌকোঘাট, না, এঁদেরই বাড়ি? যতীনবাবু বললেন, এঁরই বাড়ি। আমি বললাম, কি রকম? আপনারা বোস, নীলু মুখুজ্জে আপনার মামাশ্বশুর হ'লেন কি ক'রে? যতীনবাবু বললেন, আহা, সত্যি মামাশ্বশুর তো নয়, সুবাদে। মানে কি, দিদিশাশুড়ীর ধর্মছেলে, সেই খাতিরে শাশুড়ী ঠাকরুণের ভাই। আমি বললাম, শ্বশুরবাড়ি কোথায় আপনার, এই দেশে? যতীনবাবু বললেন, মোটেই না, মাদলাতে। মানে, দিদিশাশুড়ী গিয়েছিলেন কাশীতে, ইনি সেখানে তখন টোলে পড়ছেন। সেইখানে আলাপ; তাই থেকে সম্পর্ক পাতানো। আমি বললাম, কি করেন ভদ্রলোক? দেশেই থাকেন? যতীনবাবু বললেন, খুব বেশি খবর আমিও জানি নে। কলকাতায় গেলে-টেলে দেখা হ'য়েছে দু' একবার—এইমাত্র। দেশেই থাকেন, শিষ্য-যজমান জমি-জিরেত আছে বেশ কিছু, স্বচ্ছল অবস্থা।

শুধু সচ্ছল অবস্থা বলাটা যতীনবাবুর বিনয়। বেশ বিরাট অবস্থা, সেটা বাড়িতে ঢুকেই টের পেলাম। অনেক বিঘে জমি নিয়ে বাড়ি। বাস্তুবাড়িটা পাকা, বাইরের দিকে অনেক ছোট বড় টিনের ঘর—কাছারি, ঠাকুরবাড়ি, চণ্ডীমণ্ডপ। ঢুকতেই চোখে পড়ল গরু বাছুর ধানের গোলা অনেক। আর চোখে পড়ল একটি প্রাণী, মনে ক'রে রাখবার মত। একটি খাসী। খাসী অত বড় হয় ধারণা ছিল না। ছোটখাট একটা গরুর চাইতেও বড়, কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, পেল্লায় শিং, গা ব'যে যেন তেল গড়াচ্ছে। অথচ রামছাগল নয়, এই এমনি দিশী ছাগলেব জাত। এনায়েৎকে বললাম, দেখেছ? এনায়েৎ বলল, দেখেছি।

নীলু মুখুজ্জে ভেতর বাড়িতে ছিলেন, খবর পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমরাও বারান্দায় উঠে গেলাম। যতীনবাবু নুয়ে প্রণাম করলেন, আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম, এনায়েৎ বল্লমটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে সেলাম করলে।

যতীনবাবু চিনিয়ে দিলেন, ইনি কান্তি চৌধুরী, আমার আপিসের বন্ধু, খুব বড় শিকারী। আর এ হচ্ছে এনায়েৎ, আমাদের দেশের শিকারী, বাঘ-ভালুক খুঁজে বার করতে এর জুড়ি নেই। এনায়েৎ আবার হাত তুলে সেলাম করলে। কিন্তু ততক্ষণ নীলু মুখুজ্জে বেগনী মুখুজ্জে হ'য়ে গেছেন। লম্বা কালো দোহারা চেহারা, সামনের দিকে অল্প টাক প'ড়ে কপালটা চওড়া দেখাচ্ছে বিদ্যেসাগরের মত; মুখটা লম্বা, সামনের দাঁতগুলো বড় আর চ্যাপটা চওড়া। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, তুই যে অ্যাদ্দুর এসে উঠেছিস? নেমে যা, নীচে গিয়ে দাঁড়া!

এনায়েতের দিকে তাকিয়ে আমি প্রমাদ গণলাম, ফাটে বুঝি! এনায়েৎ কিন্তু খুব সামলে নিলে। মুখ তুলে মুখুজ্জের দিকে চাইলে একবার, তারপর যতীনবাবুর দিকে। যতীনবাবুর চোখ মাটির দিকে হ'য়ে গেছে। তারপর কথাটি না ব'লে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ব'য়ে নীচে

নেমে গেল। খানিক দূরে স'রে গিয়ে, এদিকটা পেছন ক'রে চারদিক চেয়ে দেখতে লাগল—যেন কিছুই হয়নি। আমি মনে মনে ভগবানকে ডেকে বললাম, বড় বাঁচিয়ে দিলে যা হোক!

বাইরের দিকে, কাছারি মহালের একটা ঘরে আমাদের দুজনের জায়গা দেওয়া হ'ল। এনায়েৎ সেই ঘরেরই বারান্দায় শোবে, পাশের এক মুসলমান বাড়ি থেকে খেয়ে আসবে। ঠিক হ'ল সেদিনটা আমাদের বিশ্রাম, পরদিন থেকে বাঘের সন্ধানে লেগে যাব আমরা।

দুপুরবেলা। খেয়ে-দেয়ে উঠে দুজনে আমরা খাটে শুয়ে পড়েছি, এনায়েৎও ও-পাট সেরে এসে জুটেছে। একথা-সেকথা গল্প হচ্ছে। মুখুজ্জের নাম কিন্তু কেউই তুলছি না সাহস ক'রে। তখন সামলে গেছে, কিন্তু ক্ষেপলে এনায়েৎ কি কাণ্ড বাধাবে তার ঠিক নেই। আমরাও সে কথা খুঁচিয়ে তুলছি না। যতীনবাবু ইতিমধ্যেই এক ফাঁকে আমাকে ব'লে দিয়েছেন, এমন জানলে আসতাম না আমি, অন্তত এনায়েৎকে নিয়ে আসতাম না। এখন ভালয় ভালয় ওকে নিয়ে ফিরে যেতে পারলেই বাঁচি। আমি বলেছি, এসে যখন পড়াই গেছে, ভেবে তো আর লাভ নেই, যা হোক ক'রে সামলে-সুমলে চ'লে যাওয়া।

কিন্তু, চ'লে যে যাব, বাঘ মারতে এসেছি, বাঘের খোঁজ ক'রে তবে তো যাওয়া। মুখুজ্জের কথায় এসেছি বটে, কিন্তু বাঘ তো নীলু মুখুজ্জের একার সম্পত্তি নয়, সে হ'ল গোটা গ্রামের শত্তুর। নীলু মুখুজ্জে লোক যেমনই হোক, গ্রামের লোককে না বাঁচিয়ে ফিরি কি ক'রে?

কার্তিক জল নিয়ে এল। এদের চাকরান প্রজা, এই গ্রামেরই ছেলে। বছর-বাইশের তাগড়া জোয়ান ছেলে, চেহারাটি সুন্দর, মনটিও হাসিখুশি। একে ভার দেওয়া হয়েছে আমাদের তত্ত্বাবধানের, সেদিক দিয়ে মুখুজ্জের ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। সব ব্যাপারেই উৎসাহ, বাঘ মারার ওস্তাদ শুনে এনায়েতের তো ন্যাওটা হ'য়ে পড়েছে ক' ঘণ্টার মধ্যে। দুজনের মধ্যে শলা-পরামর্শও সারা হ'য়ে গেছে এরই

মধ্যে—এনায়েৎ যখন বাঘ খুঁজতে বেরুবে, কার্তিক থাকবে একেবারে তার সঙ্গে সঙ্গে, এ সব কথা ইতিমধ্যেই পাকা।

জলের কলসী গুছিয়ে রাখলে কার্তিক, দুটি গ্লাসে জল ভ'রে খাটের পাশে পাশে রেখে দিলে। দিয়ে কিন্তু চ'লে গেল না, লাজুক লাজুক মুখ ক'রে শুধোলে, কখন বেরোবেন আপনারা বাঘ মারতে?

কার্তিকের বিপুল উৎসাহের খবর আমরা তার আগেই পেয়ে গেছি এনায়েতের মুখে। বললাম ব'স। কার্তিক খুশি হ'য়ে মেঝেয় চেপে বসল। যতীনবাবু বললেন, যাব তো বটেই, তার আগে বাঘের হাল-হদ্দ আমাদে একটু বাতলে দাও, শুনি। কত বড় বাঘ? কার্তিক বললে, তা বেশ বড়ই হবে। মানে, চোখে তাকে দেখিনি কেউ, তবু ডাক শুনেই তো বোঝা যায় আকারটা! তা ছাড়া মস্ত বড় বড় বলদ-গরু বেমালুম নিয়ে চ'লে যাচ্ছে, মাটিতে ছেঁচড়ে নেবার দাগ পর্যন্ত নেই, এই থেকেই বুঝুন তার বিক্রম কতখানি! যতীনবাবু বললেন, তা বটে, তবু? থাবার দাগ-টাগ পাওয়া যায় না? কার্তিক বললে, কি জানি! কেই বা দেখে দাগ আর কেই বা চেনে! যতীন-বাবু বললেন, বাঘ ক'টা? একটাই, না, বেশি? কার্তিক বললে, একটাই তো লোকে বলে। যারা ডাক শুনেছে তারা বলে, একটারই ডাক। বাঘ অনেকগুলো হ'লে ডাকও রকম রকম হ'ত। সব মানুষের কি গলার আওয়াজ সমান? এনায়েৎ বললে, খুব ডাকে বুঝি? কার্তিক বললে, তা ডাকে। রোজই ডাকে না তাই ব'লে। বেরোয় যেদিন সেই দিনই ডাকে—ডাক শুনলেই আমরা বুঝি আজ আবার কারু কপাল ভাঙল। যতীনবাবু বললেন, তা হ'লে তো ভালই হ'ল এনায়েৎ, তুমি ডেকেই তাকে নিয়ে আসতে পারবে। এনায়েৎ বললে, সেই কথাই ভাবছি। কার্তিক বললে, ডেকে বাঘ আনবে কি? মন্তর জান বুঝি এনায়েৎদাদা? এনায়েৎ বললে, তা কিছু কিছু জানতে হয় বইকি ভাই, নইলে বাঘ-ভালুকের দেশে প্রাণ বাঁচে কি ক'রে? সে যাক, তোমার বাঘের কথা বল শুনি। এর

বাসা কোনখানে? কার্তিক বললে, সেই তো মুশকিল, বাসা কোথায় কেউ চেনে না। এক-এক দিন এক-এক জায়গাতে হাঁক দেয়; জন্তু-জানোয়ার যেগুলো খাবে—সমস্ত এমন বেমালুম শেষ ক'রে দেয়, তার চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না আর। আমি বললাম, একে মারবার চেষ্টা করে নি কেউ? কার্তিক বললে, কেন করবে না, অনেকে করেছে। এদিকের বড় শিকারী এলেমদ্দি হাওলাদার, তারপর গিয়ে গিরিজা শিকদারের ভাই ছোটখোকা, সব হেরে গেছে। বরিশাল থেকে সায়েবরা এসেছিল, তারা পর্যন্ত পারে নি। এমন বাঘ, ঘর ভেঙে নেয়, মাঠ থেকে নেয়; কিন্তু খোঁয়াড় পাতলে তার পাশ দিয়েও হাঁটে না। আমি বললাম, আচ্ছা, বীট ক'রে দেখেছ কি কেউ? মানে, একধার থেকে জঙ্গল ঠেঙিয়ে? কার্তিক বললে, না। সে দেখবেই বা কে? গ্রাম জুড়ে ঝোপজঙ্গল, মস্ত মস্ত মরা-দীঘিই আছে দশ-বারোটা, নল-খাগড়া আর ভারাবনে ভর্তি। সে জঙ্গল ঠেঙানো কি সোজা কথা? যতীনবাবু বললেন, গাঁয়ের মধ্যে জঙ্গল ঠেঙানো যায়ও না। বাঘ যদি মারা না যায়, তাড়া খেয়ে সে ক্ষেপে ওঠে—সেটা বিষম বিপদের কথা। আচ্ছা কার্তিক, তুমি যে বললে, হাঁক শুনলেই বুঝি কারু কপাল ভাঙল, তার মানে কি? কার্তিক বললে, মানে আর কি! যেদিন বাঘ নামে না, নামে না—তার সাড়াশব্দও কেউ পায় না। নামে যেদিন, তার ডাকে যেন পাড়াসুদ্ধু কেঁপে ওঠে। মানুষ-জন ভয়ে ঘরের দুয়োর এঁটে দেয়। বাঘ মজা ক'রে গোয়াল ভেঙে লুট করে। দারুণ দুরন্ত বাঘ। আমি বললাম, কিংবা বল বীরপুরুষ বাঘ, জানান না দিয়ে লুট করে না। কার্তিক বললে, তা যা বলেন। কিন্তু কাণ্ড যা ক'রে বেড়াচ্ছে, সে ব'লে বোঝানো যায় না। এই তো বছরখানেক ধ'রে চলছে ব্যাপার, এর মধ্যে অন্তত গুটি-পঞ্চাশেক গরু গেছে গ্রামের, ছাগল-পাঁঠা তো কত গেছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। ভাবুন তো যুদ্ধের বাজার, একটা বাছুর বিকোচ্ছে পঞ্চাশ টাকায়, খাসীটা একটু বড় হ'লে তার দাম সত্তর-

আশি। এ কি মানুষে সইতে পারে? আমি বললাম, ভাল কথা। কাত্তিক, কালো খাসী দেখলাম একটা, বিরাট বড। ওটা কাদেব?

কাত্তিকের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। বললে, দেখেছেন? ও হচ্ছে ঠাকুরমশাযের পোষ্যপুত্তুর, আমরা বলি—কালু মুখুজ্জে। আমি বললাম, বাহা রে খাসী, রামছাগলও অত বড হ'তে দেখি নি কখনও। এই দেশের কোন জাত বুঝি? কাত্তিক বললে, জাত-টাত কিসের, এমনি দিশী পাঁঠাবই জাত। আদরে যত্নে ওই রকম হযেছে। বযস কিন্তু বেশি নয, জোর বছর দুই। ঠাকুবমশাযেরও অদ্ভুত মাযা ওব ওপরে, নিজেব একটা হাত কেটে দেবেন তবু ওর এতটুকু অযত্ন হ'তে দেবেন না। এনাযেৎ বললে, ভারি মাযা তো। কাত্তিক বললে, এটা ওঁদের চিরকেলে ঝোক কিনা, ছেলেবেলা থেকেই দেখছি। দক্ষিণে কোথায মহাল আছে, সেখান থেকে প্রতি বছর ধান চাল আসে, বড বড পাঁঠা আব খাসী আসে। ছাডা খেযে খেয়ে মস্ত বড হয এক-একটা। সেই পাঁঠা ছাড়া এঁদের পূজো-আচ্চায মন ওঠে না। গ্রামের লোকে নাম দিযেছে বড পাঁঠার বাডি। যতীনবাবু হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন, বেড়ে নামটি তো হে। কাত্তিক সঙ্গে সঙ্গে মুখ-চোখ শুকনো ক'রে বললে, মাপ করবেন বাবু, হঠাৎ ব'লে ফেলেছি। ঠাকুবমশাযের কানে গেলে রক্ষে থাকবে না, জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন আমাকে। এনাযেৎ বাঁকা চোখে কাত্তিকের দিকে একবার তাকিযে আবার চোখ ফিরিযে নিলে। বললে, সে যাক। বাঘের ডাক কবে শোনাচ্ছ তাই বল। কাত্তিক বললে, ডাকলেই শোনাব। পূর্ণিমা পেরিযে গেল তো, এইবার ডাকবে। আমি বললাম, তার মানে? ডাকের আবার শুভদিন আছে নাকি এব? কাত্তিক বললে, কি জানি, দেখছি তো আঁধার রাতেই বেশির ভাগ ডাকে। সবাই জানে।

পরদিন সকালবেলা গ্রাম দেখতে বেরুলাম। আমরা তিনজন আর কাত্তিক। মস্ত বড় গ্রাম। এককালে জৌলুষ ছিল বোঝা যায়।

গোটা গ্রামকে আলু-চেরা ক'রে এক-একদিকে রাস্তা বেরিয়ে গেছে—বস্তিপাড়া, বামুনপাড়া আর মুসলমানপাড়াই বড় তার মধ্যে। বেশির ভাগই খুব বড় বড় বাড়ি, মানে দালান-ইমারত অনেক তা নয়—বিরাট বিরাট জমি নিয়ে বাড়ি বাগান পুকুর। কিন্তু বেশির ভাগই শ্রীহীন, মানুষজন নেই, জঙ্গলে ভরা। বড় বড় দীঘিও অনেক, সবই মঁজে গেছে, হোগলা নলখাগড়া আর তারাবনে ঢাকা। কার্তিক বলেছে ঠিক, সে গ্রাম বীট করা শিবের অসাধ্যি। আর সেই অরণ্যের মাঝখানে কোন্‌খানে যে তিনি লুকিয়ে ব'সে আছেন, সে বার করতে হ'লে জ্যোতিষ জানতে হয়।

যতীনবাবু বললেন, এনায়েৎ, কেমন বুঝছ, পারবে কিছু করতে? এনায়েৎ বললে, আল্লা ভরসা। তাঁর যদি দয়া না হয়, বাঘের গা মাড়িয়ে চ'লে যাব, টের পাব না। আর তাঁর যদি দয়া থাকে, বাঘ নিজে হেঁটে বাড়ির উঠোনে এসে ধরা দেবে। কার্তিক বললে, ভাল কথা। কাল কি যেন বলেছিলেন জামাইবাবু, ডেকে নিয়ে আসবে বাঘকে? এনায়েৎ বললে, সে সময় হ'লেই ডাকা যাবে। ব্যস্ত কেন, দু-চার দিন যাক। কার্তিক বললে, দু-চার দিনে কি হবে দাদা? দেখছ তো হয়বৎপুর পরগণা, যত না জমি তার বেশি জঙ্গল। আমি বললাম, আচ্ছা, এর নাম হয়বৎপুব হ'ল কি ক'রে? কার্তিক বললে, তা কি আর জানি আমরা, শুনে আসছি হয়বৎপুর। যতীনবাবু বললেন, ও তো বোঝাই যায়। মুসলমানী নাম। হয়বৎ, মানে হায়বৎ ব'লে কেউ ছিল কোনকালে, তার নামে নাম হয়েছে। আমি বললাম, তা নয়, দেখছেন না সব বিলকুল মাঠ আর জল? এ দেশের সব মানুষ ঘোড়া রাখত, ঘোড়ায় চ'ড়ে চলাফেরা করত, তাই নাম হয়বৎপুর, মানে, ঘোড়াওয়ালাদের দেশ। এনায়েৎ দূরে একটা গাছের মাথায় তাকিয়ে কি দেখছিল, চোখ না ফিরিয়েই বললে, আজ্ঞে না, ওর মানে হচ্ছে ঘোড়মুখোর দেশ। যতীনবাবু টিপে বললেন, সেরেছে।

পরদিন ভোরবেলা এনায়েৎ একা-একাই বেরিয়ে গেল।

নীলু মুখুজ্জে আমাদের যত্ন-আত্তির ক্রটি রাখেন নি। সেদিন এসে বসলেন, বললেন, একা মানুষ, সবদিকে নজর রাখতে পারি নে। অসুবিধে তো হচ্ছে না কিছু? বললাম, মোটেই নয়, আপনি ব্যস্ত হবেন না। মুখুজ্জে বললেন, কেমন দেখলেন গ্রাম? আমি বললাম, গ্রাম আর কই, সবই তো জঙ্গল। বাঘের পক্ষে চমৎকার স্থান বটে। মুখুজ্জে বললেন, কি রকম বুঝছেন, হবে কিছু? আমি বললাম, সেটা বরাত। হয়তো দু'দিনেই হিল্লে হয়ে যাবে, হয়তো বছর ধ'রেও কিছু হবে না, শুধু হাতেই ফিরে যাব। তবে এক ভরসা এনায়েৎ। মুখুজ্জে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তার মানে? আমি বললাম, মানে জঙ্গল পিটিয়ে এ বাঘকে ধরা অসম্ভব। ফাঁদ পেতেও তো নাকি কিছুই হয় নি শুনলাম। এখন যদি কিছু পারে তো এনায়েৎই পারবে। মুখুজ্জে বললেন, কি পারবে? আমি বললাম, বাঘকে খুঁজে বার করতে। এ ব্যাপারে অসম্ভব ক্ষমতা ওর। মুখুজ্জের মুখ হাঁড়ি হয়ে উঠল, বললেন, কি ক'রে পারবে? মন্তর জানে? যতীনবাবু বললেন, তার চেয়ে বেশি। মন্তর কানে না শুনলে ফল নেই, ও বাঘকে খুঁজে বার ক'রে তার কানে মন্তর শোনায়। মানে, জন্তু-জানোয়ারের চলন-বলন সম্বন্ধে ওর মত বিদ্বান আমি অন্তত আর দেখি নি। মুখুজ্জে উদাসীন গলায় বললেন, বেশ বেশ, পারলেই ভাল। তা, গেছে কোথায়? যতীনবাবু বললেন, কি জানি কোথায়! ব'লে তো গেল—ঘুরে আসছি। বলা যায় না কিছু। হয়তো জঙ্গলেই ঢুকেছে গিয়ে। মুখুজ্জে বললেন, তবেই হয়েছে, গেলে আর ফিরতে হবে না! আমি বললাম, ও অমন যায়, আবার ফিরেও আসে। মুখুজ্জে বললেন, এলেই ভাল। মুখুজ্জে উঠে গেলেন। যতীনবাবু বিছানার ওপরে চিৎ হয়ে পড়লেন। বললেন, নাও ঠ্যালা। বুঝছেন কিছু?

না বোঝার কি আছে! মুখুজ্জে এনায়েতের নাম অবধি সইতে পারছেন না; তিনি ঘোরতর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ফোঁটা-টিকির

এগজিবিশন-বিশেষ; কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, এনায়েৎ ম্লেচ্ছ হয়ে তাঁর বারান্দায় পদার্পণ করেছে। এনায়েতেরও মুখুজ্জের নাম শুনলেই রোঁয়া ফুলে উঠছে, কিছুতেই ভুলতে পারছে না মুখুজ্জে তাকে মুখ খিঁচিয়েছেন। মাঝখানে থেকে মরণ হয়েছে আমাদের। বাঘই খুঁজি, না, এদেরই সামলাই।

যতীনবাবু বললেন, ভাল বিপদ বেধেছে যা হোক। ধর্ম-ধর্ম ক'রে এখন সটকাতে পারলে বাঁচি।

অনেক বেলায় এনায়েৎ ফিরে এল। যতীনবাবু বললেন, কোথায় গিয়েছিলে? এনায়েৎ বললে, দেখে এলাম একটু ঘুরে। যতীনবাবু বললেন, খালি-হাতে গিয়েছ, জঙ্গলের দিকে যাও নি? এনায়েৎ বললে, জঙ্গলে যাব কেন? গিয়েছিলাম পথ ধ'রে ধ'রে ঘুরে বেড়াতে। বাজারটাও দেখে এলাম একটু। আমি বললাম, তারপর, খোঁজ খবর পেলে কিছু? এনায়েৎ বললে, পেলাম বইকি। প্রভুর নাকি গুণের অন্ত নেই। গ্রামসুদ্ধু লোক মুঠোর মধ্যে। একবার যে খপ্পরে পড়েছে তার আর নিস্তার নেই, জাল জুচ্চুরি ঘর-জ্বালানো কিছুই বাদ যায় না।

আমি বললাম, তার মানে? এনায়েৎ বললে, মানে আবার কি! এদিকে নিষ্ঠের অন্ত নেই, অথচ হেন পাপ নেই যা করেন নি। গাঁয়ের লোক দু' বেলা নামাজ করে—হে হরি, হে আল্লা, টেনে নাও। সকালবেলায় নাম নেয় না, নিলে নির্ঘাত উপোস। যতীনবাবু বললেন, আহা, কি আপদ! বাঘের খবর পেলে কিছু? এনায়েৎ বললে, বাঘের খবর বাজারে পাব কি, বাঘ কি বাজারে ওঠে? যতীনবাবু বললেন, তবে কি কম্মটা করলে সারাদিন ধ'রে? এনায়েৎ বললে, কম্ম আবার কি করব, মাটি চষব? বাজারে গেলাম, বেড়িয়ে দেখলাম লোকজন দোকানপাট, বাস্। যতীনবাবু বললেন, বাস্, হয়ে গেল? এলে বাঘ খুঁজতে, তার কি? এনায়েৎ বললে, রেখে

দিন বাঘের কথা, কে যাবে বনজঙ্গল ঢুঁড়তে তার জন্যে? তারপর চিৎ হ'য়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। চালটাকেই বোধহয় উদ্দেশ ক'রে বললে, একটা জিনিস বড় ভাল দেখলাম এখানে, বাজারের দোকানে ভারি সুন্দর সুন্দর মাটির হাঁড়ি। গোটাকতক নিয়ে যাব ভাবছি। যতীনবাবু বললেন, ধুত্তোর! বাঘের দেখা নেই, মাটির হাঁড়ির হিসেব শুনে কি করব? এনায়েৎ সমান ঝেঁজে উত্তর দিলে, আছে মাটির হাঁড়ি, হিসেব দেব কি তাজমহলের? যতীনবাবু আর ঘাঁটালেন না, পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

তিন দিন, চার দিন কেটে গেল। এনায়েৎ সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কোথায় যে যায় তাও বুঝি নে। বুঝি নে নয়, তার মানে বুঝি নে। মানে, যায়ই না কোথাও। বনের দিকে তো নয়ই। বাজারে যায়, পথ ধ'রে ধ'রে হেঁটে বেড়ায়, হ'ল বা রাস্তার পোলের ওপর চ'ড়ে তার রেলিঙে পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকে। আবার যখন মন হ'ল না, বেরুল না—চিৎপাত হ'য়ে ঘরেই প'ড়ে রইল সারাদিন।

আমাদের ওদিকে ত্রিশঙ্কু অবস্থা। সারাদিন ব'সে ব'সে চালের বাতা গুণছি আর ভাবছি, মুখুজ্জে কবে বাড়ি থেকে ঠেলে বার ক'রে দেবেন—এমন শুধু-শুধু বসিয়ে লোকে আপন জামাইকেও খাওয়ায় না। গ্রামের লোক প্রথম দু' একদিন ভিড় করেছিল শিকারী দেখতে, কবে বাঘ মারা হবে জানতে—তারাও আর আসে না, বুঝে গেছে ওসব ভুয়ো কথা। একমাত্র কার্তিকই হাল ছাড়ে নি, এনায়েৎ কখন একখানা জোর ভেল্‌কি দেখিয়ে দেবে সেই ভরসায় ব'সে আছে; সারাক্ষণ তার পেছন পেছন ঘুরছে।

পাঁচ দিনের দিন যতীনবাবু আর পারলেন না, বললেন, ও এনায়েৎ, হ'ল কি? এনায়েৎ বললে, হবে আবার কি? যতীনবাবু বললেন, বাঘটাঘ কি বার করবে কিছু খুঁজে, না, শুধু শুধুই ব'সে লোকের অন্নধ্বংস করব আমরা? এনায়েৎ বললে, বেশ তো পাচ্ছেন

পরের ভাত, খেয়ে নিচ্ছেন দু'দিন, ক্ষেতি হ'ল কিছু? বাঘ তো আমার ট্যাঁকে গোঁজা নেই যে, বলা মাত্তর খুলে বার ক'রে দেব। যতীনবাবু চ'টে গেলেন। বললেন, আমরা পারি নে এমন ক'রে ব'সে খেতে, লজ্জা করে। তার চেয়ে বল না কেন, দেশেই ফিরে চ'লে যাই। এনায়েৎ বললে, বেশ তো যান না, কে ধ'রে রেখেছে? আপনারা চ'লে যান কালই। যতীনবাবু অবাক হয়ে বললেন, তুমি? এনায়েং বললে, আমি যাব কি ক'রে? বাঘকে ধরতে হবে না?

কাটল আর দু'দিন। বুধবারে এসেছি, মঙ্গলবার। রাত দুপুরে হঠাৎ একটা গোলমাল উঠল। দূরে কোথাও খুব কুকুর ডাকছে, মানুষের হৈ-চৈও আছে তার সঙ্গে। আমরা কান খাড়া ক'রে রইলাম, কি হ'ল? কার্তিক ছুটে এসে বললে, বাঘ বেরিয়েছে আবার। যতীনবাবু বললেন, কত দূর হবে জায়গাটা? কার্তিক বললে, ঠিক তো ঠাওরে পাচ্ছি নে কাদের বাড়ি, তবে অনেক দূর। মুসলমানপাড়ার দিকে। এনায়েৎ উঠে ব'সে কান পেতে শুনছিল। শুয়ে পড়ে বলল, কাল দেখা যাবে।

পরদিন জানা গেল, বাঘই বটে, হালের গরু নিয়ে গেছে একটা। কার্তিককে নিয়ে এনায়েৎ দেখতে চ'লে গেল, কোথায় কাদের বাড়ি। ফিরে এসে কিন্তু একটিও কথা কইলে না।

সারাদিন কাটল, সন্ধ্যার পরে খেয়ে নিয়ে আমরা শুয়ে পড়েছি। রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে—কার্তিক এসে চুপিচুপি ডাকলে, জেগে আছ, ও দাদা? এনায়েৎ জবাব দিলে, শুনেছি। দাঁড়াও যাচ্ছি।

আমরাও জেগে গেছি এদের কথায়। আমাকে বললে, চলুন। আমি বললাম, বন্দুক নেব তো? এনায়েৎ বললে, দরকার হবে না, তবু ভয় করে যদি, নিয়েই আসুন।

মানে তার ইচ্ছে নয়, বন্দুক নিই। আমি কিন্তু সে ইচ্ছে মানলাম না, বন্দুক নিয়েই বেরোলাম।

বাড়ি থেকে পথ বেরিয়ে সরকারী রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, আমাদের

ঘর থেকে সে রাস্তা কিছু না হোক তিন শো হাত হবে। সেই রাস্তার ওপরে চার জনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, কোন দিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। তারপর হঠাৎ কার্তিক ফিসফিসিয়ে বললে, ওই শোন।

আমরাও শুনলাম। দূর থেকে একটানা ডাক ভেসে আসছে—ঘ্যাত্‌র্‌র্‌—ঘ্যাত্‌র্‌র, যেন করাত দিয়ে কাঠ ফাড়ছে কেউ। শুনে বোঝা যায় অন্তত পাঁচশো হাত দূরে সে আছে, তবু হঠাৎ মনে হয় এই বুঝি একেবারে কানের কাছে এসে পড়ল।

মিনিট দুই চলল ডাক, ডেকে থামল। আবার চলল, এমনি ক'রে একবার থামে, একবার শোনা যায়। যতীনবাবু বললেন, ডেকে দেখবে?

এনায়েৎ একটু ভাবলে, একটু কান পেতে শুনলে, তার পর বললে, দেখলে হয় ডেকে। আমাকে বললে, তৈরি থাকুন।

ব্যাপারটা কি আমার আন্দাজি জানা ছিল। বনের পথে বেরিয়ে বাঘ ডাকে বাঘিনীকে, বাঘিনী ডাকে বাঘকে। বাঘিনীর মত গলা ক'রে ডাক দিলে সে বাঘ সোজা ছুটে এসে হাজির হয়। চোখে দেখি নি কখনও, বইয়েই পড়েছি। দেখা যাবে ভেবে মনটা খুশি হ'য়ে উঠল, বন্দুকে গুলি পূরে তৈরি হ'য়ে দাঁড়ালাম। যতীনবাবু বললেন, খুব হুঁশিয়ার কিন্তু। দূর যদিও, এ-দূর পার হয়ে আসতে বাঘের সময় লাগে না।

পথের ওপর খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, পরে ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা. বাঘ এসে হঠাৎ দূরে থেকেই দেখতে না পায়। এনায়েৎ মাটিতে উবু হযে বসল, মুখের দুই পাশে হাত রেখে চোঙার মত বানিয়ে আওয়াজ ছাড়ল।

আওয়াজ বটে! অবিকল বাঘের ডাক—কিন্তু হামেশা যেমনটা শুনতে হয় ঠিক সে রকম নয়। বাঘের গম্ভীর গলার সঙ্গে যেন একটু আহ্লাদে আবদেরে আওয়াজ মিশেছে, গর্জনের মধ্যেও যেন রিনরিন

ক'রে একটা ঘুঙ্‌রের আওয়াজের মত মিষ্টি রেশ ভেসে বেড়াচ্ছে, যে ডাক শুনলে বুক কেঁপে ওঠে, আবার তারই মধ্যে অদ্ভুত একটা নেশাও লাগে।

একবার ডাকল এনায়েৎ—তুবার, তিনবার ডেকে থামল। যতীনবাবু আমাকে ঠেলা দিয়ে বোঝালেন, হুঁশিয়ার!

আমরা দাঁড়িয়েছি একরকম পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে—বাঘ যেদিক থেকেই আসুক যেন চোখ না এড়ায়, আচমকা ঘাড়ে এসে পড়তে না পারে।

বাঘ কিন্তু এল না। তিন মিনিট, চার মিনিট, পাঁচ মিনিট কেটে গেল। এনায়েৎ আবার মুখে হাত তুললে, আবার সেই মিষ্টি রিনরিনে আওয়াজ ছাড়ল। একবার, তু'বার ডেকে থেমে গেল।

আবার আমরা তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম। যতীনবাবু আমার কানে কানে বললেন, এইবার!

বাঘ তবুও এল না। আবার চার-পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। তারপর যতীনবাবু আবার বললেন, আবার ডাক। এনায়েৎ হাই তুলে বললে, কি হবে ডেকে, ও আজ আসবে না। যতীনবাবু বললেন, কি ক'রে জানলে? এনায়েৎ বললে, ও তো বোঝাই যায়, আসবার হ'লে এতক্ষণ এসে যেত। বাঘে বাঘিনীতে ঝগড়া হয়েছে হয়তো, কথা বন্ধ। দেখলেন না! এর গলা শুনেই ও চট্‌ ক'রে থেমে গেল? আমি বললাম, দূর, তাই নাকি হয় কখনও?

এনায়েৎ ততক্ষণ বাড়িমুখো পা বাড়িয়েছে। বললে, হয় কি না হয়, শুধিয়ে আসুনগে বাঘকেই। মানুষের হয়, বাঘের হবে না কেন?

ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম, মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেল।

পরদিন সকালবেলা মুখুজ্জে এলেন। বললেন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি দিন তু'য়েকের জন্যে। কার্ত্তিক রইল। যা যখন দরকার, ওকে ব'লবেন। ব'লে গেলাম, যা চাইবেন, ও জোগাড় ক'রে দেবে।

যতীনবাবু বললেন, যাচ্ছেন কোথায়? মুখুজ্জে বললেন, কাছেই, অভয়নীল। শিষ্য-বাড়ি আছে, ঘুরে আসতে হবে একবার। পরশু বিকেল নাগাদ ফিরব। তবু যদি হঠাৎ দরকার হয় খবর দেবেন।

দরকারও আর হয়েছে, খবরও দিয়েছি! সে বাঘেরই পাত্তা নেই, খবর দেব কিসের?

এনায়েৎ কিন্তু হঠাৎ ঝেড়ে উঠল। মুখুজ্জে সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন, দুপুরবেলায় এনায়েৎ কার্ত্তিককে বললে, গাঁয়ের লোক সব ডাকতে পার আজ বিকেলে? কার্তিক বললে, বিকেলে কেন, এখুনি পারি। কি বলব? এনায়েৎ বললে, বলবে—মানে, আর তো ব'সে থাকা যায় না এমন ক'রে, হেস্তনেস্ত একটা ক'রে ফেলতে হয়। ডাক সবাইকে, দেখি কি হয়!

বিকেলবেলা সদরের আটচালায় লোক জড় হ'ল, ছোট বড় ছেলে-বুড়ো কেউ প্রায় বাদ নেই। এনায়েৎ বললে, আপনাদের আমি ডেকেছি। কথা হচ্ছে, এই বাঘকে না মারলে নয়, আমরাও আর ব'সে থাকতে পারছি নে। আজ আমরা একটা বড় রকম চেষ্টা ক'রে দেখব। আপনাদেরও সাহায্য একটু চাই। পাঁচ-সাতজন একসঙ্গে হৈ-হৈ ক'রে উঠল, কি সাহায্য? এনায়েৎ বললে, বেশি কিছু নয়। যতদূর বুঝলাম, জঙ্গল পিটে বা খোঁয়াড় পেতে এ বাঘকে কায়দা করা যাবে না। এর জন্যে ফাঁদ পাততে হবে, নতুন রকম ফাঁদ। আমি বললাম, কি রকম? এনায়েৎ বললে, ঘরের ভেতরে ফাঁদ পাতব আমরা। মানে, বার-দেউড়ির গায়ে ভাঙা ঘর আছে না একটা? ওই ঘরে জানোয়ার বেঁধে রাখব। মাচানে বসব না, বসলে গন্ধে বাঘ টের পেয়ে যাবে। সেই জানোয়ারের গলায় একটা থলে ঝুলিয়ে, তাতে বালি পুরে দেব, বাঘ যখন তাকে টেনে নিয়ে যাবে, থলের ফাঁক দিয়ে বালি ঝ'রে ঝ'রে পড়বে। সেই নিশানা ধ'রে আমরা বাঘের বাসা বার করব।

এ আইডিয়াটা মন্দ নয়। কার্তিক বললে, কিন্তু গাঁয়ের লোক কি

করবে এতে ? এনায়েৎ বললে, কিছু করবে না, মানে, যে-যার জন্তু-জানোয়ার সামাল ক'রে ঘরে পুরে রাখবে সবাই, যেন বাঘ আর কোথাও কিছু খুঁজে না পায়। এই কাজটিই করতে হবে আপনাদের, খবরদার, একটা গরু-বাছুর পাঁঠা-ছাগল হাঁস-মুরগী যেন কারু বাইরে না থাকে। অন্য যদি কোথাও কিছু না পায়, তখন বাধ্য হয়েই আমার এখানে আসতে হবে বাছাধনকে।

সবাই মাথা নেড়ে বললে, শক্ত কি, আমরা এখনই গিয়ে ব্যবস্থা করছি। এনায়েৎ বললে, আর একটি কথা। বাঘ আসবেই, আজ না আসুক কাল আসবে, কাল না আসে পরশু। এই ক'টা দিন কিন্তু আপনারা কেউ সন্ধ্যের পরে ঘরের বার হবেন না। মানে, মানুষের সাড়া পেলে বাঘ নাও বেরোতে পারে। তা ছাড়া, আদার নিয়েছে দেখলেই আমরা তার পিছু নেব। চোট পেয়ে যদি বাঘ স'রে যেতে পারে, যাকে সামনে পাবে তাকেই খাবে। খবরদার, কেউ এ ক'টা রাত ঘরের বার হবেন না।

সবাই বললে, বেশ কথা। আমি বললাম, তবে আর কি, সভা ভঙ্গ। কাত্তিক, যাও, আদার জোগাড় কর। শূয়োরের ছানা পাবে একটা কোথাও ? এনায়েৎ বললে, শূয়োর নয়, পাঁঠা বাঁধব আমি। আমি বললাম, তবেই হয়েছে। পাঁঠা বেঁধে আবার সেবারের মত আহাম্মক হওয়া তো ? এনায়েৎ বললে, হবেন না। সে ছিল ডোরাদার। এরা গেরস্থ বাঘ, সব খায়। আমি বললাম, তাহ'লে কাত্তিক পাঁঠাই খুঁজে এনো একটা। এনায়েৎ বললে, খুঁজতে আবার যাবে কার বাড়িতে। আর পাবেই বা কোথায় খুঁজে, গাঁয়ে কি বাকি আছে কিছু। ঐ খাসীটাকেই লাগিয়ে দেব। কার্তিক বললে, সব্বনাশ, ঠাকুমশায়ের খাসী। খুন হ'য়ে যাব এনায়েৎদাদা ওর কিছু হ'লে, ঠাকুরমশায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে আমাকে। এনায়েৎ বললে, যা যাঃ, পোঁতে সবাই। বাঘই যদি মারতে পারি, পাঁঠার মামলা পরে ঢের সামলানো যাবে। বুড়োমতন একজন বললে, কাত্তিক কিন্তু কথা মিছে

বলে নি। ও খাসী ঠাকুরমশায়ের বড় ভালবাসার খাসী। এনায়েৎ বললে, আরে, তাই ব'লেই তো। অমন নধর খাসী, ওর লোভ বাঘ ছাড়তে পারবে না। বুড়ো বললে, তারপর, ঠাকুরমশায় যখন ফিরে আসবে? এনায়েৎ বললে, আজ কাল এই দুদিন তো আসছেন না। এই দুটো দিন ওকে বাঁধি না আমরা। তারপব, পবশু যদি তিনি আসেন, তখন না হয় একে ছেড়ে আরেকটা খুঁজে নেব।

সভা ভঙ্গ হ'ল। যতীনবাবু বললেন, এনায়েৎ কি সত্যিই তাই করবে নাকি? এনাযেৎ বললে, ফালতু কথা এনাযেৎ কয় না। যতীনবাবু বললেন, তারপর, মুখুজ্জে যখন বাড়ি ফিরে শুনবে তার সাধের খাসী বাঘের পেটে গেছে, কি কাণ্ডটি বাধাবে তার হিসেব আছে? এনায়েৎ বললে, কচু। খাসী যদি যায়, তবে বাঘও যাবে। আর তার পরে আমাদেরই বা এখানে ব'সে থাকবার দরকার কি ঘরজামাই হ'য়ে? ট্রেনে স্টীমারে গিয়ে উঠব—মুখুজ্জে এসে দেখবে, পাখি উড়েছে।

যতীনবাবু বললেন, কর যা প্রাণ চায়। মাব-টার একচোট না খেয়ে আর বাড়ি ফেরা গেল না দেখা যাচ্ছে। এনায়েৎ বললে, মার অমনি খেলেই হ'ল। বাক্স-বিছানা গুছিয়ে রেখে দিন না, কাজ হাসিল হবামাত্তর দেবেন চম্পট। আমি বললাম, আজই গোছাব? এনায়েৎ বললে, এক্ষুণি।

রাত ন'টা। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ব'সে আছি, এনায়েৎ তার বল্লমকে ঘ'ষে-মেজে আরও চকচকে করেছে। আমার তো বন্দুক বিকেল থেকেই তৈরি।

কার্তিককে এনায়েৎ বললে, খাসীকে জল-টল খাইয়ে নিয়েছ ভাল ক'রে? বেশি ডাকাডাকি না করে। কার্তিক বললে, সে নিচ্ছি। কিন্তু সত্যি কথা এনায়েৎদাদা, ও-খাসী যদি যায় তবে আমিও গেছি। এনায়েৎ বললে, ধেত্তেরি, এক কথা বার বার ভ্যান্‌ভ্যান্ করে। কি

হবে খাসী গেলে, ঠাকুরমশায় কি জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে তোকে? না হয় আমাদের সঙ্গেই পালিয়ে চ'লে যাবি। তিনকুলে আছে কে তোর? ধমক খেয়ে কার্তিক আর কথা কইলে না। খাসীকে জল খেতে দিই। ব'লে সটকে পড়ল।

এনায়েৎ গজগজ ক'রে বললে, ভক্তি দেখলে পিত্তি জ্ব'লে যায়। জায়গা-জমি যেটুকু যা ছিল সব ঠাকুরমশায়ের পেটে সেঁধিয়েছে; ভাই ছিল একটা না খেয়ে মরেছে, নিজে তবু তারই দোরে পেটভাতায় খাটছে, মায়া দেখ! খাসী যায়, যার খাসী তার যাবে—তো হতভাগার বুক ফাটে কেন রে? আমি বললাম, বুক কি আর সাধে ফাটে, ফাটে প্রাণের দায়ে! শুনলে না বললে, ঠাকুরমশায় ওকেই খাবে এসে! এনায়েৎ বললে, হ্যাঃ, খায় অমনি! বেশি তেড়িমেড়ি করে তো দেখিয়ে দিয়ে যাব যার নাম ভেল্‌কি। যতীনবাবু বললেন, দোহাই বাবা এনায়েৎ, আর ভেল্‌কি দেখিয়ো না। এমনিতেই ভয়ে ভয়ে আছি—কখন তোমরা ছ'জনে হাতাহাতি বাধাও একটা, তার ওপরে আবার ভেল্‌কি ঝাড়লে আর বেঁচে বাড়ি ফেরা যাবে না। এনায়েৎ বললে, না যেতে পারেন থেকে যাবেন, ঘরজামাই হওয়া তো সুখের কথা। আমার কি, আমাকে কেউ জামাইও করবে না, আদর ক'রে ধ'রেও রাখবে না।

রাত দশটা। খাসী নিয়ে আলো হাতে চারজনে বেরুলাম। বাড়ির লোকজন চাকর-বাকর কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যে হ'তেই সব ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে।

বাড়ির পথ আর সরকারী রাস্তার মোড়, যেখানে দাঁড়িয়ে বাবকে ডেকেছিল এনায়েৎ, তারই গায়ে একটা ছোট্ট পোড়ো ঘর। ভাঙা-চোরা, একদিকের বেড়া আধখানা নেই। সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে মোটা দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে খুব পোক্ত ক'রে খাসীকে বেঁধে দিলে এনায়েৎ। ফিরে পোঁটলামতন একটা তার গলায় ঝুলিয়ে দিলে।

সব শেষ ক'রে বললে, এবার চলুন। যতীনবাবু বললেন, সেকি, সত্যি সত্যি ঘরে ফিরে যাব নাকি আমরা? মাচানে বসব না? এনায়েৎ বললে, মোটেই না। বসলে বাঘ আসবে না। কার্তিক ভয়ে ভয়ে বললে, কিন্তু বসলে হয়তো খাসীটা বাঁচত। এনায়েৎ বললে, না-ই যদি বাঁচে, নির্বংশ তো আর হবেন না ঠাকুরমশায়! বাঘ পেতে গেলে তার দাম দিতে হয়।

ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম চারজনে। কার্তিকও আর নিজের ঘরে যাচ্ছে না, সেইখানেই গুটিসুটি মেরেছে মেঝের ওপর।

ঘণ্টাখানেক গেল, তারপর এনায়েৎ হঠাৎ ডেকে বললে, উঠুন এবার কর্তাবা! সবে একটু চোখ লেগে এসেছে, ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। কি হ'ল? এনায়েৎ বললে, আস্তে কথা বলুন, বাঘেরও কান আছে এ দেশে। যতীনবাবু বললেন, কান তো আছে, বাঘ কোথায়? এনায়েৎ বললে, ওই শুনুন। অনেক দূরে কোথা থেকে ঘ্যাত্‌ব্‌র্‌ ক'রে আওয়াজ ভেসে এল। বাঘ বেরিয়েছে।

আলো নিবিয়ে, বন্দুক বল্লম আর টর্চ নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লাম চারজনে। অন্ধকারে চুপচাপ চ'লে এসে ঘরের কাছে পৌঁছলাম। ঘর থেকে খানিক দূরে একটা ঝাঁকড়া বকুলগাছ।

এনায়েৎ ফিসফিস ক'রে বললে, উঠে পড়ুন। খুব আস্তে, ডালে-পাতায় শব্দ না হয়।

গাছে মেলাই ডাল, হাতের পাঁচ আঙুলের মত সবদিকে ছড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে থাকে থাকে। ডালের ওপর এক-এক ধাপে পা ছড়িয়ে বসলাম, চারজনে মুখ চারদিক ক'রে। বাঘ আবার ডেকে উঠল। মনে হ'ল খানিকটা কাছে চ'লে এসেছে।

অন্ধকার ঘুরঘুট্টি, নিজের হাতখানাকেও দেখা যায় না। টর্চ আছে অবশ্য, কিন্তু জ্বালবার হুকুম নেই। গায়ে-পিঠে মশা কামড়াচ্ছে, মারা নিষেধ।

পনের মিনিট কাটল। আধ ঘণ্টা। বাঘ আর ডাকছে না।

অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণে চোখ মেলে ব'সে আছি, সেই আলকাতরার দেওয়াল ফুঁড়ে দেখবার চেষ্টা করছি ; যদি কিছু চোখে পড়ে। একটু ছায়া, হ'ল বা একটু নড়াচড়ার আভাস। কোথাও কিছু নেই। চোখে জোর দিয়ে দিয়ে চোখ জ্বালা করছে। এনায়েৎকে কানে কানে বললাম, ডেকে দেখবে নাকি একবার ? এনায়েৎ বললে, চুপ।

আরও আধ ঘন্টা। তারপর হঠাৎ খুট ক'রে একটু শব্দ কানে এল, চমকে উঠে কান পাতলাম। ঠিকই শুনেছি, শুকনো কাঠি পড়ে ছিল, পায়ের চাপে ভেঙে গেল কাঠি। এসেছে।

আরও পাঁচ মিনিট ! মিনিট তো নয়, সেঞ্চুরি। তারপর হঠাৎ ডাক বেজে উঠল, ঘরটার ঠিক ও-পাশ থেকে। খাসীটা, মনে হ'ল একবার লাফ মেরে উঠে নিশ্চল হয়ে গেল। লেপার্ডের ডাক অনেক শুনেছি, কিন্তু সে ডাক যেন ডাকের রাজা। কি গুরুগম্ভীর আওয়াজ —মনে হ'ল চারদিকের হাওয়া পর্যন্ত গুড়গুড় গুড়গুড় ক'রে কেঁপে উঠছে। দু'বার, তিনবার, চারবার ডেকে বাঘ থামল। আমি বন্দুক বাগিয়ে ধ'রেছি। যতীনবাবুর একটি হাত আলগোছে আমার পিঠে একটুখানি ঠেকেই আবার ফিরে চ'লে গেছে। আমার ঠিক পেছনে ব'সে কার্তিক, তার পা ঠকঠক ক'রে কাঁপছে টের পাচ্ছি, গাছের গায়ে ঠেসে ব'সে সে কাঁপুনিকে থামাবার চেষ্টা করছে, নিশ্বাসের শব্দকে জোর ক'রে চেপে রাখছে। এনায়েৎ একদৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে আছে।

বাঘ আবার ডাকল। এবার ঘরের আর-এক পাশে—ভাঙা বেড়ার দিকে। মানে, ঘরটাকে ঘুরে আসছে। নিঃশব্দে বন্দুক ঘুরিয়ে তৈরি হ'য়ে রইলাম। আর একটু ঘুরে এলেই ফায়ার করব।

বাঘ একবার হাঁক দিলে, দিয়ে আবার থামল। আবার হাঁক দিলে, দিয়ে থামল। থামতেই এনায়েৎ বলা নেই কওয়া নেই চেঁচিয়ে হেঁকে উঠল—ভাঙল নীলু মুখুজ্জের কপাল! সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দুম ক'রে বিরাট এক আওয়াজ। মস্ত বড় একটা দেহ যেন ধড়াস ক'রে মাটিতে আছড়ে পড়ল। বিষম কাতর গলায় কে গেঙিয়ে উঠল, আল্লা!

এ কি কাণ্ড! বরিশাল জেলা মুসলমানের দেশ, তাই ব'লে তার বাঘেও কি আল্লা কয়? তখন ভাববার সময় নেই। আওয়াজ হ'তে-না-হ'তে এনায়েৎ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েছে, ঘরের দিকে দৌড়চ্ছে আর বলছে, নেমে পড়ুন শিগগির। আমরাও ঝুপঝাপ নেমে পড়লাম।

গাছ থেকে ঘর হাত পনের-কুড়ি জোর। পার হ'যে পৌঁছতে পৌঁছতেই টর্চ জ্বেলে ফেলেছি। অবাক কাণ্ড! মস্ত বড় জোয়ান একটা লোক মাটিতে প'ড়ে লুটোচ্ছে। এনাযেৎ ত'র শিযরে দাঁড়িযে। মাথার ঝাঁকড়া চুল দুই হাতে কড়াক্কড় ক'রে মাটির ওপরে ঠেসে রেখেছে। বললে, দড়ি আছে আমার কোমরে। ঠেসে ধরুন, বেঁধে ফেলুন খুব ক'ষে।

কাকে বাঁধছি, কেন বাঁধছি, কে তখন ভাবে! তিনজনে মিলে খুব মজবুত ক'রে বেঁধে ফেলা হ'ল তাকে। তারপর এনাযেৎ চুলের মুঠো ধ'রে এক রাম-হ্যাচকা দিযে তাকে খাড়া ক'রে বসিযে দিলে। টর্চের আলোয় দেখলাম, প্রকাণ্ড মুখ, মস্ত বড় জোযান।

এনায়েৎ বললে, চলুন নিযে। কাত্তিক, খাসাটাকে খুলে নিয়ে আয়।

ঘরে এনে তাকে এক পাশে বসিয়ে দিলাম। এনায়েৎ বললে, কই গো, মাথা তোল, দেখি মুখখানা! লজ্জা কেন?

সে মুখ তুলছে না। এনাযেৎ চুল ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে মুখ উঁচু ক'রে দিলে। তখন দেখলাম, তার সমস্ত মুখটা প্রকাণ্ড হ'যে ফুলে উঠেছে। সারাটা মুখময় ছোট ছোট খোঁচার দাগ রক্তমুখো হ'য়ে উঠেছে, খুব দূর থেকে ছর্‌রা গুলি লাগলে যেমন হয়। এনায়েৎ বললে, ও কাত্তিক, চিনিস একে? কার্তিক বললে, চিনি। করিম। নাচনমহলে বাড়ি। এনাযেৎ বললে, তা ভাল। আজ রাতটা শুয়ে ব'সে কাটিয়ে দাও কোনক্রমে, কাল তখন নাচতে নাচতে শ্বশুরবাড়ি চ'লে যাবে।

সকাল না-হ'তে আটচালায় লোকারণ্য। গ্রামসুদ্ধ ছেলেবুড়ো

ভেঙে এসে পড়েছে। রাত না-পোয়াতে নলছিটিতে লোক ছুটেছে থানায় খবর দিতে। কার্তিক দৌড়েছে অভয়নীল।

রোদ চ'ড়তে-না-চ'ড়তে সবাই এসে হাজির। মুখুজ্জেমশাই, থানার দারোগা সিপাই, আশপাশের গাঁয়ের লোক। করিমকে নিয়ে এসে এক পাশে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। সে এক ভাবেই মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল। দারোগা বললেন, কি ব্যাপার, করিম মিঞা? করিম উত্তর দিলে না। এনায়েৎ বললে, ব্যাপার আর কি! আঁধার রাতে বাঘের ডাক ডাকছে। লোকজন ভয়ে ঘরে ঢুকে দোর দিচ্ছে, ব্যস্, আরামসে গরু ছাগল নিয়ে চ'লে যাওয়া হচ্ছে।

করিম শুনলাম পুরোনো দাগী চোর। জেলও কয়েকবার খেটেছে। তবে এবারকার কায়দাটা নতুন। দারোগা বললেন, চল, পুরোনো বাড়িতেই আবার চ'ল যাওয়া যাক। কিন্তু এনায়েৎ মিঞা, তুমি কায়দাটা বুঝে ফেললে কি ক'রে, সেটা তো শুনে নিতে হচ্ছে। মামলা উঠলে আদালত শুনতে চাইবে। এনায়েৎ বললে, করি আর কি! রোজ রোজ বাঘে গরু নেয় ছাগল নেয়, অথচ না পাওয়া যায় তার পায়ের দাগ, না থাকে মাটিতে সে জানোয়ারের দাগ; সে বাঘ কি উড়ে আসে, উড়ে যায়? শিকারকেই না হয় তুলে নিয়ে যাচ্ছে, মাটিতে তার রক্তের ফোঁটা একটাও পড়ছে না কেন? এই দেখেই প্রথম সন্দেহ হ'ল। তারপর দেখলাম, এ বাঘ গরু ছাগল নিয়ে যায়, কুকুর কিন্তু নেয় না। অথচ গুলবাঘার সবচেয়ে পছন্দই হচ্ছে কুকুর। তারপর ধরুন, সত্যি সত্যি বাঘ বেরুলে কি কুকুর ডাকে কখনও? কুকুর তখন চুপচাপ গিয়ে খাটের তলায় সেঁধোবে। দারোগা বললেন, এই থেকেই বুঝে নিলে? এনায়েৎ বললে, এই থেকেই বলতে পারেন। তবু যেটুকু সন্দেহ ছিল, ডাক দিয়ে ভেঙে গেল। বাঘিনীর ডাক শুনে ছুটে চ'লে আসে না, হাঁকডাক থামিয়ে চুপসে স'রে পড়ে যে বাঘ, তাকে বাঘ বলে? দারোগা বললেন, বুঝেছ ঠিকই, বাহাদুর বলতে হবে তোমাকে। কিন্তু ধরার কায়দাটা কি করলে, বল তো শুনি?

এনায়েৎ বললে, কায়দা আর কি জানি! ওই খাসী বাঁধলে চোরের সাধ্য নেই লোভ সামলায়। কাজেই খাসী বাঁধা হচ্ছে—সে খবরটা ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিলাম। তারপর তো কথা, ঠাকুরমশায় দু'দিন থাকবেন না, খাসীকে বাঁধবার দুটি দিন মাত্র মেয়াদ। বাঘকে এর মধ্যে আসতেই হবে। দারোগা বললেন, তারপর, ধরলে কি ক'রে ওকে? এনায়েৎ বললে, ও-কথা ছেড়ে দিন। সে দিয়ে আর কি হবে? দারোগা বললেন, আহা, বলই না! মুখে-চোখে ছিটে গুলির মত বিঁধেছে ওর, খাসীর গলায় বোমা ঝুলিয়ে রেখেছিলে বুঝি? এনায়েৎ বললে, হ্যাঁঃ, বোমা! বোমা পাব কোথায়? দারোগা বললেন, তবে?

বিষম ঝোলাঝুলি। এনায়েৎ বলবে না, আমরাও ছাড়ব না—সবাই মিলে মহা হৈ-চৈ। সবাই যখন হেরে ভূত, নীল্ মুখুজ্জে একেবারে মারমুখো হ'য়ে উঠলেন। বললেন, ব্যাটা ছোটলোক, এতগুলো লোক তোমায় সাধাসাধি করছে, আর তোমার ততই মান বাড়ছে, না? কোথায় পেলি বোমা, তাই বল্? এনায়েৎ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। মুখে কথা নেই, ভেতরে ফুলে ফুলে উঠছে। যতীন-বাবুর মুখ কালি হয়ে গেছে, কি না-জানি ঘ'টে যায়! আমি পেছনে তাকিয়ে দেখছি, এনায়েৎ যদি লাফ মেরে ঠাকুরকে নিয়ে চেপে পড়ে, দৌড়টা দেব কোন্ দিক দিয়ে। দারোগারও মুখ গম্ভীর, মুখুজ্জের কথাটা পছন্দ হয় নি তাঁর। দারোগাই সামলে নিলেন শেষ পর্যন্ত। একটু চড়া গলায় বললেন, ওসব বলার দরকার কি? এনায়েৎ চোখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালে, মুখের থমথমে ভাব একটু যেন কেটে এল। বাঁচালে। দারোগা বললেন, এতগুলো লোক জিজ্ঞেস করছে, ব'লেই দাও কথাটা। এমন তাজ্জব দেখিয়ে দিলে, লোকে শুনতে তো চাইবেই। ভয় নেই তোমার, বোমা যদি দিয়েও থাক, আমি সামলে নেব। এনায়েৎ ঘাড় ফিরিয়ে সবার দিকে তাকালে। শেষে বললে, বলতেই হবে? দেখবেন শেষে আমার দোষ না হয়। দারোগা

বললেন, কিচ্ছু দোষ হবে না, আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। এনায়েৎ যতীনবাবুকে চোখ টিপে ডাকলে, ফিসফিস ক'রে বললে, সব গোছানো আছে? যতীনবাবু বললেন, আছে। কেন? এনায়েৎ বললে, বলি তাহ'লে? নীলু মুখুজ্জে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, সেই দয়া করতেই তো বলা হচ্ছে তখন থেকে! বল, আমরা শুনে কেতাত্থ হই—কোথায় পেলে বোমা? এনায়েৎ চোখ তুলে চালের দিকে চাইল। বললে, বোমা কোথায় পাব, যা করেন মেটে হাঁড়ি। দারোগা বললেন, তার মানে? এনায়েৎ বললে, হাঁড়ি মুখে দিয়ে ও বাঘ ডাকত। সেই হাঁড়িটাই বোমা হয়ে ফেটে গেল, ওকে জখম ক'রে দিলে। মুখুজ্জে চোখ কুঁচকে বললেন, সে হাঁড়ি ফাটল কিসে? ফুসমন্তরে?

এনায়েৎ তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল। খুব শান্ত স্থির গলায় বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। নীলু মুখুজ্জের নাম করতেই ফেটে গেল।

ক্যামেরার কামড়

কান্তি চৌধুরী বলিলেন ·

বায়োস্কোপের ফোটো তোলে, তাকে বলে শুটিং। সার্থক নাম। বন্দুকের গুলীতে মানুষ একবারে মরে যায়। ফোটোতে একবার উঠে গেলে আর নামতে পারে না, তিলে তিলে ঝুলে ঝুলে মরতে হয়। আর ফোটোও তো এখন আর সে-ফোটো নেই—হাঁটাচলা কথাবার্তা নাচগান, সবই উঠে যাচ্ছে ফোটোতে; হাড়-পাঁজরা ফুঁড়ে নাড়িভুঁড়ির ভেতরে কোথায় কী হচ্ছে তাও রেহাই পাচ্ছে না। কবে হয়ত শুনব মনের কথা আর চিন্তার ছবি উঠে যাবে ক্যামেরায়। আমি তাই মরে গেলেও ফোটো তুলতে দিই না কখনও, কে জানে কার মনে কী কু রয়েছে।

একবারের কথা বলি।

খুলনা জেলার দক্ষিণ জুড়ে সুন্দরবন, তার গায়ে গায়ে লোকালয়। সুন্দরবন আবাদ করে সে-লোকালয়ের পত্তন, তাই তার নামই হয়েছে আবাদ। জঙ্গলে আর মানুষে সেখানে দিবারাত্রি লড়াই – মানুষ ক্রমাগত জঙ্গলকে ঠেলে পিছনে হঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; জঙ্গলও আবার ফাঁক পেলেই ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে চলে আসছে, আবাদকে আবার গহন বন করে ফেলছে। জঙ্গলের সেই আক্রমণের অগ্রগামী স্কাউট হচ্ছে বাঘেরা। বন যখন এগিয়ে আসে, তার আগে আগে বাঘেরা এসে লোকালয় শূন্য করে দেয়।

চাকরি করা বছর কয়েক হয়েছে তখন। শিকারের নেশাও জমজমাট হয়ে ধরেছে, ছুটিছাটা পেলেই বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এমনি এক ছুটিতে খুলনায় গিয়ে দাখিল হলাম।

ছোট্ট শহর, কিন্তু ভারী ঝকঝকে তকতকে। আর শহর হিসেবে বাড়িঘর বেশ বড় বড়—হঠাৎ দেখলে রীতিমত সমৃদ্ধ লোকদের দেশ বলে মনে হয়। আমি যে-বাড়িতে উঠেছি, সে তো রীতিমত একটা রাজবাড়িমার্কা কাণ্ড।

গিয়েছি, কোন্ পথে কীভাবে গেলে আবাদ অঞ্চলে পৌঁছনোর সুবিধে তার খোঁজখবর নিচ্ছি, এমন সময় সুযোগ পায়ে হেঁটে এসে হাজির হল। এ-বাড়ির এক ছেলে উকিল, সতীনবাবু নাম, তিনি খবর দিলেন, বন্দুকে শান দিয়ে তৈরি হোন, নৌকো খুঁজতে হবে না আর, নৌকোই আপনাকে খুঁজছে।

কী ব্যাপার? না, এস-ডি-ও সাহেবের শখ হয়েছে বাঘ মারতে যাবেন; শহরে তাই দল জোটানো হচ্ছে। প্রফুল্লবাবু বলে একজন উকিল, তাঁর ওপরে ভার পড়েছে যোগ্য সঙ্গী জোগাড় করবার। প্রফুল্লবাবু বার-লাইব্রেরিতে বলছিলেন, ইনি আমার নাম করে এসেছেন। প্রফুল্লবাবু এই এলেন বলে।

শুনে চক্ষুস্থির! বাঘ-টাঘ মারতে যাই, সে এক কথা। কিন্তু মফস্বলের ক্ষুদে হাকিম, সে সাঙ্ঘাতিক চিজ। কোথা থেকে কী ঘটে যাবে, শেষে যদি বাঘ মারতে এস-ডি-ও মেরে বসি, তখন?

বললাম, করেছেন কি মশায়। শিকারে যাব, নিজের ইচ্ছে-খুশি। সায়েব-সুবোর ল্যাজ ধরে যাওয়া মানে তো সেই ল্যাজ চুলকোতেই দিন কাবার। শিকার করব কখন?

সতীনবাবু বললেন, কেন, শিকারের বাধাটা কোথায়?

বললাম, কোথায় যে, সে বলে বোঝাব কী করে।

বলতে বলতেই প্রফুল্লবাবু এসে হাজির হলেন। আমাদের চেয়ে দু'তিন বছরের ছোটই হবেন; ছোটখাট মানুষটি, চোখে মুখে বুদ্ধি যেন ফুঁড়ে বেরুচ্ছে। বললেন, কী বোঝাবেন?

সতীনবাবু বললেন, দেখ তো! খালি বলছেন, এস-ডি-ও'র সঙ্গে ভিড়ে শিকারে গেলে নাকি শিকার হবে না।

প্রফুল্লবাবু বললেন, কেন, এস-ডি-ও'র অপরাধ ? এস-ডি-ও'কে দেখেই কি ভাবছেন বাঘগুলো সব পটাপট পড়ে পড়ে মরে যাবে, আপনার জন্যে একটাও বাকি থাকবে না ? আমাদের তেমন এস-ডি-ও নয়। বেশ ভাল চেহারা।

আমি বললাম, চেহারার কথা বলছি নে। চেহারা সুন্দর-কুচ্ছিত বুঝুক বাঘেরা, যারা খেতে আসবে। আমি ভাবছি মেজাজ।

প্রফুল্লবাবু বললেন, আরে না না মশায়। আগে থেকে ঘাবড়ে যান, বাঘ মারবেন কি ক'রে তাহলে।

আমি বললাম, বাঘ দেখে ঘাবড়াইনে আমি, কিন্তু নাকছাটা সয় না আমার। আমাকে বাদ দিন আপনারা।

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'আহা, সুবিধেটা দেখছেন না ? সায়েব যাচ্ছেন, লঞ্চ যাবে, খাবার-দাবার, কোথায় থাকব কোথায় শোব কিছুমাত্র ভাবতে হবে না ; আর লোকলস্কর সৈন্যসামন্ত এত যাবে যে, তার কোলাহলে তিন মাইলের ভেতরে বাঘ তো বাঘ বেজিরও দেখা পাবেন না, আঁচড়-কামড় খাবারও ভয় থাকবে না। এ হ'ল, বুঝলেন না, বাঘের মনে বাঘও বেঁচে রইল, আমরাও যে যার প্রাণ নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম, অথচ মাঝখান দিয়ে শিকারটিও দিব্যি করা হ'য়ে গেল। যাব না বললে হচ্ছে না স্যর, যেতে আপনাকে হ'লই।

বললাম, আপনিই বা এত ক'রে লেগেছেন কেন বলুন ? অমন অহিংস শিকারে আমার ভক্তি নেই।

প্রফুল্লবাবু বললেন, আহা, ভক্তি আপনার থাকবার কথা কি। আপনার উপরে আমাদের থাকলেই হ'ল।

বললাম, কিন্তু আমি না গেলে কি হয় ?

প্রফুল্লবাবু বললেন, না গেলে আপনার কিছু হয় না, কিন্তু গেলে আমাদের বেশ কিছু হয়। অন্তত আমার তো বটেই।

বললাম, তার মানে ?

—মানে, ব্যাপারটা বুঝুন। এস-ডি-ও সায়েব, মানে সায়েব নয়,

একদম কালো বাঙালী, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। সেইজন্যেই সায়েবিআনাটা অতি প্রচণ্ড। দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার, সদ্য আমদানী, তাঁকে চমকে দেবার জন্যে শিকারে যাওয়া। নইলে বুঝতে পারেন না, শিকারে যাব ব'লে কেউ বার-লাইব্রেরিতে সঙ্গী খোঁজে ?

আমি বললাম, বেশ তো, আপনাদেরই বা যাবার মামলাটা কি ?

প্রফুল্লবাবু বললেন, সে বুঝবেন না, আপনি উকিল হন নি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, আমরা যা যাবার তো যাবই—সেজন্যে ঘাবড়াই না, বাঘেও উকিল খায় না শুনেছি। কিন্তু ডি-এম্ ঘাবড়ে যাচ্ছেন। আমাকে ডেকে বললেন, রায়, গোঁ যখন ধ'রেছে ও যাবেই ; আমিই বা ঠেকাই কি ব'লে। কিন্তু বাঘের পেটে গেলে আমাকে গবর্নমেণ্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সেইটে পার তো সামলাও।

—অতএব ?

—অতএব আমি সামলাচ্ছি। দলবল খুব জোটাচ্ছি, যেন হৈ-চৈ-এর ঠেলায় বাঘ ধারে-কাছেও না ঘেঁষে। তবু বোঝেন তো, বনের জন্তু, তার মতিগতিকে পূরো বিশ্বেস নেই। দুম ক'রে যদি এসে দেখা দেয়, আমাদের তো বোঝেনই মুরোদ, আপনি সঙ্গে থাকলে ভরসা পাই। আর না বলবেন না ভাই, আমাদের রক্ষে করুন।

বললাম, বেশ, যাব।

লঞ্চে চাপতে গিয়ে দেখি বিরাট ব্যাপার। অফিসার বেশি নয়, যা আছে দু'চারজন সেও নেহাত চ্যাংড়ার দল, কারণ নিজের চেয়ে সিনিয়র কাউকে সঙ্গী নিলে সর্দারিটা জমবে না। কিন্তু বার-লাইব্রেরির মনে হ'ল একটা আস্ত কলোনিই ব'সে গেছে লঞ্চে। কিছু না হবে তো জনতিরিশের ওপর লোক পার্টিতে ; তার কম করেও বাইশজনই উকিল। কামান-বন্দুক বিশেষ ধরা ছোঁয়া যে অভ্যাস আছে কারও এমন মনে হ'ল না, তবে দামী দামী বন্দুক বেশ খান-কতকই চলেছে। প্রফুল্লবাবুকে চুপি চুপি বললাম, ও মশায়, এ যে

গোটা বারই তুলে নিয়ে এসেছেন দেখছি। মামলা-মোকদ্দমা কিছু হবে না কাল ?

প্রফুল্লবাবু জিভ কেটে বললেন, বলেন কি! এই ক'জনে বার খালি হ'য়ে যাবে, খুলনার বদনাম করতে চান আপনি ?

বললাম, বেশ। কিন্তু আমরা তো হাজির, যাঁর জন্যে এত কাণ্ড, শ্যাম রায় কই ?

প্রফুল্লবাবু বললেন, আসবে আসবে, যথাকালে আসবে।

আসতে লাগুন, ততক্ষণ আমাদের আড্ডা জমে গেল। অনেক লোক, অনেক রকম মুড্, তবু সবারই দেখলাম হৈ-চৈ করবার বুদ্ধিটা প্রচুর। প্রফুল্লবাবু গুণী লোক ; বাঘ মারি না মারি, আড্ডা মারবার ব্যাঘাত না হয়, তার ব্যবস্থাটি বেশ গুছিয়ে করেছেন।

সন্ধ্যে হব-হব, এমন সময় এস-ডি-ও এলেন। না জেনে ব'লে ফেলেছি, তবু অভ্যাসের জোর, মিছে কথা বেরোয় নি মুখ থেকে—শ্যাম রায়ই বটেন। কালো তো কালো, ছাঁকা ভুষো কালি, তার ওপর হোঁতকা। শুধু চেহারায় নয়, বুদ্ধিতেও। এসে এমন একটা ভাব ধারণ করলেন যেন বিশ্বসুদ্ধ সবাই তাঁর খানসামা আর বেয়ারা ; আর তিনি যে বাঘ মারতে চলেছেন, সেটা নেহাতই আমাদের পাপ উদ্ধার করতে। লঞ্চের সারেং খালাসীকে তো ধমকে উলটে দিলেন, উকিলরা সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে চলতে লাগলেন, আমি গতিক বুঝে বাইরে ঝুঁকে নদী দেখতে ব'সে গেলাম, হাতাহাতি একটা এক্ষুনি না হ'য়ে যায়!

কিন্তু অসহ্য হ'ল একটা ব্যাপার। স্ত্রী সঙ্গে এসেছিলেন, পতি-দেবতাকে জয়যাত্রায় রওনা ক'রে দিতে। চমৎকার মেয়েটি, হালকা ছিপছিপে সুন্দর গড়ন। চোখের কোণে অদ্ভুত একটি দুষ্টু হাসি লেগেই রয়েছে। দু'জনের বয়সের ফারাক অনেক—কত্তার বয়স চল্লিশের ধারে, এঁর বয়স মনে হ'ল কুড়ি পেরোয় নি। মুখে চোখে সারাক্ষণ এমন একটা ঝিকমিক খেলছে, সুন্দর না কুৎসিত সে-কথা

মনেই হয় না, শুধু ইচ্ছে করে আর একবার দেখে নিই মুখখানা, আর যদি না দেখি!

এসেছে স্বামীর সঙ্গে, অন্য কারো সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলছে না, কে জানে হয়ত কর্তার অতটা পছন্দও নয়। তাঁর সঙ্গেও খুব বেশী বলছে তাও নয়; তবু যেন সবসুদ্ধ একটা অ্যাটমসফিয়ার গড়ে তুললে দু'মিনিটে।

অবশ্য থাকলও না বেশীক্ষণ, মিনিট পাঁচ-সাত জোর। এদিক ওদিক ঘুরে দেখল, কেবিনে যেখানে রাজশয্যে পাতা সেটাকে একটু দেখল টিপেটুপে সব ঠিক আছে কি না, তারপরই ফিরে চলল, লঞ্চ এবার ছাড়বে।

নামবার মুখে খুব নরম গলায় চুপি-চুপি বলল, শোন, শিকার হ'য়ে গেলেই সোজা ফিরে আসবে কিন্তু। আর, ঠাণ্ডা লাগিয়ো না।

এস-ডি-ও হঠাৎ কড়া গলায় ধমকে উঠলেন, হয়েছে হয়েছে যাও, মেলা জ্যাঠামো কোরো না।

আমরা চমকে উঠলাম—এ কি অসভ্য! যাকে বলা তার কিন্তু দেখলাম মুখখানা একটুও ম্লান হ'ল না, মিষ্টি হাসিটুকুকে আরও একটু মিষ্টি ক'রে ভুরু তুলে বললে, বাপ রে!

তারপর হেঁট হ'য়ে এক প্রণাম ক'রে খুটখুট ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। হাই-হিল-তোলা জুতোর দিকে তাকিয়ে আমার খালি মনে হ'তে লাগল, মানাচ্ছে না—মানাচ্ছে না, এ মেয়ের পায়ে থাকবে আলতা আর পাঁইজোড়।

কিন্তু আমি ভাবলে হবে কি, এস-ডি-ওর বৌ হয়েছে যখন বাপ-মায়ের বরাত গুণে, হাই-হিল তার কপাল থেকে খসায় কে!

একটু পরেই লঞ্চ ছাড়ল। মস্ত বড় লঞ্চ, জায়গার কমতি নেই। এস-ডি-ও তাঁর ছোট কেবিনের বিছানায় গিয়ে সেঁধুলেন। আমরা কেউ-বা বড় কেবিনে, কেউ-বা ফ্রন্ট-ডেকে যার যেমন খুশি গড়াগড়ি

খেলাম। সারা রাত ধ'রে লঞ্চ চলবে, ভোরের কাছাকাছি গিয়ে আবাদে পৌঁছবে।

সে অপূর্ব যাত্রা। দুপুর রাত, অন্ধকার আকাশে শুধু তারারা লঞ্চের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। নিস্তব্ধ নদী, নিস্তব্ধ আকাশ বাতাস, শুধু লঞ্চের ঝকঝক শব্দ, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ তার বাঁশির আওয়াজ। আধ-ঘুমের মধ্যে হঠাৎ শুনি ভোঁ ক'রে বাঁশি বাজছে—লঞ্চ বাঁক ঘুরবে, বা সামনে নৌকো পড়েছে। বাঁশি থামতেই যেন আবার সব আরও বেশী করে নিস্তব্ধ হ'য়ে যায়, চাকার শব্দটা আরও স্পষ্ট হ'য়ে কানে আসতে থাকে। যেন সে নতুন ক'রে শুরু হ'ল।

বারবার ক'রে জেগে আর ঘুমিয়ে প'ড়ে আবার জেগে উঠে রাত কাটতে লাগল। তাকে না বলে ঘুম, না বলে জাগা; অদ্ভুত এক অবস্থা। শেষটা চটেমটে ধুত্তোর ব'লে উঠে বসলাম।

সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে আওয়াজ হ'ল, ও কি হ'ল, ও মশায়।

বললাম, ঘুমোন নি ?

প্রফুল্লবাবু বললেন, কেন, জেগে ওঠা কি আপনাব মনোপলি ?

বললাম, তা নয় বটে। বেশ, উঠুন জেগে।

প্রফুল্লবাবু বললেন, কিন্তু রাত জেগে ভেবেই বা কি করবেন। শুয়ে পড়ুন। এখনও রাত আছে।

বললাম, রাত জেগে ভাবছি কে বললে ?

প্রফুল্লবাবু বললেন, আমিই বললাম। কী ভাবছেন তাও বলতে পারি।

—কী ?

মুক্তোর মালা তো ? ও অমন পবে। আমার মেয়ে থাকলে আমিও বর্তে যেতুম। কিন্তু এ-সব কথা বলতে নেই, অনেক লোকের অনেক কান। নিন, ঘুমোন।

বললাম, তা বটে। কিন্তু ভাবছি, এত উতলা হবার কোন হেতুই ছিল না আপনাদের। এ যা মাল, বাঘে খাবে না। যদি-বা ভুলে

খেয়ে ফেলে, গলা চুলকে উগরে দেবে। ডি-এম এত ঘাবড়ালেন কেন ?

প্রফুল্লবাবু বললেন, ডি-এম ব'লেই নয়। ওকে খায় খাক, কিন্তু উনি যে আরেকজনের মাছ-খাবার টিকিট সেটা ভুলে গেলেন ?

বললাম, ভুলি নি। ভেরি গুড, ঘুমোনোই যাক।

ভোর না হ'তে হ'তে লঞ্চ নোঙর ফেলল, এসে গেছি। হৈ হৈ করে সব জেগে উঠল। তারপর হাতমুখ ধুয়ে চা-পাঁউরুটি ঠুসে বুটপট্টি চড়িয়ে ডাঙায় নামতে বেলা আটটা। তার আগে নামাও উচিত নয়, দিবালোকে বাঘের ভয় কম।

সেজেগুজে এক-এক করে সব সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। এস-ডি-ও সায়েব গোড়াতেই নেমেছেন, প্রফুল্লবাবু নামলেন প্রায় সবার শেষে। তাঁর হাতে বন্দুক-টন্দুক নেই, আছে শুধু এক বাইনোকুলার, আর গলায় ঝুলছে ঠুলিভরা এক ক্যামেরা।

বললাম, ও কি মশায়, এই বেশে আপনি বাঘ মারতে যাবেন নাকি ?

প্রফুল্লবাবু বললেন, বাঘ মারতে যাব কে বললে ? মারামারি কাণ্ডের মধ্যে আমি নেই, আমি সিভিল সাইড। তবে হ্যাঁ, বাঘে যদি আমাকে মারতে চায়, সে আলাদা কথা।

এস-ডি-ও বললেন, তবুও অস্ত্র কিছু একটা থাকা ভাল।

প্রফুল্লবাবু বললেন, কিছু দরকার নেই। আমি স্যর রেকর্ড কীপার। রিপোর্টারকে জার্মানরাও মারে না শুনেছি।

ডাঙায় নেমে এস-ডি-ও সবাইকে লাইন ক'রে দাঁড় করালেন। তারপর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবিকল সেনাপতির পোজে একখানা জুতসই রকম বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, ঠিক কেমন কেমন ক'রে চলতে হবে, কোন্ অবস্থায় কী করতে হবে। সবাই নিঃশব্দে পা ফেলে চলবে, বাঘ দেখলে যেন কেউ ভয় না পায়, শব্দসাড়া না করে,

নিজের বুদ্ধিমত গুলী ছুঁড়ে না বসে। সে যা ছুঁড়বার-টুড়বার তিনিই ছুঁড়বেন।

সে তো বটেই। প্রফুল্লবাবু ওর মধ্যে এক ফাঁকে খুব আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু স্যর, বাঘ যদি এস-ডি-ও বলে চিনতে না পারে?

সেকথা অবশ্য এস-ডি-ও'র কানে গেল না। শুধু তাঁর গোল গোল চোখদুটো একবার কটকটে হ'য়ে উঠল, প্রফুল্লবাবুর মুখের ওপর একটিবার ঘুরে এসেই আবার অন্যদিকে ফিরে রইল।

আধঘণ্টাটাক হেঁটে বন পেলাম।

চলেছি। মাথার ওপরে ডালপালার ঘন জাল, চারপাশে অফুরন্ত গাছের গুঁড়ি, পায়ের তলায় কখনও ঝুরো মাটি, কখনও নরম কাদা, আর তার মধ্যে সর্বত্র মাথা তুলে আছে সুঁদরি গাছের শুলো। হোঁচট আর টক্কর খেতে খেতে প্রাণ শেষ, আর বেঁটে শুলোর ওপর হঠাৎ পা পড়ে গেলে পিছলে পা মচকাবার জোগাড়।

আর সে চলেছি তো চলেইছি। বাঘ যে কোথায় তার হদিস নেই। সামনে যাচ্ছেন এস-ডি-ও। তার রীতিমত বীর বেশ; ঝকমকে পোশাক, মসমসে জুতো, ঝকঝকে বন্দুক—এলাহী কাণ্ড। তাঁর ঠিক পেছনেই প্রফুল্লবাবু আর আমি। প্রফুল্লবাবুর তো বলেছি, সেই বাইনোকুলার আর ক্যামেরা সম্বল। আমার যা অভ্যেস, বন্দুক আর কুকরি। সঙ্গীরা চলেছেন দু'ধারে ছড়িয়ে, যাকে বলে অর্ধ-চন্দ্র বা ফ্যান-ফর্মেশন, তাই ক'রে।

কিন্তু আটটায় নেমেছি, দশটা বেজে গেল, এগারোটাও বাজতে যায়, বাঘ কই? হাঁটা তো নয় সে, নেচে-নেচে চলা, তার কসরতে ইতিমধ্যেই ক্ষিদে পেয়ে গেছে আমার। সায়েবেরও বুঝতে পারছি অবস্থা কাহিল। কিন্তু মুখে সে কথা ব্যক্ত করতে পারছেন না। মানের দায়।

অবস্থা দেখে করুণা হ'ল। মনে মনে ডেকে বললাম, হে মা কালী, জীবে দয়া কর, বাঘ-ভালুক না হোক নিদেন হরিণ-টরিণও একটা জুটিয়ে দাও!

মা দয়া করলেন। এগোচ্ছি, সামনে মস্তবড় এক পাইন গাছের গুঁড়ি, হাত বারো-চোদ্দ তার বেড়, তাকে ঘিরতে গিয়েই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে এক হরিণ। বিরাট দেহ, ডালপালাওয়ালা বিরাট শিং, সারা গায়ে তেল পিছলে পড়ছে, অমন হামেশা দেখা যায় না। দল থেকে ছিটকে পড়েছে কি করে, একটু যেন ভড়কে গেছে হঠাৎ। আমাদের দিকে পিছন ফেরা, চোখ আর কান খাড়া ক'রে দূরে কি যেন একটা বোঝবার চেষ্টা করছে।

হরিণ আমাদের দেখতে পায় নি, এস-ডি-ও'ও হরিণকে দেখেন নি। প্রফুল্লবাবু খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন, দুই আঙুলে এস-ডি-ও'র কোটের লেজুড় আলগোছে টেনে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, স্যর!

সঙ্গে সঙ্গে বিষম ব্যাপার! এস-ডি-ও—ও মাগো ব'লে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, হাতের বন্দুক দুম ক'রে আওয়াজ হ'য়ে গেল। গুলীটা ভাগ্যিস গিয়ে লাগল খানিক দূরে একটা গাছের ডালে, তার একখানা কচি ডাল ভেঙে ঝুলে পড়ল, হরিণ চমকে গিয়ে চোঁচা দৌড় মারলে। চারদিক থেকে সবাই কি হ'ল কি হ'ল ব'লে ছুটে এল।

সবাই মিলে হৈ চৈ আর কুশল প্রশ্ন করে যখন চাঙা করে তুলল তাঁকে, এস-ডি-ও ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, ইট ওয়াজ এ গ্রেট টাইগার!

প্রতিবাদ করা মানে ঝামেলা বাড়ানো। সে-ভুল কেউই করলে না, খুব ক'রে মাথা নেড়ে বললে, আলবৎ, জরুর, গ্রেট টাইগারের ব্যাটা গ্রেট টাইগার!

তারপর তর্ক উঠল, সে ব্যাটা গ্রেট টাইগার অমন লাফ মেরে পালিয়ে গেল কেন? তার কি উচিত ছিল না, ভদ্রভাবে এসে বুক

পেতে দিয়ে বলা, আই বেগ টু রিমেন, স্যর, ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট—গুলী ঝাড়ুন ?

এস-ডি-ও ততক্ষণে প্রায় সুস্থ হয়ে গেছেন। বললেন, দ্যাট ওয়াজ ড্যামড্ ডিসকোর্টিয়াস !

প্রফুল্লবাবু সবিনয়ে বললেন, ওর কি দোষ স্যর ! আপনার নিজেরই মনে রইল না আপনি এস-ডি-ও, ওটা তো বনের পশু।

এস-ডি-ও কথা কইলেন না, আবার তেমনি কটকট ক'রে তাকালেন।

আমি দেখলাম, বাধে বুঝি একটা। তাড়াতাড়ি বললাম, এখানে সময় নষ্ট ক'রে কি লাভ ? ওকে ফলো করলে হ'ত না ?

এস-ডি-ও বললেন, দ্যাটস রাইট। কিন্তু ফলো করা হবে কি করে ?

আমি বললাম, সে শক্ত নয়। মাটি নরম আছে, পাঞ্জা পাওয়া যাবে।

এক মিনিট দু' মিনিট আলোচনা চলল, তারপর স্থির হ'ল ফলো করাই হবে। আসল কথা, অন্য সবাই জেনে গেছে ওটা হরিণ, বাঘ নয়। এস-ডি-ও'র বদ্ধ ধারণা বাঘ, কিন্তু তাই বলে ভয় পেলে তো মান ইজ্জত সব যায়। কাজেই বুক যতই কাঁপুক, মুখে বললেন, ইয়েস চলুন। কিন্তু বলছিলাম, একটু টিফিন ক'রে নিলে হ'ত না ?

সেই শেষ ভরসা, টিফিন করতে যদি বসে যাই, বাঘ নিশ্চয়ই আমাদের পথ চেয়ে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে না, দূরে চলে যাবে।

আমি বললাম, তাই হয় কখনও ? একে বলে হট স্পুর, দেরি করলে ততক্ষণে বাঘ কোথায় চলে যাবে তার ঠিক নেই। চলুন সবাই।

আবার চললাম। এবার আমি সবার আগে, আমার পাশে প্রফুল্লবাবু। অন্যরা খানিকটা পেছনে, এস-ডি-ও'কে মাঝখানে রেখে ঘিরে নিয়ে চলেছেন। এস-ডি-ও বন্দুকের টোটা খুলে নিয়েছেন,

আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছি ভরা বন্দুক হাতে করে চলতে নেই, হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে যায়। বাঘ যদি পেয়েই যাই, তখন বন্দুক ভরারও সময় মিলবে।

হরিণের স্বভাব, ভয় পেলে তারা একেবারে অনেকখানি ছোটে না। একদৌড়ে খানিকটা চলে গিয়ে, থেমে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করে বিপদ কোনদিকে, কোনদিকে পালাতে হবে।

এর আবার দেখা পেতেও তাই দেবি হ'ল না। শ' দুয়েক হাত এগিয়ে দেখি, দূরে একটা গাছের পাশ দিয়ে তার গায়ের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। পেছন ফিরে সবাইকে দাঁড়িয়ে যেতে ইশারা করলাম, করে পাশের দিকে একটু ঘুরে যেতেই হরিণ পুরোপুরি নজরে এসে পড়ল।

আগেই বলেছি, অমন নধরকান্তি অথচ অমন বিশাল চেহারার হরিণ সুন্দরবনেও বেশী মেলে না। চিতল হরিণ, অথচ আকারে যেন সে বারশিঙাকেও ছাড়িয়ে যায়। আর দাঁড়াবারই কি ভঙ্গি তার, বুকটা চিতিয়ে ফোলানো, মস্তবড় গাছের মত ছড়ানো শিং, ঘাড়টা একটু বাঁকানো একদিকে, ভয়ে উত্তেজনায় নাকের ডগা আর কানের পাতা থিরথির ক'রে কাঁপছে। তার চোখ আমাদের দিকে নয়, এবারও সে অন্যদিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করছে, আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।

আমার হাতে বন্দুক তৈরি, কিন্তু তাকে মারতে হাত ওঠে না। ভাবছি, আমি পারব না; ওরা চায় তো মারুক। প্রফুল্লবাবু পাশ থেকে আমার হাত টিপে দিলেন, একটু দাঁড়ান। বলে, নিঃশব্দে ক্যামেরা তুলে সই করলেন। সত্যি কথা, অমন জিনিসের ছবি না তুললে ক্যামেরা থাকাই মিথ্যে।

আধ মিনিট জোর, প্রফুল্লবাবু ক্যামেরার চাবি টিপতে যাচ্ছেন, এমন সময় পলকের মধ্যে কাণ্ড ঘটে গেল। হরিণ হঠাৎ শিউরে উঠল, তারপর লাফ মেরে সামনে সরে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার

আগেই যম তার ওপরে এসে পড়েছে।

হলদে আর কালোয় মেশানো ঝকঝকে একখানা কম্বল যেন আচমকা উড়ে এসে তার গায়ে পড়ল। এমন হঠাৎ এল যে, কোনদিক থেকে এল সেটা আমাদেরও ঠাহর হ'ল না। সুন্দরবনের আসল রয়াল বেঙ্গল, তার ঝাঁপ—চোখে না দেখলে সে বস্তু বলে বোঝানো যায় না। পলক ফেলতে না ফেলতে দেখলাম, হরিণ হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে গেছে, বাঘ তার ওপরে। হরিণের গলা থেকে একবার-মাত্র একটা করুণ আর্তনাদের আধখানা বেরিয়ে আসতে আসতেই তক্ষুণি থমকে থেমে গেল। আমি যেন ভাল করে টেরই পেলাম না কাণ্ডটা কি হচ্ছে। কলের মতন বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপে দিলাম, হরিণের কান্না আর আমার বন্দুকের আওয়াজ একসঙ্গে মিলে গেল। বাঘের গলা থেকে একটা আবছা গোঙানির আওয়াজ বেরুল একবার। তার পরই সেও হরিণের গায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে তার ওপাশে গিয়ে পড়ল। হরিণের দেহের আড়াল থেকে তার ল্যাজের ডগাটা বার-দুই বেঁকে বেঁকে উঁচু হয়ে উঠল সাপের মতন, তারপর মাটিতে পড়ে গেল। সব শেষ।

সবাই দৌড়ে এসে গেছে, তাদের থামতে বলে আমি এগিয়ে গেলাম। বাঘকে বিশ্বাস নেই, মরে গিয়েও বেঁচে ওঠে। কাছে গিয়ে মুখের ভেতরে বন্দুকের নল পুরে দিয়ে আর এক ফায়ার। ব্যস, নিশ্চিন্ত। যদিও দেখেছিলাম তার দরকার নেই, আগের গুলীটাই তার হার্ট ফেঁড়ে দিয়ে গেছে।

ততক্ষণে সবাই এসে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। অপূর্ব দৃশ্য—সুন্দরবনের দুই বাসিন্দা, দুই চিরশত্রু, একজন সে-বনের সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক, আর একজন তার ভীষণতার প্রত্যক্ষ মূর্তি। এদের মধ্যে দেখা হয় একমাত্র মৃত্যুর ঘটকালিতে। সেই মৃত্যুরই কোলে দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে, যেন কতকালের বন্ধু। হরিণ কাত হ'য়ে আছে, তার পাগুলো ছড়ানো। ঘাড়টা উল্টে গেছে,

ঘাড়ের ওপরে একটা ভয়ানক ক্ষত, বাঘের এক কামড়ে তার গর্দানাটা প্রায় অর্ধেক নেমে গেছে। চোখের কোণে জলের ধারা, ঘাড় বেয়ে গলা বেয়ে রক্তের স্রোত নেমেছে।

বাঘ শুয়েছে প্রায় তার সঙ্গে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে, তার মুখ তখনও হাঁ করা, মাথার খুলির খানিকটা উড়ে গেছে শেষের গুলীটাতে। মাথা থেকে বুক থেকে তারও অঝোরে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। পাশাপাশি শুয়ে এই দুই চিরশত্রুর রক্তের ধারা দুটি দু'দিক থেকে গড়িয়ে এসে একই সঙ্গে মিলে একটা প্রায় দহ সৃষ্টি করে ফেলেছে মাঝখানটিতে।

এক মিনিট দু'মিনিট কেউ কথা কইলে না, শুধু চেয়েই রইল। তারপর এস-ডি-ও বললেন, দ্যাট ওয়াজ গ্র্যাণ্ড!

তখনও সবার মুখ ফ্যাকাশে। হাত পা কাঁপছে, গলার আওয়াজ কাঁপছে। না হ'য়ে পারে না। মৃত্যুর এমন ভীষণ আবির্ভাব দেখে মানুষের মন কাঁপবেই।

অনেকক্ষণ পরে এস-ডি-ও বললেন, তোল এ-দুটোকে, লঞ্চে ফিরে যাই।

চাপরাশিরা এগিয়ে এল। প্রফুল্লবাবু বললেন, একটু সবুর স্যর; একটা শট নিয়ে নিই। বলে ক্যামেরা তুলে একটু দূরে সরে গেলেন।

একজন বললেন, সঙ্গে কেউ দাঁড়াবে না? আর একজন বললেন, দাঁড়াবে বৈ কি। কান্তিবাবু কোথায় গেলেন, আসুন।

আমি বললাম, মাপ করুন ভাই, আমি ওরকম তুলি না।

উকিলবাবুরা বললেন, স্যর কই, স্যর এগিয়ে আসুন।

এস-ডি-ও এগিয়ে গেলেন। একজন বললেন, এদের টেনে একটু সাজিয়ে নিলে হ'ত না?

প্রফুল্লবাবু বললেন, তা হবে না। যেভাবে এরা নিজেরা পড়েছে, ঠিক তেমনি ছবিটিই তুলতে হবে। এরা ঠিক এমনি থাকবে, আপনারা ঘিরে দাঁড়ান।

উকিলরা জনকতক বললেন, স্যর, আপনি চলে আসুন, বাঘের পাশে দাঁড়াবেন।

এস-ডি-ও দু'একবার থাক থাক, আমি কেন বললেন। এমন বলতে হয়। তারপর এগিয়ে গেলেন। স্বয়ং তিনি হাজির, অন্য আব দাঁড়াবার এক্তিয়ারই কার বল ? বাঘ আর হরিণের মাঝখানটাতে তিনি দাঁড়াবেন, বন্দুক হাতে, বাঘের গায়ের ওপরে একটা পা রেখে, বীর শিকারীদের যেমনটা দস্তুর। অন্যরা তাঁর পেছনদিকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াবেন।

আমাব ও পোষায় না, আমি দূবে স'রে রইলাম। প্রফুল্লবাবু পর পব কয়েকটা শট নিলেন। তারপর বাঘ আর হরিণকে ঝুলিয়ে ব'য়ে নিয়ে লঞ্চে ফিরে আসা গেল। হরিণের শিং আর ছাল খুলে নিয়ে মাংসটা খালাসীদের দিয়ে দেওয়া হ'ল। রান্নাব কথা উঠেছিল একবার, কিন্তু দেখা গেল বাঘের মারা মাংস খেতে অনেকেরই প্রবল আপত্তি। বাঘকে লঞ্চে আস্তই তুলে নেওয়া হ'ল। তারপর আর দেরি না করে লঞ্চ ছাড়া হ'ল। খুলনায় এসে যখন লঞ্চ ভিড়ল, রাত তখন দুটো।

পরের দিন সারাদিন শহরে দারুণ হৈ চৈ। এস-ডি-ও সায়েব প্রকাণ্ড বাঘ মেরে এনেছেন। শহরস্থ লোক ভেঙে পড়েছে দেখতে। একবাব বাঘকে দেখছে, একবার এস-ডি-ও'কে। তাঁকে অবশ্য সারাক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবু তাঁর বাড়ির আর এজলাসের চারপাশে দিনভর লোকারণ্য—মানুষটাকে নাই হ'ল, তাঁর বাড়িটাকে দেখাও কি কম কথা !

সেদিন তো এই ক'রে কাটল। বিপদ বাধল পরদিন।

আমরা বলিলাম, কি বিপদ, বলুন।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বলছি দাঁড়া, দম নিতে দে।

পরদিন সকালবেলা খবর এল, এস-ডি-ও'র বাড়িতে পার্টি, সন্ধ্যাবেলা। বাঘ মারা গেছে, এস-ডি-ও খাওয়াবেন সবাইকে। গিয়ে দেখি, শিকারের সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো আছেনই, অন্য লোকও আছেন কম নয়।

অনেক লোক, পেল্লায় আয়োজন, খাওয়া-দাওয়া চুকতে রাত দশটা। অতিথিরা প্রায় সবাই চলে গেছেন তখন, শিকারের দলেরও অনেকেই খসে পড়েছেন। বাকি শুধু কয়েকজন আমরা, আমরাও উঠব-উঠব করছি। এমন সময় প্রফুল্লবাবু হন্তদন্ত হ'য়ে এসে হাজির। অবাক হ'য়ে বললাম, আবার যে?

প্রফুল্লবাবু বললেন, এর জন্যেই তো চলে গেলাম তাড়াতাড়ি। এতক্ষণে দিলে। ব'লে বড় একটা খাম বার করলেন।

সেই ছবি, ছেপে আনা হয়েছে। অনেকগুলোই ছোট্ট প্রিণ্ট, একখানা মাত্র এনলার্জ করা। সেখানা এস-ডি-ও'র স্ত্রীর হাতে দিলেন, অন্যগুলো আমরা হাতে হাতে তুলে নিলাম।

ভদ্রমহিলা ছবিটাকে খুব নিরীক্ষণ ক'রে দেখলেন কিছুক্ষণ ধ'রে। তারপর চোখের কোণে ঠোঁটের কোণে সেই দুষ্টু হাসি ঝিলিক মেরে গেল। খুব নিরীহ স্বরে বললেন, হরিণটাকে তো মেরেছ বুঝলাম, বাঘটা মরল কি হ'য়ে, হরিণের গুঁতোয়?

অবাক হ'য়ে ভাবলাম, বলে কি!

তারপর হাতের ছবির দিকে তাকালাম। ও হরি! এস-ডি-ও'র ছবি উঠেছে, হরিণের ওপরে পা রেখে। মানে, বাঘের গায়ের ওপর পা রাখা সাহসে কুলোয় নি তাঁর। তাই সবাই যখন রেডি হ'য়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়েছে, তিনিও চট্ ক'রে বাঘের ওপর থেকে পা নামিয়ে নিয়ে হরিণের ওপরে পা তুলে দিয়েছেন—আলগোছে, যেন কেউ দেখে না ফেলে।

তারপর অবিশ্যি আর সেখানে থাকা যায় না, কারণ তখন

যা-সব কাণ্ড হবে সে নেহাতই পাবিবারিক। আমবা চটপট উঠে পড়লাম।

পবদিন প্রফুল্লবাবুকে বললাম, ও ব্যাপাবটা কি আপনাব তখন লক্ষ্য হযেছিল ?

প্রফুল্লবাবু বললেন, ওই দেখেই তো অতগুলো শট নিলাম, ফসকে না যায়।

বিরাটের বিশালতা

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

ঈশ্বরের নামে মানুষের নালিশের অন্ত নেই। হয় বলছে আমার এটা আছে কেন হ'ল, নয় বলছে আমাব এটা নেই কেন হ'ল না। নিজের অবস্থাতে কেউ সন্তুষ্ট নয়, এবং তাব দরুন গালাগালটা সব খাচ্ছেন ঈশ্বব বেচারী। এরই নাম ডিভাইন ডিস্‌কণ্টেণ্ট।

আমি নালিশ করিনে। আমি জানি আমার চাইতে ঈশ্বরের বুদ্ধি বেশী, তিনি যা দিয়েছেন বা দেন নি আমাকে, ধীরে-সুস্থে ভেবে-চিন্তেই দিয়েছেন বা দেননি। আব খামখেয়ালীও করে থাকেন যদি, চেঁচিয়ে তো প্রতিকাব হবে না তার! পাখীর পেছনে উড়তে পারিনে, বেশ কথা, ভাল দেখে বন্দুক কিনব, মাটি থেকেই পেড়ে ফেলব তাকে। কাঁদলে কি ডানা গজাবে ?

তা ছাড়া, গজাতই যদি, তাহলেই যে খুব একটা বেশী ভাল থাকতাম, তাই বা কে ভরসা দিচ্ছে। উড়তে পারিনে, বন্দুক ছুঁড়ি। পাখী হয়ে উড়তে পারতাম যদি, তখন হয়ত আর কেউ আমার দিকে বন্দুক ছুঁড়ত।

একবারের কথা বলি।

মেদিনীপুব জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মহকুমা, তার নাম কাঁথি। তার মানে বাংলাদেশেরই একেবারে শেষ কোণ। শহর থেকে মাইল পাঁচেক দক্ষিণে গেলে সমুদ্র, মাইল কুড়ি পশ্চিমে গেলে উড়িষ্যা। এককালে এটাও উড়িষ্যার সামিল ছিল; গ্রাম-দেশের কথা শুনলে হঠাৎ মনে হবে উড়ে-কথাই শুনছি—মানে সে-কথার ভাষা বাংলা উচ্চারণ উড়ে, অন্তত তখন যা দেখেছি।

এই কাঁথিতে একবার যেতে হ'ল। যেতে হ'ল মানে, ঘটনাচক্রে। চাকরিতে পাকা হয়ে গেছি তখন, কিন্তু চাকরিসূত্রে নয়। মাঠের দেশ, আর ধানক্ষেতের দেশ—বন বলেই কিছু নেই, তো কাঠের কারবারীর কোন্ কাজ হবে সেখানে। শিকার করতেও নয়, সে দেশে বন' জন্তুব মধ্যে আছে মেঠো-ইদুব আর ঢ্যামনা সাপ।

যাওয়াটা হ'ল, যাকে বলে নিতান্তই পারিবারিক। পিসিমার ছোট ছেলের বিয়ে দেবেন, পাত্রীর খোঁজ হচ্ছে। এক পাত্রী, বাপ ছোটরকম সবকাবি চাকবে, আপাতত কাঁথিতে আছেন। সেই মেয়ে দেখার ব্যাপার। পিসিমা স্বয়ং যাবেন। আমাকে বললেন, নিয়ে চল্।

তখন খড়গপুর স্টেশন এতবড় হয়নি, রাস্তাঘাটের তো কথাই নেই। ট্রেন থেকে নামলাম বেলদা স্টেশনে, এখন যার নাম হয়েছে কণ্টাই রোড স্টেশন। সেখান থেকে কাঁথি শহর মাইল চল্লিশেক পথ, তার একমাত্র যান হচ্ছে উটের গাড়ি।

সে কী গাড়ি! বিঘোরে বেহারে এক্কা চড়ার গান যিনি লিখেছিলেন, তিনি উটের গাড়ি দেখেননি। দেখলে বুঝতেন এক্কা তার কাছে শিশু। হালকা নড়বড়ে এক ফ্রেম, তার ওপরে চারদিকে হাত-পা ছড়িয়ে কোনো কাঠটা ধরে কোনো কাঠটায় পায়ের বা গায়ের চাড় দিয়ে নিজেকে কোনক্রমে আটকে রাখা, যেন ছিটকে পড়ে না যাই। মাথা উঁচু করে সামনে তাকালে দেখছি একটা উটের ঢেউখেলানো বালি-রঙের পিঠ ; চোখ নামিয়ে রাস্তার দিকে তাকালেই দেখছি অবিকল তেমনিতর উটের পিঠ—শুধু একটা নয়, অফুরন্ত। অফুরন্ত রাস্তা, অফুরন্ত ঢেউ। তার ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে আর নাচতে নাচতে গাড়ি ছুটেছে ; আমাদের কপালে যতটা হচ্ছে পর পর লংজাম্প, ততটাই চলছে ক্রমাগত ছোট বড় মাঝারি মাপের হাইজাম্প আর ডাইভ। সবচেয়ে সুখের তার, ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকখানা। উটের চার পায়ে আর গলায় ঘণ্টা আর ঘুঙুর, গাড়ির চাকায় জোড়া

জোড়া করতাল বাঁধা—আরোহী যদি ঝাঁকুনির ঠেলায় পিলে ফেটে মরে যায়, তার চেঁচামেচি কানে গিয়ে কারো শান্তিভঙ্গ না ঘটাতে পারে। বাদ্যভাণ্ড না হলে বিয়ে জমে না, কথাটার মর্ম সেইদিন উপলব্ধি হয়েছিল।

কিন্তু ধন্য বলতে হবে আমার পিসিমাটিকে। আমি, এই ডনকুস্তি-করা বনবাদাড়ে-ঘোরা ছেলে, আমি ঘোল খেয়ে যাচ্ছি, গলার মধ্যে মনে হচ্ছে কাঁচা যবের নির্জলা ছাতু আধসের কে ঠেসে দিয়েছে। আর পিসিকে দেখি নির্বিকার। এ-পাশে হেলছেন ও-পাশে টলছেন, পেছনে ঢলে পড়ছেন, সামনে হুমড়ি খেয়ে যাচ্ছেন, আচমকা ছিটকে শূন্যে উঠছেন আবার ফিরে এসে বসে পড়ছেন, কিন্তু এতটুকু হুঁ হাঁ শব্দ নেই মুখে। অজ্ঞান হ'য়ে গেছেনও ভাবা যাচ্ছে না, বেশ বড় বড় চোখ মেলে সামনে তাকিয়ে আছেন, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছেন। তারই মধ্যে বারকতক আমার দিকে চাইলেন, চোখে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে বললাম, কাজ নেই পিসিমা, ফিরে চল। এই পথ বেয়ে শ্বশুরবাড়ি, আসবে কি ক'রে ছোঁড়াটা? পথেই মরে যাবে।

যতবার বলি, পিসিমা ভুরু কুঁচকে সামনে ঝুঁকে পড়েন, মনে হয় যেন বলেন, কি বললি? তাঁর সে-কথাও আমি শুনতে পাইনে, আমি আবার যা বলি তাও তাঁর কানে গেল ব'লে প্রমাণ পাই না। গেলেও যে বিশেষ কিছু হ'ত তা নয়—ঐ বিভীষণ ঝাঁকুনিতে যাঁর সঙ্কল্প বিচলিত হ'ল না, আমি হেন উচ্চিংড়ের কথায় তাঁর মত বদলাবে এমন আশা করতে নেই। অতএব হতাশ হ'য়ে ব'সে ব'সে ঝাঁকুনিই খেতে লাগলাম। খাচ্ছি আর মনে মনে বলছি, ভগবান, সেই দিলেই যদি ঠ্যাং, তো দুটির বেশী কেন দিলে না! চতুষ্পদ হ'লে কি আর এই ঝাঁকুনি খেতাম ব'সে ব'সে, দিব্যি নিজের পা চালিয়ে গট গট ক'রে হেঁটে চলে যেতাম, এ দিব্যযানে চড়তে বলতই না কেউ। এতজনকে এত দিলে, কারো ছ'টা পা কারো আটটা কারো একশ'টা

—মানুষকে আর দু'টো ঠ্যাং বাড়িয়ে দিলে কতখানি কস্ট্ অব প্রোডাকশন বাড়ত তোমার!

ঐ বলা অবধিই। নিজের পিসিমা, গায়ের ওপর ঠেসে ব'সে আছেন, তিনিই শুনতে পাচ্ছেন না আমার একবর্ণ কথা। সে কথাও তো কী প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলছি। আর এই মনে-মনের কথা, গাড়ির সেই প্রচণ্ড রণবাদ্য ফুঁড়ে স্বর্গে পৌঁছে ভগবানের কানে যাবে, তবেই হয়েছে! ভেবে-টেবে, শেষে আর ভাবলামই না ও-কথা। চুপ মেরে ব'সে রইলাম। অবশ্য শুনতে পেতেন যদি, হঠাৎ যদি দেখতাম গা ফুঁড়ে আরও গোটাদুই ঠ্যাং ঝড়াঝ্ঝড় গজিয়ে গেল, কি করতাম জানিনে। গজায় নি ভাগ্যি—গজালে আব এখানে ব'সে গল্প বলতে হ'ত না। সেই কথাই বলছি।

শেষ রাত্তিরে গাড়ি চেপেছি; কাঁথি পৌঁছতে রাত লেগে গেল। নীচে ঐ রাস্তা, ওপরে চৈত্র মাসেব ভবা রোদ। আর সে মাঠও বালির মাঠ, তেতে খৈ-ভাজা খোলা হ'য়ে গেছে। খৈ হয়েই যেতাম, বাঁচালে একটি বস্তু এসে—হাওয়া। দক্ষিণমুখো চলেছি, আর সোজা দক্ষিণ থেকে আসছে হু হু ক'রে সুমদ্দুরের হাওয়া—রোদের তাত আর বালির গবমকে যেন জানতেই দিলে না ভাল ক'রে। দু'ধারে অফুরন্ত মাঠ, মাঝখান দিয়ে অফুরন্ত বাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে দেখি বড় বড় পুকুর, তার চার কোণে বা চার পাড়ে বটের গাছ বা আমের গাছ, কোন-কোনটাতে বাঁধানো ঘাটও আছে। পথিকদের জন্য এই সব দীঘি কাটিয়েছিলেন গাছ লাগিয়েছিলেন কারা, তাঁদের নামও হয়ত এখন কেউ জানে না, কিন্তু রোদে-ভাজা পথিকের কৃতজ্ঞ নিশ্বাসে তাঁরা স্বর্গে বসেও মলয়-পবন খাচ্ছেন এটা সহজেই ভেবে নেওয়া যায়। আমাদের গাড়ি মাঝে মাঝে থামতে লাগল। গাছের ছায়া দেখে গাড়ি থামিয়ে আমরা নামলাম, দীঘিতে নেমে জল খেলাম, হাতে মুখে মাথায় জল দিলাম, উট আর গাড়োয়ান পেট পুরে জল খেয়ে নিলে। উটের গাড়োয়ান উটের পিঠে ব'সে তাকে চালায় না, দড়ি

ধ'রে হেঁটে হেঁটে যায়, তাকে টেনে নিয়ে যায়। এতখানি পথ, তবু মনে হ'ল আমাদের চেয়ে সেই আরামে যাচ্ছে।

কাঁথিতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন গভীর রাত। ভদ্রলোকের বাড়িতে অবশ্য সেই রাতেও আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হ'ল না। তার মানে, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানা নিতে রাত প্রায় কাবার।

পরদিন মেয়ে দেখা হ'ল, পছন্দও হ'ল। না হ'য়ে উপায় ছিল না—পিসিমাকে সাফ ব'লে দিলাম, তুমি আর ক'দিন, বৌ ভাল হোক মন্দ হোক বুঝব আমরা। কিন্তু এই রেটে একটি একটি ক'রে পাত্রী যদি দেখে বেড়াতে হয়, তবে তুমি টিকে থাক বা না থাক আমি গেছি! ওসব হবে না, এই মেয়েই হ্যাঁ বলে ফেল। অবশ্য মেয়েও নাক সেঁটকাবার মত ছিল না, অতএব পিসিমা অনায়াসেই হ্যাঁ ব'লে দিলেন।

কাজ চুকে গেল, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেই হয়। কিন্তু তা এলে দুর্ভোগ ভুগবে কে, আজ এখানে ব'সে তার গল্প বলবে কে।

পিসিমা বললেন, চল, কালই বেরিয়ে পড়ি।

আমি বললাম, অসম্ভব।

পিসিমা বললেন, তার মানে? এঁদের ওপরে চেপে বসে থাকব?

আমি বললাম, তোমার প্রাণে মায়া নেই, আর থাকলেই বা ক'দিনের জন্যে। আমি এখনও কিছুকাল বাঁচবার ইচ্ছে রাখি। দিন সাতেক শর্মা আর ও-গাড়িতে চড়ছেন না। যা চড়েছি তারই ধাক্কা সামলাই আগে।

কন্যাপক্ষও সায় দিলেন। গায়ের ব্যথা ম'রে সুস্থ না হ'য়ে আবার পথ চলা উচিত হবে না। পিসিমা গজগজ করতে লাগলেন। তা করুন—পাখা গজিয়ে উড়ে তো যেতে পারব না। অন্য পথের মধ্যে আছে, নদী। কিন্তু চৈত্র মাস, তায় মোহানার গায়ে—নৌকো যদি

ওলটায় তো হাতে হাতে হুগলী-রিভার প্রাপ্তি। অতএব হপ্তাখানেক থেকে যাওয়াই স্থির হ'ল।

আসল কথা, এসেছি যখন, দেশটাকে না বেড়িয়ে দেখে আমি ফিরছি না। পথ সোজা হ'লে বরং কথা ছিল, কিন্তু এমন নৃত্যগীত-মুখর পথে বারবার আসা পোষাবে না—বরযাত্রী ছেড়ে দিই, বর হ'তেও নয়। যা করবার এইবারেই।

একদিন গেল। ছ'দিন গেল। তিনদিনের দিন দেখি, হাঁফ ধরে গেছে।

আসলে, কাঁথি শহর বলে এমন কিছু নেই যাকে তিনদিন ধরে বসে বসে দেখা চলে। একটি রাস্তা বরাবর চলে গেছে, তার মাঝখানে মাইলখানেক জায়গা রাস্তার দুধারে দোকানপাট ঘরবাড়ি, ব্যস হ'য়ে গেল। ঐ এক নীলমণি রোড, তার বাইরে বেড়াবারও কিছু নেই, দেখবারও কিছু নেই। আশেপাশে কিছু কিছু আছে জায়গা—কালীবাড়ি আছে একটা, লোকে বলে বঙ্কিমবাবুর কপাল-কুণ্ডলা আর নবকুমার নাকি এই কালীবাড়িতেই এসে উঠেছিলেন; মাইল পাঁচেক দক্ষিণে গেলে আছে সমুদ্র, সেখানে জেলেদের গ্রাম আর সুঁটকি মাছের গন্ধ– তবু যাহোক এইগুলোই দেখবার জায়গা। সেসব দেখা সারা হ'য়ে গেল ছ'দিনের মধ্যেই। কিন্তু, নিজেই বলে বসেছি দিন সাতেক থাকব, এরই মধ্যে 'যাই' বলি বা কি ক'রে?

বেড়িয়ে বেড়াবার সঙ্গী একটি জুটেছিল। এ গল্প তারই গল্প। পাশের বাড়ির ছেলে। আমাদের বয়সী ঠিক নয়, কিছু ছোট হবে। এঁদের বাড়িতে ঠিক ও-বয়সী ছেলে নেই। কি করে বলতে পারব না, সেই আমার হঠাৎ সঙ্গী হ'য়ে উঠল। ছেলেটি বড় ভাল, ভারি নরম আর শান্ত স্বভাব, চেঁচিয়ে কথা অবধি কয় না। বিশেষ জোয়ান শরীর নয়, বরং বেশ শীর্ণকায়ই বলা যায়। অথচ দেহে যেন তার ক্লান্তি বলে কিছু নেই, যখনই বলি বেরোব, সে এক পায়ে খাড়া আছে।

প্রথম দিনেই হ'ল মজার কাণ্ড। আমি বলেছি, আপনার নামটা কি?

সে নাম বলে না। খালি এড়িয়ে যায় আর এলোমেলো জবাব দেয়। বলে, নাম কি হবে। সবাই আমাকে ঘোতন বলে, তাই বলবেন।

কিন্তু হোক আমার চেয়ে দু' বছরের ছোট, তবু তো একটা গ্রোন-আপ মানুষ, অপরিচিতই বলতে গেলে, তাকে ঘোতন বলে ডাকা যায় না, ঘোতনবাবু বললে আরও বিটকেল শোনায়।

শেষটা ক্ষেপে গিয়ে বললাম, এ তো মহা মুশকিল, মশায়! বলতে হয়েছে কি, বাপ-মা নাম একটা তো রেখেছিল, অন্নপ্রাশনের সময়?

হেসে বললে, রেখেই তো মাটি করেছে। ভদ্র-মতন একটা নাম যে বানিয়ে নেব, তার পথ মেরে রেখেছে।

—বেশ। অভদ্রমতন নামটাই বা বলতে হানি কি?

—হানি আমার কিছুই নেই। শুনে আপনার কান কটকট করতে পারে। তাই ভয় পাচ্ছি।

—কি এমন নাম? পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ডী?

—আজ্ঞে না। শ্রীবিরাটচন্দ্র বিশাল।

—মানে হ'ল কি?

—ঐ তো। আগেই বলেছি সইবে না। বাপ মা রাখেন নি নাম, রেখেছিলেন দিদিমা। আশা ছিল আদরের নাতি বৃহৎ ব্যক্তি হ'য়ে উঠবে এককালে। নাতি যে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন 'শুষ্ক-কঞ্চি কাঠি' ছাড়া কোন নামই তাঁর যোগ্য হবে না, সে বুড়ী তা জানবে কি করে।

বললেন, ও নিয়ে মন খারাপ করবেন না। লজিকে বলেছে, 'প্রপার নেম্‌স্‌ আর নন্‌-কনোটেটিভ।'

—মানে কি হ'ল?

—মানে হ'ল, নামের কথাটার যা মানে, মানুষটার বেলায় সেটা সত্যি হতেই হবে এমন কোন মাথার দিব্যি নেই। যেমন দেখুন, আমার নাম 'কান্তি'—অথচ ছিরিখানা তো দেখতেই পাচ্ছেন স্বচক্ষে। আপনারও নামটা দিদিমা 'বিকট' রেখেছেন বলেই যে—

—এই! বিকট নয়। বিরাট।

—সরি। নাম বিরাট বলেই যে আপনাকে জুনপুটে জেলেদের পাড়ায় গিয়ে বাস করতে হবে মৎস্যরাজ সেজে, তার কোন মানে নেই।

—আহা দাদা, বাঁচালেন! নামটা নিয়ে লজ্জায় থাকতাম, সে লজ্জা কেটে গেল। এমন না হ'লে আর বিজ্ঞে বলেছে কেন। ঐ ইংরেজী শ্লোকটা কি বললেন যেন, একটু লিখে দিয়ে যাবেন দয়া করে। মুখস্থ করে রাখব, নাম শুনে কেউ হাসলে তাকে ঝড়াকসে শুনিয়ে দেব। বলব, মাই নেম ইজ ব্যাবু বিরাট-আকৃতি বিশাল।

বললাম, বেশ বেশ তাই হবে বিরাটবাবু। এবার চলুন বেড়াতে যাই।

তিনদিনও কেটে গেল। তারপর বললাম, এবার কি হয়, স্যার। আপনাদের এ কণ্টকনগব তো ফুরিয়ে গেল। এবার তাহলে ফিরেই চলি?

বিরাট বললে, আজ্ঞে না, ফুরোয়নি। এখনও আসল জিনিসটিই দেখেননি।

—সেটি হয় কি?

—বালিয়াড়ি।

—দেখলাম তো।

—দেখেন নি।

বালিয়াড়ি মানে বালির পাহাড়। ছোট ছোট টিলা-পাহাড়, স্রেফ বালি, ঝুড়ি করে কেটে নেওয়া যায়। তার ওপরে নয়নতারা ফুলের বন। নিম বাদাম সরচম্পা গাছও হয় দুটো একটা।

বালিয়াড়ি আছে শহরের আশেপাশে, শহরের মধ্যেও আছে গোটাকতক। দেখেছি, চড়েওছি। একটা ভারি মজা তার, আছে আছে—প্লেন মাঠ আছে, হঠাৎ উঠে গেল ত্রিশ হাত উঁচু বালির ঢিপি, তার গা একদম পাঁচিলের মত খাড়া, সব ঝুরঝুরে বালি, অথচ ধ্বসে পড়ছে না। পড়ছে না যে কেন, তারও কোন হেতু বোঝা যায় না।

বললাম, বালিয়াড়ি চড়াও তো হল।

বল্লে, হয় নি। এ যা দেখেছেন, স্যাম্পল। আসল বালিয়াড়ি হচ্ছে শহরের বাইরে, পশ্চিমদিকে। চলুন দেখিয়ে আনি।

রাতের বেলা মাঠ শেষ করে পূবমুখে ঘুরে শহরে ঢুকেছিল গাড়ি। এদিক পানে এ-কদিনে আর আসা হয় নি। বাকি তিন দিক দেখা হয়ে গেছে, আট মাইল দূরে রসুলপুরের নদী পর্যন্ত। এবার পশ্চিমমুখো চললাম, তাহলেই দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হয়।

শহরের গায়ে খাল, খাল পার হলেই বালিয়াড়ি। বলেছে ঠিকই —বালির সে পাহাড় নয়, গিরিশ্রেণী। কি কবে হল জানিনে, লাইন ধরে বরাবর পশ্চিমমুখো চলে গেছে বালিয়াড়ির মালা। তার মাঝখানটা নীচু, মরা খালের মত, দুপাশে উঁচু হয়ে উঠেছে পাহাড়ের মাথা। মাথায় চড়ে দেখা গেল ওপাশে খাড়া গা নেমে গেছে, তার তলায় চাষের ক্ষেত, বেমালুম কালো মাটি, বালির চিহ্নমাত্র নেই আর। ঠিক যেন একটি বড় হাতের M অক্ষরকে মাঠের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে কেউ। আর সে একটা পাহাড় নয়—যতদূর চোখ চলে এই লাইন সোজা চলে গিয়েছে পশ্চিম দিকে। বিরাট বললে, এ নাকি মাইল সত্তরেক লম্বা, বরাবর এইভাবেই চলে গিয়ে শেষ হয়েছে উড়িষ্যায় বালেশ্বরের সমুদ্রে। দুপাশে এখানে সেখানে তাল আর ফণিমনসার গাছ, টিপির মাথায় মাথায় সার বাঁধা বাদামের গাছ —যার নাম কাজুবাদাম বা হিজলীবাদাম। সে বড় মজার বাদাম দেখলাম গাছ-ভর্তি ঝুলছে—পাকা পেয়ারার মত ফল, তার ল্যাজ ধরে ঝুলছে একটা বাংলা-পাঁচ, সেইটেই বাদাম। দুধারে বালির

পাহাড়, মাঝখানের বালিঢাকা ঢালু বেড়টা হচ্ছে পথ, তাই ধরে লোক হেঁটে হেঁটে যায়।

কিনারায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলাম। তারপর বললাম, চলুন হেঁটে আসি। মরুভূমির রিহার্সালটা হ'য়ে যাক।

বিরাট বললে, পারবেন ?

—পারব না মানে ? পাহাড়-পবত কত ডিঙোলাম, আটকে যাব বালিতে ?

বিরাট বললে, তা বলা যায় না। ছোটর বিক্রম বেশীও হ'তে পারে। বেশ, শখ হয়েছে, চলুন।

—কিন্তু, বেলা তো শেষ, ফিরব কি করে ?

—সে আটকাবে না। একই সিধে পথ, ভুল হবার ভয় নেই। আর চাঁদের আলোও আছে ভরাভর্তি।

হাঁটতে শুরু করে দেখি, বলেছিল ঠিকই। পাহাড়ে চড়া যায়, পাথরে পা আটকে। বালির ওপর হাঁটা ঢের বেশী শক্ত। কিছুতে পা আটকায় না, খালি মনে হয় পায়ের তলায় বালি সরে সরে যাচ্ছে, হাঁটছি কিন্তু এগোচ্ছি না, স্বপ্নে দৌড়োবার মত। একটুক্ষণের মধ্যেই পা ভার হ'য়ে উঠল, হাঁফ ধ'রে গেল।

বিরাটচন্দ্র বিশাল কিন্তু নির্বিকার। দিব্যি লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে হেঁটে চলেছে, স্পীডও হচ্ছে, দমও ফুরোচ্ছে না।

বললাম, পারছেন কি করে ?

বললে, কষ্ট হচ্ছে ? ফিরবেন ?

বললাম, বালির ভয়ে ? কক্ষণো না। ফিরি, আর আপনি দুয়ো দিয়ে বলুন হেরে গেল। ফিরব না, চলুন এগিয়ে যা থাকে। কিন্তু, আপনি পারছেন কি করে বলুন তো ?

বিরাট বললে, দেহে ওজন বলতে কিচ্ছু নেই দেখছেন তো, ঐ তার সুবিধে।

তারপর বললে, দেখুন না, আরও হবে। যার যা দরকার ভগবানই বুঝে ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। আমারও করছেন।

—কিসের ব্যবস্থা ?

—ইন্‌ক্রিমেণ্টের।

—ইন্‌ক্রিমেণ্ট, কিসের ?

—পায়ের। মানে, গোদ। এদেশে হয়, জানেন তো ? তাই হ'লেই নিশ্চিন্ত—পায়ের তলা তখন আরও ঢের চ্যাপ্টা হ'য়ে যাবে, বালির ওপর হাঁটতে পা বসে যাবে না। তখন আমি আর আমি নেই, রীতিমত মরুজাহাজ হ'য়ে গেছি, বালিতে ডুবিনে, ঝড়ে উড়িয়ে নেয় না। তখন সোজা হেঁটে পাড়ি দেব কাঁথি থেকে বালেশ্বর। নামও বদলে যাবে ; হবে বিরাটচরণ বিশাল। বেশী দেরিও নেই তার। জ্বর শুরু হ'য়ে গেছে অলরেডি।

বললাম, কিন্তু সে তো যখন হবে তখন হবে, আপাতত পারছেন কি করে ?

—আরে মশায়, অভ্যেস। তাড়াহুড়ো করবেন না, ধীরেসুস্থে পা ফেলুন, দেখবেন হ'য়ে যাবে।

তা হ'ল। তাকে দেখে দেখে পায়ের তালটা রপ্ত করে নিলাম—দম রেখে, পায়ে ভর রেখে রেখে, সামনে ঝুঁকে পা বাড়ানো। করে দেখলাম, চলতে পারছি, আর দম ফুরোচ্ছে না। তার সমান হ'ল না অবশ্য, সে হবার কথাও নয় একদিনে, তবু চলতে কষ্ট আর হ'ল না।

খানিক দূর যেতেই সূর্য ডুবল। তারপর দিনের আলো মিলিয়ে যাবার আগেই চাঁদ উঠে পড়ল। ভরা চাঁদ, চারদিকে বালি, বালির ওপরে চাঁদের আলো ঝকমক করে উঠছে, যেন আকাশ থেকে এক-দফা আলো ঝ'রে পড়ছে আর আরেক দফা আলো ঠিকরে উঠছে মাটি থেকে, চারদিক আলোয় আলোময় হ'য়ে গেছে।

তখন অনেক দূর গেছি। আশেপাশে কোথাও লোকালয় চোখে

পড়ে না। ওপরে আকাশ নীচে বালির প্রান্তর, থেমে দাঁড়িয়ে একবার চারদিকে চেয়ে দেখলাম। অপূর্ব! সব নির্জন, নিস্তব্ধ,—খালি ফাঁকা মাঠ আর সেই আবছা আলো, যেন একটা স্বপ্নলোক।

কিছুক্ষণ দেখলাম, তারপর আবার হাঁটা শুরু করলাম। তিনটে দিন বৃথাই কেটেছে, এ পথে আসিনি। এখন যতক্ষণ আছি, রোজ আসব, এই পথে যতখানি পারি হেঁটে নেব।

বিরাট কথা বলছে না, হেঁটে যাচ্ছে। একবার বললে, কদ্দূর যাবেন?

বললাম, চলুন না। কষ্ট হচ্ছে?

—আমার? বলছি আপনার কথা ভেবে। আবার ফিরতেও তো হবে।

—সে হোক।

ফেরার কথা পড়ে থাক। সেই পথ, সেই আলো, যেন নেশা লেগে যায়। খালি মনে হয় চলতেই থাকি।

সে পথ আন্দাজ করা যায় না। তবু মনে হ'ল মাইল তিনেক যখন চলে গেছি, সামনে বাঁদিকে ফণিমনসার ঝোপ, হঠাৎ তার পেছন থেকে এক বিকট চীৎকার। শুনে আচমকা গা কাঁটা দিয়ে উঠল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বিরাট বললে, ও কি?

বললাম, ফেউ।

বিরাট এসে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়াল। ফিসফিস ক'রে বললে, ফেউ!

বললাম, হ্যাঁ। এ ডাক আমার ভুল হয় না।

মাথার ভেতরে তখন বিদ্যুৎ ছুটছে। পেছনে বালিয়াড়ি তিন মাইল, দু'পাশে আর সামনে কতদূর, জানিনে। লোকালয় ব'লে কিচ্ছু কোথাও নেই। হাতে বন্দুক ছেড়ে ছড়িও নেই একটা। সঙ্গে

এক লোক, সে হয়তো বাঘের চেহারাই চোখে দেখে নি কোনদিন। এক্ষুণি দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কোলে চ'ড়ে বসতে চাইবে কি না কে জানে!

চাইলে না। বেশ ধীরেসুস্থে বললে, ফেউ তো ডাকে শুনেছি বাঘ বেরোলে।

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু এদেশে বাঘ আছে তো বলেন নি!

—নেই তো। বাঘ না অন্য কিছু?

—অন্য আর কি হবে। অবশ্য অন্য কারণেও ভয় পেলে ডাকে ফেউ, যেমন ধরুন ভূমিকম্প হ'লে। কিন্তু—

কথা শেষ হ'ল না। বাঁয়েব দিকটা দক্ষিণ, হাওয়া সেইদিক থেকে বইছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়াব ঝলক এল, তার সঙ্গে ভেসে এল বাঘের গায়ের গন্ধ। সন্দেহেব আর কিছু নেই।

আবাব ফেউ ডাকল। আরও কাছে। বিবাটের গলা একদম শান্ত। বলল, কি কববেন? যদি এইদিকে এসে পড়ে?

কি করব, আমারও জানা নেই। লোক নেই যে ডেকে জড়ো করব, গাছ নেই যে চড়ব। দৌড়ে পালানোর কথাই ওঠে না, সে বালির ওপর হাঁটাই দুষ্কর ব্যাপার। এক যদি, বাঘ নিজে থেকে অন্যদিকে চ'লে যায়। কিন্তু তাই যাবে এমন ভরসা কে দিচ্ছে।

বিরাট বললে, আসুন স'রে পড়ি।

বললাম, তাই। কিন্তু সোজাসুজি হেঁটে লাভ নেই, ওপরে চলুন।

ডানদিকে বালিয়াড়ির একটা অনেকখানি উঁচু ঢিবি উঠেছে, তার মাথায় এক বাদাম গাছ। দু'জনে সেই খাড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করলাম।

খানিক দূর উঠতেই, পেছনে ফণিমনসার ঝোপ ফুঁড়ে বাঘ বেরিয়ে এল।

থেমে, ফিরে তাকিয়ে তাকে দেখলাম। ঝকঝকে চাঁদের আলো, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। রয়াল নয়, লেপার্ড। কিন্তু বেশ বড়।

সাধারণত বনের বাঘ মানুষকে এড়িয়েই চলতে চায়, নিজেকে বিপন্ন না মনে করলে সেধে আক্রমণ করে না। সে করে, ম্যান-ইটাররা। আর করে, যদি কোন কারণে উত্ত্যক্ত বা আহত হ'য়ে থাকে।

বাঘও থেমে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকালে। দুই চোখ জ্বলছে, দেহ স্থির, ল্যাজটা ধীরে ধীরে একবার এপাশ একবার ওপাশ করছে। দেখে বললাম, লক্ষণ ভাল নয়। কেটে পড়ুন।

হাওয়ার আরেকটা দমকা ঝলক এল। বাঘের গায়ের গন্ধ, তার সঙ্গে আরও তীব্র একটা গন্ধ, পচা ঘায়ের গন্ধ। বুঝতে দেরি হ'ল না। কোথায় কোন্‌খানে কোন্‌ আনাড়ি শিকারী জখম ক'রে ছেড়ে দিয়েছে একে, সেই ঘা পচে উঠেছে, হয়তো তার জ্বালাতেই বাঘ ছুটে এই অঞ্চলে এসে পড়েছে। এ অবস্থায় বাঘ নিদারুণ ছোটে, রাতারাতি বিশ-পঞ্চাশ মাইল পথ পার হ'য়ে যায়, হয়তো এমন জায়গাতে গিয়ে পড়ে যেখানে সাধারণত বাঘের গতিবিধিই নেই। আর এ সব বাঘ অসম্ভব খেঁকী হ'য়ে ওঠে, মানুষ দেখলেই তাকে আক্রমণ করতে ছোটে।

এখন আর দেরি নয়। বিরাটকে টেনে নিয়ে বললাম, ছুটুন, যদি বাঁচতে চান!

উঁচু টিলা, তার মাথায় একটি ঝাঁকালো বাদাম গাছ। সেই একমাত্র ভরসা। গাছে যদি চড়তে পারি।

দু'জনে টেনে ছুট দিলাম, বাঘও পেছনে ছুটল। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম—তার আর আমাদের মধ্যে ফারাক জোর শ'দুই হাত।

টিলায় উঠব, সে বালি পায়ের তলায় খালি হড়কে হড়কে যায়, যত তাড়াতাড়ি করতে চাই ততই যেন স্পীড কমে যায়। অথচ, সে অবস্থায় ইচ্ছে ক'রে স্পীড কমিয়ে ধীরে-সুস্থে হেঁটে উঠব, এতখানি মনের জোরও থাকে না মানুষের।

আমরা তখন টিলার মাঝামাঝি উঠেছি, বাঘ টিলার তলায় এসে

পৌঁছেছে। রাগে গরগর করছে, চাপা গজরানি আমাদের কানে এসে পৌঁছচ্ছে। উঠতে গিয়ে পায়ের তলার বালি ধ্বসে যাচ্ছে। বেশীরকম যদি ধ্বসে একবার, কুমড়ো-গড়ান হ'য়ে সোজাসুজি তার পদতলে গিয়ে পৌঁছে যাব।

যেতামও হয়ত—বিরাট আমার হাত চেপে ধরলে, বললে, পেছনে তাকাবেন না, উঠে আসুন। সতি বলতে, আমাকে প্রায় টেনেই তুলতে লাগল সে। উঠতে উঠতে বললাম, ধুৎ, পা হড়কে যাচ্ছে খালি!

বিরাট বললে, সবারই যাচ্ছে। সেইটেই ভরসা। উঠুন।

দম তখন আর নেই, টিলার মাথায় এসে পৌঁছলাম। পেছন থেকে আওয়াজ শুনছি, বাঘও হাঁফাচ্ছে। সামনেই সেই বাদাম গাছ। টিলার পেছনে খাড়া দেয়াল নেমে গেছে, গাছ তার একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে। খানিকটা ডাল সোজা উঠেছে, খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে খড়ের ওপরে। বিরাট আমাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে ঠেলে দিলে, দাঁড়াবেন না, উঠে পড়ুন।

বাদামের গাছ ছোট, তার গাঁটে গাঁটে ডাল, উঠতে কষ্ট নেই। আমি সোজা ডালটা ধরে তড়বড় করে উঠে গেলাম। বললাম, আপনি ?

বিরাট বললে, আমার ওঠা হ'ল না। এসে গেছেন।

বলেই আচমকা লাফ মারলে সে, খড়ের ওপরে গাছের যে-ডাল ঝুঁকে ছিল, তাই ধরে ঝুলে পড়ল।

গাছের নীচে গরগর আওয়াজ উঠল। বাঘ গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি চেঁচিয়ে বললাম, সামাল!

বাঘ থমকে দাঁড়াল। মুখ তুলে আমাকে দেখলে, তারপর সোজা গাছ বেয়ে উঠে আসতে লাগল।

বাঘ গাছে চড়তে পারে না অনেকের ধারণা। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বিশেষ করে লেপার্ডরা। একমাত্র বাধা, দেহটা ভারী, খাড়া গাছের গায়ে নখ বিঁধিয়ে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। গাছ হেলানো

হ'লে বা ঘন ঘন ডাল থাকলে সে জ্বালাও থাকল না। তাতে ইনি রোগে ভুগে কিছু কাহিল আছেন। বেশ তরতর করে বেয়ে উঠে এল খানিকটা; তারপর আমার থেকে হাত চারেক নীচের একটা গাঁটে আঁকড়ে ব'সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, দেখছে আর গরগর করছে।

গাছ সেখানে সরু হয়ে গিয়েছে, দুজনের ভারে আর সনসন হাওয়ায় দুলছে ক্রমাগত, তাই হয়ত আরও উঁচুতে ঠেলে উঠতে ভরসা পাচ্ছে না—আমার বাঁচবার আশা সেইটুকুই। কিন্তু সে আশা কতক্ষণের? যদি আরও উঠে আসে? যদি দু'জনের ভারে গাছ ভেঙে পড়ে যায়?

নীচের দিকে তাকালাম। বিরাট সেই ডালে ঝুলে ছিল। নেই। দেখলাম, বাঘ খানিকটা উঠে আসতেই সে হাত ছেড়ে দিলে। বালির খাড়া পাঁচিলে গড়াগড়ি খেয়ে একদমে তার তলায় গিয়ে পৌঁছল। নীচেই ক্ষেত, তার পাশে ছোট্ট একটা ঘর—মাটির দেওয়াল খড়ের চাল, এদেশে যেমন হয়। দৌড়ে সেই ঘরে গিয়ে উঠল। ঘরে বোধহয় মানুষের সাড়া পেলে না। একটু পরেই দেখি, আবার তেমনি দৌড়ে সে বেরিয়ে এল। তার হাতে এক কোদাল।

দেখে সেই অবস্থায়ও হাসি এল। বন্দুক গেল, বল্লম গেল, এবার কোদাল দিয়ে যদি বাঘ মারা যায়। বললাম, কান্তি চৌধুরী, এবার গেলে।

বিরাটটারও নিশ্চয় মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে ভয়ে। মানুষের সাড়া পাসনি বেশ করেছিস, জমি পেলি পায়ের তলায় তো দৌড়ে পালিয়ে যা না—দু'জনের একজন অন্তত বাঁচি! আমার তো যা হবার হয়েই গেছে, বাঘ যদি দয়া ক'রে ফিরে যায় বা আচমকা হার্ট-ফেল ক'রে মরে—তা নইলে আমাকে আর বাঁচাচ্ছে কে! পালাবে, তা নয়, এক কোদাল ঘাড়ে করে আবার ঐ খাড়া বালিয়াড়ি বেয়ে উঠে আসছে কেন লোকটা, বাঘের সোজাসুজি? মাথা খারাপ ছাড়া আর কি বলা যায় তাকে?

বাঘ বেশ এঁটেসেঁটে বসেছে, সমানে আমাকে দাঁত খিঁচিয়ে চলেছে। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না—সে এক নেশার ব্যাপার। তবু তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চোখ চালিয়ে শ্রীমান বিরাটচন্দ্র বিশালের কাণ্ডটা দেখতে লাগলাম। কই, মাথা খারাপ তো নয়! বেশ ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তেই কাজ করছে সে। খাড়া পাঁচিল বেয়ে উঠে এল, একেবারে গাছের সোজাসুজি। মুখে কথা নেই, জোরে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না। টিলার ডগা থেকে তিন-চার হাত নীচে অবধি পৌঁছে সে থামল। বালির মধ্যে দুই পা বিঁধিয়ে দিয়ে দাঁড়াল, কোদাল দিয়ে টেনে টেনে নিঃশব্দে বালি ধ্বসিয়ে দিতে লাগল।

তখন বুঝলাম মতলবটা। বালি ধ্বসিয়ে ধ্বসিয়ে গোড়া আলগা ক'বে গোটা গাছটাকেই বাঘসুদ্ধ সে খডেব মধ্যে ফেলে দিতে চাইছে। একেবারে খাড়া পাড়, বালি ধ্বসানো কিছু শক্ত নয়, বেশ ঝুরঝুর ঝুরঝুর ক'বে বালি খ'সে পড়ছে তার কোদালের মুখে।

আমারও তখন প্রাণে ভরসা জেগেছে। একটিমাত্র সমস্যা, কাজ শেষ হবার আগে বাঘের দৃষ্টি তার দিকে না পড়ে, তার কোন শব্দ বাঘের কানে না যায়।

চেঁচিয়ে বললাম, কথা বলবেন না, শব্দ করবেন না। খুঁড়ে যান, এ ব্যাটাকে আমি ভুলিয়ে রাখছি।

বিরাট একবার মুখ তুলে তাকালে—আমার কথা শুনতে পেয়েছে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে আবার বালি খুঁড়তে লাগল।

আমি আর তার দিকে তাকালাম না—কি জানি, আমার চোখ লক্ষ্য ক'রে যদি বাঘ তার হদিস পেয়ে যায়। আমার কথা বলা শুনেই বাঘ খুব জোর গজরে উঠেছিল। তার দিকে তাকিয়ে বললাম, অত মেজাজ করছিস কেন রে ব্যাটা?

সে আবার গজরে উঠল।

আরো মিনিট দু'চার। গাছ একটু একটু দুলে উঠছে। বাঘ সেটা না ঠাহর পায়।

বাদামের একটা সরু ডাল ভেঙে নিলাম। লম্বা ক'রে সেটা ঝুলিয়ে দিয়ে বাঘের চোখের ওপরে নাচিয়ে, কথা ক'য়ে, মুখ ভেংচে বাঘকে আরও চটিয়ে দিতে লাগলাম। বাঘের চোখ জ্বলতে লাগল, গর্জন ক্রমেই বেড়ে উঠল, ল্যাজ আবার আছাড় খেতে লাগল। রাগের চোটে, আর যে কোথায় কি হচ্ছে, গাছ যে ক্রমেই নড়ে উঠছে নুয়ে যাচ্ছে, তাও খেয়াল হচ্ছে না তার। তারপর হঠাৎ একটা জোর ঝাঁকুনি, সঙ্গে সঙ্গে নীচে থেকে বিরাটের একটিমাত্র হাঁক—লাফান!

গাছটা আচমকা হেলে খড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল, আমি প্রাণপণে লাফ মেরে ডালপালার ঝোপ ছাড়িয়ে বালিতে আছড়ে পড়লাম, গাছ একেবারে ডালপালা আর বাঘ সবসুদ্ধ উলটে সেই খড়ের মধ্যে প'ড়ে গেল। প'ড়তে প'ড়তে বাঘ বিকট গর্জন ক'রে উঠল।

বিরাট উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, ঠ্যাং ভাঙে নি তো?

বললাম, না। বাঘ?

—সে ঘাট হাত তলায়। উঠে আসুক র'য়ে-স'য়ে। ততক্ষণ আমরা হাওয়া। ছুটুন।

আরও কি দাঁড়ায়! দু'জনে টেনে দৌড়। বালির ওপর হাঁটা যাচ্ছিল না আগে। দৌড়োনো যায় কিনা সেটা ধীরেসুস্থে ভেবে দেখবার সময় হ'ল না। কাণ্ডজ্ঞান ফিরল যখন, তখন শহরে পৌঁছে গেছি, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছি আর কাঁপছি।

আরও দিনচারেক কাঁথিতে থেকে ফিরে এলাম। বিরাটকে বললাম, ভুল হয়েছিল। আপনার নামটি নন্‌-কনোটেটিভ নয়। 'বিরাট-আকৃতি' নয় অবশ্য, 'বিরাট-হৃদয় বিশাল' হবে নামটা।

আমরা বলিলাম, তারপর?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, তারপর আর কি। বাঘটাকেও পাওয়া গেল—দিন-দুই পরে সেখান থেকে আরও প্রায় দশ মাইল দূরে।

মাঠের মাঝখানে ম'রে প'ড়ে ছিল। আমি ধরেছিলাম ঠিকই—তার পাঁজরা থেকে কাঁধ অবধি এক গুলির ছ্যাঁদা, তাতে ম্যাগট্ ভর্তি।

আমরা বলিলাম, তা বলি নি। গোড়াতে বললেন ভগবান যাকে যা দিয়েছে ব'লে কি সব, তার কি হ'ল?

কান্তি চৌধুরী চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, তাই তো হ'ল। বাঘ ছোটে ঘণ্টায় তিরিশ মাইল, মানুষ ছোটে পাঁচ মাইল। আমরা বালি বেয়ে উঠে গেলাম, সে ধরতে পারলে না কেন?

—কেন?

—বালিতে ছুটতে আমাদের পা হড়কাচ্ছিল, তারও হড়কাচ্ছিল। আমাদের দু'টো ক'রে পা, তার চারটে। তাই তার পা হড়কেছেও আমাদের চেয়ে দু'গুণ ক'রে। নইলে আমাদেরও যদি চারটে ছ'টা পা থাকত, তবে কি আর তার হাত থেকে পরিত্রাণ ছিল সেদিন?

বন-তুলসীর বাণী

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

এ বাঘকে আমি নিজে মারি নি। মরতে দেখেছি।

রঙপুরে যতীনবাবুদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে পার্বতীপুরে এসে দেখি ট্রেন নেই, বন্যায় কোথায় লাইন ভেঙেছে।

স্টেশন-স্টাফ বললেন, তিন দিন অন্তত কথা কইবেন না।

কি করি। সেখানে বসে থাকার মানে হয় না। ফিরে যেতে পারি, কিন্তু স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি বিশ মাইল। তাছাড়া যে-বাড়ি থেকে এইমাত্র চ'লে এলাম সেখানে আবার বেড়াতে গিয়ে সুখ নেই। একমাত্র, খানসাহেব আছেন, এই যা।

আমি বললাম, তাই চলুন ফিরেই যাই।

যতীনবাবু বললেন, দুর। তার চেয়ে চলুন কান্ত নগর দেখে যাবেন।

—কান্ত নগর কি?

—একটা মন্দির। দিনাজপুর থেকে আঠারো মাইল।

—চলুন তাই।

যতীনবাবুর এক মাসতুতো ভাই দিনাজপুরে স্কুলমাস্টার। তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

কান্তজীর ব্যাপারটাও শুনে নেওয়া গেল। দিনাজপুরের বনেদী জমিদার, মহারাজা পদবী। অনেক কালের জমিদারি এঁদের, প্রায় বাদশাহী আমল থেকে। বিস্তীর্ণ মহাল। কিন্তু আশ্চর্য ভাগ্য, অনেক পুরুষ থেকেই নাকি এঁরা নিঃসন্তান—পরপর পোষ্যপুত্র নিয়ে বংশ

চলছে। তবু ভাগ্যের কথা, উচ্ছৃঙ্খলতার রেওয়াজ এ বংশে নেই। অমিতব্যয়ী বলা যায়, সে দানে। অনেকগুলো মহাল এঁদের, অনেকগুলো হাট, তাব অনেকগুলোই নাকি কেউ না কেউ দান ক'রে ব'সে আছেন—এই হাটের আয়ে ঐ মন্দিরের পূজো চলবে ওই মহালের আয় যাবে অমুক অতিথিশালায়—এমনি করেই নাকি এঁদের অবস্থা এখন কাহিল হ'যে এসেছে। অনেক মন্দির, অনেক দেবসেবা, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছেন কান্তজী।

মহারাজার পূর্বপুরুষেরা আগে ছিলেন ঘোর শাক্ত। শহরের বাড়িতে এখনও দুর্গামূর্তি আছে। নিত্যপূজার ব্যবস্থা। দুর্গার নিত্যপূজা আর কোথাও দেখি নি। এককালে নাকি নরবলিও হ'ত এই মন্দিরে। তারপর এক পূর্বপুরুষ তীর্থ-ভ্রমণে গেলেন, ফিবলেন বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে। এক কৃষ্ণ-বিগ্রহ সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। তাঁরই নাম কান্তজী। এখন এঁদের বংশে এই কান্তজীরই প্রধান পূজো। দুর্গা-মন্দির আছে, পূজোও হয়, কিন্তু বলি-টলি বন্ধ।

শহরের একধারে রাজবাড়ি। সেখানে কান্তজীর মন্দির। বছরে ছ' মাস না সাত মাস কান্তজী এখানেই থাকেন। বাকি পাঁচ-ছ'মাস থাকেন অন্য একটি মন্দিরে। তারই নাম কান্ত নগর। কোন্ মহারাজাকে নাকি স্বপ্ন দিয়েছিলেন, শহরের কোলাহলে আমার অস্বস্তি হচ্ছে। তাই নতুন ক'রে মন্দিব তৈরী হ'ল—তাঁর সিমলা-শৈলাবাস। বড় বড় ক'টা মহাল আর হাট দেওয়া আছে পূজোর খরচের জন্য।

পরদিন দেখতে গেলাম। শহর ছেড়ে মাঠ—দু'ধারে মাঠের মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তা চ'লে গিয়েছে, আঠারো মাইল. তার মাথায় কান্ত নগর।

জায়গাটি যিনি বেছেছিলেন তাঁর রুচির তারিফ করতে হবে। চওড়া একটি খাল বা সরু একটি নদী যাই বল, এমন একটা ঘুরপাক খেয়ে গেছে, মাঝখানের খানিকটা জমিকে চারদিক থেকে ঘিরে প্রায়

দ্বীপ ক'রে ফেলেছে। সেই দ্বীপের ওপরে মন্দির।

মন্দিরটি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

মন্দির খুব বড় নয়, খুব প্রাচীন বলেও মনে হ'ল না। হয়তো দেড়শো-দু'শো বছর। ইটের মন্দিব, গায়ে নানারকম কাজ করা। তার মধ্যে হিন্দু মিস্ত্রির হিন্দু ঢং, মুসলমান মিস্ত্রির মুসলমানি ঢং দুটোই একেবারে পাশাপাশি মিশে আছে। কিন্তু আশ্চর্য তার পরিচ্ছন্নতা! মন্দির, তার বাঁধানো উঠোন, তার চারধাবের মাঠ—কোথাও এতটুকু নোংরা নেই, আগোছালো নেই, ঝকঝক তকতক করছে, যেন এইমাত্র কেউ ধুয়ে মুছে সাফ ক'রে দিয়ে গেল।

তাব চেয়েও ভাল লাগল তার ম্যানেজমেণ্ট। দেবমন্দির মানেই তো খানিক পচা ফুলপাতা আব খানিক দুর্গন্ধ প্রকৃতিব এগজিবিশন—প্রণাম করতে যাবার মুহূর্তে পাণ্ডা এসে হাত পেতে বলবে আমার পয়সাটা আগে দিয়ে দাও। তখন চড়াক ক'রে মাথায় রক্ত উঠে যায়, ইচ্ছে করে এক চড কষিয়ে দিয়ে ফিরে যাই, দেবতাকে প্রণাম করা মন থেকে উবে চ'লে যায়। চবম শাক্তের মন্দির কালীঘাট আর পরম বৈষ্ণবেব মন্দির পুরী, সর্বত্র একই অবস্থা।

এই একটি মন্দিব জীবনে দেখলাম যেখানে এই উপদ্রব নেই। প্রসন্নমনে স্নিগ্ধচিত্তে প্রণাম করা যায় দেবতাকে। মন্দিরের নিয়ম, বেলা দুপুর অবধি যত যাত্রী আসবে সবাই প্রসাদ পেয়ে যাবে। আমরাও পেলাম। কাটারিভোগ আতপ চালের ভাত, ঘি, তরকারি। সব নিবামিষ। কিন্তু অপূর্ব রান্না। আর তেমনই পরিষ্কার।

সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যার মুখে শহরে ফিরে এলাম।

যতীনবাবুর যাতায়াত আছে, অনেক কিছুই তাঁর জানা। বললেন, জন্মাষ্টমীতে কান্তজী শহরে আসেন। একমাস ধ'রে রাজবাড়ির আশপাশ জুড়ে মেলা বসে যায়।

শুনলাম এই মেলার এক আশ্চর্য বস্তু তার লুচি। লাল আটা ঠেসে, ঘিয়ে ভেজে লুচি তৈরী করে হালুইকররা, এক-একটার

ডায়ামেটার ষোল থেকে চব্বিশ ইঞ্চি। কুমোরের দোকানে মেটে হাঁড়ির মত উঁচু ক'রে সাজিয়ে রেখে দেয়। যাত্রীরা কিনে কিনে খায়, দেশে নিয়ে যায়। মেলার গোড়াতে তৈরী হবে এই লুচি, সেই স্টক একমাস ধ'রে বিক্রি হ'তে থাকবে—অথচ না সে পচে, না তার চেহারা বা গন্ধ বদলায়। লোকে বলে কান্তজীর মাহাত্ম্য।

শীতের সময়ে কান্তজী আবার চ'লে যান কান্ত নগরে। যাওয়া-আসা, সেও এক সমারোহ ব্যাপার।

যতীনবাবু বললেন, আগে নদীর পথে মিছিল আসত। ধুমধাম আর রং-এর খেলায় নদী লাল হ'য়ে যেত। তারপর একবার বাধা পড়ল। নদীর পথে লোকেরা বাধা দিল, বাদ্য-ভাণ্ড শুনে তাদের ধর্ম নষ্ট হচ্ছে। মহারাজার লোক গুলী চালালে। কিছু খুন-জখম হ'ল। তাই নিয়ে অনেক কাণ্ড। শেষ অবধি যা হ'য়ে থাকে সর্বত্র, নদীর পথে প্রসেশন আসা বন্ধ হ'য়ে গেল। এখন কান্তজী আসেন এখানে স্থলপথে, যাত্রার জলুষও কমেছে।

বললাম, বিষ্ণু নিজেও কি বৈষ্ণব?

যতীনবাবু বললেন, আমি কি ক'রে জানব বলুন। আপনি বামুন হ'য়ে জিজ্ঞেস করছেন—আমি তো কায়েতের ছেলে।

পরদিন খবর নিয়ে জানা গেল, গাড়ি আপাতত দিন চার-পাঁচ চলছে না, লাইন এখনও জলের তলায়। অতএব সে-ক'দিন স্থিতি।

বসে আছি, ঘুরে ঘুরে শহর আর শহরতলী দেখছি, জায়গাটা সুন্দর। আবহাওয়াও খানিকটা বিহার-ঘেঁষা। বালি জমি, শহরে বাড়িঘর কম, মাঠ-ঘাট আমবাগানে ভরা, শহরের মধ্যে শহরের বাইরে অজস্র জলপদ্মের বন, সাদা পদ্ম ফুটে মাঠ আলো ক'রে রেখেছে।

সবচেয়ে সুন্দর লাগল নদীটি দেখে। শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে নদী চ'লে গেছে, তার ওপরে রেলের পুল। ছোট নদী, বালি ভরা, হেঁটে পার হওয়া যায়। কিন্তু বর্ষায় নাকি এরই তোড় হয় প্রচণ্ড। বর্ষার নদী শহর না ভাসায় তাই নদীর ধার ধ'রে উঁচু পাড় বাঁধা

জায়গাতে জায়গাতে। নদীর নাম পুনর্ভবা, সেখানকার লোকে বলে কাঞ্চন। কাঞ্চনই বটে—বালির চড়ায় আর একবিঘত জলে রোদের আভা প'ড়ে তাকে সোনা বানিয়ে দেয়।

আমরা যে রাস্তাটিতে আছি তার নাম ঘাসীপাড়া। লোকে বলে কাঞ্চন রোড। রাস্তা সোজা গিয়ে নদীতে নেমেছে। নদীতে যেখানে পৌঁছল, তার পাশেই শ্মশান। প্রথম যেদিন গেলাম, বিকেলবেলা, নদীর ওপারে পশ্চিমের আকাশে মেঘের অদ্ভুত রং, তার ছায়া পড়েছে নদীতে আর ঘাসে। মনে হ'ল, ম'রে যদি এমনি জায়গাতে থাকি, তার চেয়ে আর সুখ হয় না।

দাঁড়িয়ে আছি, কোথা থেকে একটা কুকুর এল। দিশী কুকুরই। কিন্তু চমৎকার চেহারা, সাদায় চকোলেটে রং, আশ্চর্য সুন্দর গড়ন। ডেকে বললাম, আয়।

কুকুরটা গর্‌গর্‌ ক'রে গর্জন ক'রে উঠল।

যতীনবাবুর ভাই শশাঙ্কবাবু সেদিন সঙ্গে। বললেন, খবরদার এমন কাজও করবেন না, এরা মানুষ-খেকো কুকুর, ভয়ানক হিংস্র।

—মানুষ-খেকো মানে?

শশাঙ্কবাবু হাত বাড়িয়ে দেখালেন।

—ঐ যে দেখছেন, ঐখান থেকে শ্মশান শেষ, বন আরম্ভ। বন মানে বড় গাছ নয়, বন-তুলসীর জঙ্গল। এককালে গ্রাম ছিল একটা, এখন বন হ'য়ে গেছে। হাসপাতালের আর টাউনের যত বেওয়ারিশ মড়া, মিউনিসিপ্যালিটির ডোমরা কষ্ট ক'রে আর পোঁতে না, ঐ জঙ্গলে ফেলে দিয়ে যায়। এই কুকুররাও জঙ্গলেই বাসা বেঁধেছে। গাড়ি থামাবার তর সয় না—লাফিয়ে উঠে নিজেরাই গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যায় লাসকে; দু'মিনিটে ফাঁক ক'রে ফেলে। এদের ভয়ে কেউ বনে ঢোকে না।

আমার কি মনে হ'ল, বললাম, জ্যান্ত মানুষকেও খাবে?

—খাবে না হয়তো, কিন্তু আক্রমণ করতে কতক্ষণ? ডোমরাও

হঠাৎ ঢোকে না, মোটা বাঁশের লাঠি হাতে ক'রে তবে যায়।

আমি বললাম, আমি একবার দেখব।

পরদিন দুপুরবেলা, বেলা বারোটা হবে। খেয়ে উঠে গড়াচ্ছি। শশাঙ্কবাবু ডেকে বললেন, ও মশায়, যাবেন সত্যি?

বললাম, কোথায়?

—মড়া খাওয়া দেখতে?

—যাব।

—তবে চলুন। রথ চ'লে গেছে।

—মানে?

—ঐ শুনুন।

দূর থেকে কানে এল একটা খং খং শব্দ। শশাঙ্কবাবু বললেন, মিউনিসিপ্যালিটির লোহার গাড়ি। ঐ গাড়ির চক্রধ্বনি শুনলেই কুকুর মহলে সাড়া পড়ে যায়। ঐ দেখুন।

বাস্তবিক দেখলাম, আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই দুটো তিনটে কুকুর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল।

বললাম, এরাও খায় নাকি?

—ভাগ খুব মেলে না। তবু পাতকুড়োনো ছিটেফোঁটা পাবার ভরসা করে। উঠুন। দেরি হ'লে ফসকে যাবে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বনের কাছে পৌঁছেছি, দেখি সে লোহার গাড়ি ফিরে আসছে। মোষে-টানা গাড়ি। ওপরে দুই ভীমকায় মূর্তি বসে, হাতে মোটা বাঁশের লাঠি, তার মাথায় লোহার বেড়।

শশাঙ্কবাবু বললেন, দেরি হ'য়ে গেল।

বনে ঢুকতে গিয়ে দেখি, বিপর্যয় কাণ্ড। বড় গাছ কিছু নেই, খালি একনাগাড়ে বন-তুলসী। কিন্তু এমন উঁচু, আর এমন ঘন, জায়গাটাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে একেবারে। খানিকদূর ঢোকার পর মনে হ'ল, আমাদের আর বাইরের পৃথিবীর মধ্যে যেন কত

মাইলের ফারাক। বাইরের কোন সাড়াশব্দ কানে আসছে না, চারদিক অদ্ভুত নিস্তব্ধ। শুধু সরু একটুখানি পথ, আর সবই বন-তুলসী। পথে চলতে তার ডাল পায়ে পায়ে গায়ে এসে লাগছে, কাত হ'য়ে হাঁটতে হচ্ছে। চারপাশে বন-তুলসী, মাথার ওপরে বন-তুলসী—সেই বনের মধ্যে মনে হ'ল যেন নিঃশেষে হারিয়ে গেছি। আর কি সাংঘাতিক সে বন-তুলসীর গন্ধ! যেমন বুনো গন্ধ তেমনি তীব্র—দু'মিনিট না যেতে মনে হ'ল যেন সর্বাঙ্গ ব্যেপে জ্বর উঠে যাচ্ছে।

বললাম, ভালো জায়গা। এর মধ্যে যদি ম'রেও পড়ে থাকি, কেউ কোনদিন জানবে না।

শশাঙ্কবাবু বললেন, পড়েও থাকতে হবে না বেশীক্ষণ, অচিরাৎ জীবের সেবায় লেগে যাবেন।

—ঠিক কথা। সে তাঁরা কই, যাঁদের দেখতে এলাম?

—আছে, আরও সামনে। দেখছেন না চাকার দাগ আরও এগিয়ে গেছে!

কথা বলতে বলতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তারই মধ্যে দুই পায়ে মশার মিটিং বসে গেছে। নীচু হ'য়ে দুই পায়ে চাপড় মেরে পা চুলকোচ্ছি, সামনের দিকে চোখ পড়তেই চক্ষুস্থির। বন-তুলসীর তলায় তলায় ফাঁকা জায়গা, তার জমি ছেয়ে আছে সব আকার আর সব প্রকারের হাড়ের টুকরোয়। সবই মানুষের হাড়—মাথার খুলি, হাত, পা, মেরুদণ্ড—একেবারে অজস্র। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, ও মশাই, এ যে হাড়ের পাহাড়! রাক্ষুসীর দেশে এলাম নাকি?

শশাঙ্কবাবু বললেন, তা খানিকটা তো বটেই। কম দিনের আর কম মানুষের কথা তো নয়। ছোট হাড়গুলোকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, বড়গুলো পড়ে থাকে। কঙ্কাল বেচার ব্যবসা করে যারা, এখানে এলে বড়লোক হ'য়ে যেত।

আরও একটু এগিয়েছি, হঠাৎ পাশ থেকে একটা ক্ষীণ ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ কানে এল। শশাঙ্কবাবু বললেন, কারো শান্তিভঙ্গ ক'রে ফেলেছি। নুয়ে দেখুন, কিন্তু বেশী কাছে যাবেন না।

নুয়ে তাকিয়েই চমকে গেলাম।

শশাঙ্কবাবু বললেন, কি হ'ল ?

কুকুর নয় তো! বাঘ।

বটে!

শশাঙ্কবাবুর ওপরে হঠাৎ ভক্তি এসে গেল। নিরীহ মানুষ, করেন স্কুল মাস্টারী, সে লোক বাঘের নাম শুনলে চমকায় না, ঘাবড়ায় না!

বললাম, হ্যাঁ, দেখুন না নিজে।

রয়াল নয় অবশ্য, লেপার্ড।

তবু বাঘই তো।

দু'জনে ব'সে পড়ে আবার তাকালাম। লেপার্ড, মাঝারি সাইজ। কাত হ'য়ে শুয়ে আছে, মনে হ'ল শুয়ে আরাম করছে। দিবানিদ্রার ব্যাঘাতে একটু চটেছে হয়ত, কিন্তু উঠে এসে ঝগড়া করবার মত উৎসাহ বোধ করছে না।

বললাম, বাঘ আছে এখানে ?

সাধারণত থাকে না, কুকুরদের জ্বালাতেই আসে না; তবে নেহাৎ এসে গেলে আইনের নিষেধ কিছু নেই।

এক জ্বালা হ'ল। বসে রয়েছে বাঘটা, তাকে ভালমতন একটু না দেখে ফিরে আসার মানে হয় না। ওদিকে দুই হাতে দুই থাপ্পড় ছাড়া অস্ত্রও কিছু নেই—এমন একটা গাছ নেই হাতের কাছে যে নিদেন একটা ডালও ভেঙে নিতে পারি।

শশাঙ্কবাবু বললেন, কি করবেন ?

বললাম, করব আর কি, তাড়া ক'রে যতক্ষণ না আসছে, একটু দেখেই নেওয়া যাক বাবাজীকে।

তা যাক, শশাঙ্কবাবু পরম নিশ্চিন্ত মনে বললেন।

আমার আশ্চর্য লাগল। এমন ক'রে বলছেন, সত্যি ক'রে তেড়ে এলে কি করবেন ভদ্রলোক?

বললাম, সত্যি তেড়ে আসে যদি?

শশাঙ্কবাবু বললেন, এলে আর কি করব। আমার ভয় বিশেষ নেই—ইস্কুল মাস্টারের গায়ে মশা বসে না, জানে রক্ত নেই। বাঘ কি এত বোকা হবে, আপনাকে ফেলে আমাকে খাবে?

দু'জনে বসে আছি, বাঘ আর আমরা, মাঝখানে তফাত প্রায় ত্রিশ হাত। মাঝখানে ঘন বন। উবু হ'য়ে বসে তার তলা দিয়ে আমরা তাকিয়ে আছি। বাঘ যেখানটাতে বসে, ঠিক তার ওপরে খানিকটা বোধহয় বন-তুলসীর ডাল ভাঙা বা পাতলা—খাড়া রোদ এসে পড়েছে নীচে, বাঘকে একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা আলোর সার্কেলের মাঝখানে। তার চারপাশ ঘিরেই ঘন ছায়া, প্রায় অন্ধকার, তার ফলে বাঘের চেহারাটা আরও ঝক্‌ঝক্ করছে।

মাঝারি সাইজের বাঘ। বয়সও খুব বেশী নয়, স্বাস্থ্য নিটোল। এ কিরকম বাঘ, মানুষের সাড়া পেয়েও নড়ছে না চড়ছে না। না উঠছে রাগে গজরে না চেষ্টা করছে স'রে যেতে—আশ্চর্য লাগল। কি হ'ল ওর, ও কি কানা, বয়রা, খাঁদা; আমরা দুটো বীরপুরুষ ব'সে আছি সে কথাটা চোখে কানে নাকে টেরই পাচ্ছে না মোটে?

বললাম, ও মশায়, কি হ'ল বাঘের? একেবারে গ্রাহ্যিই করছে না, এ যে ধিক্কার ধরিয়ে দিলে।

শশাঙ্কবাবু বললেন, না করা ভাল। আমাদের গ্রহণযোগ্য মনে করলে কি অবস্থাটা বিশেষ মুখরোচক হ'ত? মানে আমাদের পক্ষে?

বললাম, তা বটে। কিন্তু এটাও ক্রমশ মানহানিকর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। ব্যাটার কি প্যারালিসিস হয়েছে, বা গ্যাস্ট্রিকাল থ্রম্বোসিস?

শশাঙ্কবাবু বললেন, আহা, দেখাই যাক না চুপ ক'রে।

বসে আছি, নড়ছি না। মিনিট পাঁচেক কাটল। মিনিট দশ। বললাম, দূর ছাই, এ ব্যাটাচ্ছেলে কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা। চলুন যাই।

চলুন।

উঠতে যাচ্ছি এমন সময়ে হঠাৎ এক কাণ্ড। বাঘের পায়ের দিকের অন্ধকারটা হঠাৎ নড়ে উঠল। তারপর লম্বা হ'য়ে সামনের দিকে হাত বাড়ালে। বাঘ লাফিয়ে উঠল, তারপরই আবার মাটিতে আছড়ে পড়ল।

পাশে অন্ধকার, বাঘের কাছে আলো, ব্যাপার চোখে পড়ে গায়ে কাঁটা দিলে। বিরাট পাইথন। অন্ধকারের আড়াল থেকে লাফ মেরে একেবারে বাঘের গায়ে এসে পড়েছে। চোখে ঠাহর পেলাম না এমন স্পীডে তাকে তিন-চার পাক জড়িয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার একটা পেছনের থাবাকে মুখে পূরে ফেলেছে।

শশাঙ্কবাবু বললেন, এটা তো না দেখে যাওয়া যায় না।

বললাম, নিশ্চয়! বসে পড়ুন লেপ্টে। উবু হ'য়ে আর বসা যাচ্ছে না, হাঁটু টাটাচ্ছে।

মাটির ওপরে ল্যাপটা খেয়ে দু'জনে বসে পড়লাম। কুকুরের ভয় আর নেই, বাঘের কাছে তারা আসবে না!

অদ্ভুত দৃশ্য। চারপাশে ঘন ছায়া, মাঝখানে আলোর একটি ফোকাস, তার মাঝখানে নিঃশব্দ অভিনয় চলছে, যেন আগের কালের একটা সাইলেণ্ট ফিল্ম। সাপ বাঘকে পাকে পাকে জড়িয়ে নিচ্ছে, বাঘের পেছনের একখানা থাবা তার মুখের মধ্যে। বাঘ দু'একবার ছোটরকম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করেছে, তারপর প্রায় চুপচাপই বসে গেছে! তারপর থেকে সব একদম নিঃঝুম। বাঘ শুধু থেকে-থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলছে, হয়ত একটু নড়েচড়ে বসছে। আর চুপচাপ চেয়ে চেয়ে সাপটাকে আর নিজের ঠ্যাংটাকে দেখছে। এক-একবার আমাদের দিকেও তাকাচ্ছে।

তার চোখে সে কিসের দৃষ্টি বলা শক্ত—কখনও মনে হয় করুণ দৃষ্টি, যেন আমাদের বলছে ছাড়িয়ে দাও। কখনও মনে হয় প্রসন্ন দৃষ্টি, বলছে আহা খাচ্ছে খাক। সাপের মুখচোখে কোন ভাবের অভিব্যক্তি নেই, সে প্রায় নিশ্চল ভাবেই পড়ে আছে। আমরা দু'জনে ঠায় ব'সে। নড়ছি না, পলক ফেলছি না, শুধু মাঝে মাঝে একটা দুটো কথা, তাও অত্যন্ত ফিসফিস করে, যেন কথা বললেই দৃশ্যটা ফুরিয়ে যাবে। সাপের ল্যাজের দিকটা একটু একটু করে নড়ে উঠল, আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে সে বাঘের দেহ থেকে প্যাঁচ খুলে নিলে, নিয়ে দেহটাকে লম্বা করে পেছনে বাড়িয়ে দিলে, তারপর ধীরে ধীরে গিলতে শুরু করল।

বাঘ একবার তাকিয়ে নিজেকে দেখল। সামনের দুই থাবায় ভর ক'রে নিজেকে সামনে ছেঁচড়ে নিতে চেষ্টা করল। তারপর আবার সেটুকুনও বন্ধ ক'রে ব'সে রইল, সামনের থাবায় ভর দিয়ে, মাথাটাকে উঁচু ক'রে।

শশাঙ্কবাবু বললেন, কোমর ভেঙে গেছে।

বাঘ হঠাৎ পেছনের বাঁ পায়ে জোর একটা ঝাড়া দিলে। সাপ ধরেছে ডান পাটা। বাঁ পা মাটিতে বসিয়ে দেহকে সামনে এগিয়ে দিলে। সাপ কিন্তু কামড় ছাড়ল না। শুধু গলাটা একটু লম্বা করে ঝাঁকুনি সামলে নিলে।

শশাঙ্কবাবু বললেন, ভাঙে নি তো?

বললাম, না।

—তবে? পালাচ্ছে না কেন?

—আলস্যে। অযোধ্যার ছেলে হয়ত।

সাপ ক্রমশ গিলে গিলে এগোতে লাগল। বাঘের ল্যাজটা নড়ে উঠল। ল্যাজের ডগাটা শক্ত হ'য়ে বেঁকে সাপের মুখে নাকে খোঁচার মত বুলিয়ে যেতে লাগল।

আমি বললাম, ও কি করছে?

শশাঙ্কবাবু বললেন, সাপের নাকে শুড়শুড়ি দিতে চাইছে। সাপ হেঁচে ফেললেই পা ছাড়িয়ে নেবে।

আমি বললাম, না। পায়ের বদলে ল্যাজটা এগিয়ে দিচ্ছে, সাপকে লোভ দেখাচ্ছে। সাপ যদি ঠ্যাং ছেড়ে ল্যাজ ধরে, ল্যাজটা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে টিকটিকির মত।

—অত বুদ্ধি!

—হবে না কেন, হ'লই বা বাঘ, বাবেন্দির তো!

অনেকক্ষণ ধ'রে এই ব্যাপার চলল। বাঘ তাকিয়ে তাকিয়ে সাপের ঠ্যাং গেলা দেখছে। আর ল্যাজটা সাপের মুখের কাছে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সাপও ভুলবার ছেলে নয়, কিছুতেই ঠ্যাং ছেড়ে ল্যাজ ধরছে না। ল্যাজটা দু'একবার তার চোখেও খোঁচা মেরে দিলে, তবুও না। বাঘ দেহকে বাঁকিয়ে তুলে নিয়ে এল। দু' ভাঁজ হ'য়ে তার দেহের সামনের দিকটাকে একেবারে সাপের মাথার ওপরে এনে ফেললে।

ভাবলাম, হ'ল, এইবার নিশ্চয় সাপের মাথায় কামড় বা থাবা বসিয়ে দেবে। দিলে সে সাপের মাথা একেবারেই ছাতু হ'য়ে যাবে। কিন্তু দিলে না। কিছুই করল না। সাপের দিকে তাকিয়ে চেয়ে রইল। আবার একবার মুখ তুলে আমাদের দিকে চাইলে। কি করুণ দৃষ্টি—তোমরা ছাড়িয়ে দাও গো! ওকে বলে দাও এটা অন্যায় করছে।

আমি বললাম, কি করবেন? ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন?

শশাঙ্কবাবুর দেখলাম চোখ জ্বলছে। চাপা গলায় বললেন, না!

আমি বললাম, দিলেও হয়। যান না, বন্দুক একটা নিয়ে আসুন। আমি বসছি। আছে বন্দুক?

—আমার নেই, মজুমদারদের আছে।

—দেবে না?

—তা দেবে। কিন্তু আনব না।

—কেন ?

—কেন আনব ? ইচ্ছে করলে ও এক্ষুনি সাপের মাথা ভেঙে চুর করতে পারে এক থাবায়। নিজেকে বাঁচাতে যার অনিচ্ছা তাকে বাঁচাতে যাব, আমার দরকার ?

—কিন্তু সত্যি এমন ঔদাসীন্য কেন ওর ?

—বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে হয়ত। আত্মহত্যা করছে।

—তবে আর আমাদের দিকে অমন করুণ নয়নে তাকায় কেন ?

—কাব্য করছে। বলছে, দেখে রাখো তোমরা, আমি কি অবহেলায় জীবন দিয়ে দিলাম।

—তাতে লাভ ?

—আছে মশায়, যার লাভ সে বোঝে। আপনার আমার মাথা ঘামাবার দরকার কি ?

—দূর! ঐ দেখুন বসাচ্ছে কামড়। সত্যিই বাঘ মুখ নীচু ক'রে কামড় বসালে। কিন্তু সাপের মাথায় নয়। নিজের হাঁটুতে। বার বার ক'রে কামড়ে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুলতে লাগল।

আমি বললাম, ও কি করছে ?

—অ্যাম্পুটেশন। ভেবেছে ঐ অবধি কেটে দিলে সাপ খুশী হয়ে যাবে, বাকিটাকে ছেড়ে দেবে।

—কি বলেন যা তা।

—দেখুন না মশায়। আমার দেশের বাঘ, আমি চিনিনে ?

ঠ্যাং কাটা হ'ল না। ছেঁড়া মাংস আর রক্তের গন্ধ পেয়ে সাপ উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক'রে গিলে এসে হাঁটু অবধি মুখে পুরে ফেললে।

বাঘ মুখ সরিয়ে নিলে। নিয়ে আবার কামড় বসাল। এবার নিজের ঠিক হিপ-জয়েণ্টে।

শশাঙ্কবাবু বললেন, ঐ দেখুন। হাঁটুতে ঠেকানো গেল না, এবার গোটা ঠ্যাং ছিঁড়ে দিচ্ছে। ভেবেছে তাই দিয়ে পার পাবে।

—কি জানি কেমনতর বাঘ আপনাদের দেশের। কিন্তু ঠ্যাং ছেড়ে দিয়ে ধরলাম বাঁচা গেল। তারপর টিকে থাকবে কি ক'রে?

—কেন? ল্যাজ তো রইল।

সাপ ধীরে ধীরে গেলে, তাই জানতাম। এত ক্ষিপ্রগতিতে গিলতে পারে, ধারণা ছিল না। মিনিট কয়েকের ভিতরে বাঘের গোটা ঠ্যাংটা তার মুখের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তারপর কোমরের আস্ত গাঁটটা। তারপর সেই ভাঁজে ভাঁজেই অন্য ঠ্যাংটাও।

সে ঠ্যাং দিয়ে তখনও সে মাটিতে ঠেলা লাগাচ্ছে।

অথচ, কি আশ্চর্য, একটিবার ফিরে সাপের গায়ে আঁচড় বসাবার পর্যন্ত চেষ্টা করছে না। সে অদ্ভুত দৃশ্য। তাকিয়ে দেখাও যায় না, চোখ ফিরিয়ে নেওয়াও অসম্ভব।

একটা পা, কোমর, আরেকটা পা, পিঠের তলার দিকটা, ক্রমে ক্রমে সাপের মুখের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে। পিঠের ওপরে তার ল্যাজটা লম্বা হ'য়ে বেরিয়ে মাথায় ঠেকেছে, পরম পূজনীয় টিকি ব'লে ভুল হচ্ছে। কোমর পিঠ ঘাড়—প্রায় সবটা বাঘই তখন সাপের পেটে। শুধু বাঘের মাথাটা বেরিয়ে আছে, সাপের মুখের সামনে তার সামনের থাবা দুটো লম্বা হ'য়ে আছে। হাতের গোড়াটা সাপের মুখের মধ্যে। থাবা দুটো আর মাটি আঁচড়াচ্ছে না, লম্বা হ'য়ে সামনে সোজা হ'য়ে আছে। থাবা দুটো জোড়া, যেন করজোড়ে স্তব বা প্রণাম করছে।

শশাঙ্কবাবুর নিশ্বাস ঘনঘন পড়ছে, চোখ জ্বলছে, মুখটা রাগে লাল হ'য়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে কি একটা বললেন, ভাল শুনতে পেলাম না। তাকিয়ে বললাম, কি বললেন? শশাঙ্কবাবুর গলায় আওয়াজ নেই। ঠোঁটও প্রায় না নেড়েই বললেন, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।

—মানে?

—কিছু না।

বাঘের মাথা, তারপর সেই স্তবরত জোড়হাত, সব অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সাপ একটুকাল ঝিম খেয়ে রইল। তারপর তার গলার দিক থেকে গোটা দেহটাতে বারবার ঢেউ খেলে যেতে লাগল—ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঠেলে ঠেলে বাঘকে পেটের তলার দিকে পাঠিয়ে দিলে। দিয়ে সোজা হেঁটে ঝোপের তলায় অন্ধকারে গিয়ে ঢুকল।

শশাঙ্কবাবু বললেন, উঠে পড়ুন, আর নয়।

দুজনে ঝোপের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ব'সে ব'সে হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, ঘণ্টা দুই আড়াই লেগেছে। অথচ কোথা দিয়ে কাটল এতক্ষণ, টেরই পাই নি, যেন একটিমাত্র মুহূর্ত।

বাড়িতে এসে সেই গল্প হচ্ছে, শশাঙ্কবাবু বাধা দিলেন। বললেন, থাক, ও আব মনে পড়িয়ে লাভ নেই।

বললাম, ব্যাপারটা কি হ'ল, তাই তো বুঝলাম না কিছু। সত্যি কি বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া ?

—ধর্ম।

—তার মানে ?

—মানে আবার কি! তান্ত্রিক রাজা যেখানে বোষ্টম হ'য়ে যেতে পারে, সেখানে সবই হয়।

—কি বলছেন ? অহিংস বাঘ ?

—নয় কেন! বাঘ বলে কি মানুষের শরীর নয় ? বলে ময়দার লুচি স্টে-ব্রাইট হ'য়ে যায়, দোষ করেছে বাঘের বেলা ?

আমরা বলিলাম, তারপর ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, তারপর, তার পরদিন খবর এল লাইন খুলেছে। কলকাতায় চ'লে এলাম।

আমরা বলিলাম, কিন্তু বাঘটার হ'ল কি ?

—কি আবার হবে। সাপের গু হয়ে গেল।

—দূর তা নয়, বাঘটা ওভাবে প্রাণ দিলে কেন ?

—দেয়, দেয়। স্থান-মাহাত্ম্যটা বোঝ। কোথায় বাস করত ভেবে দেখেছ ?

—সে তো বন-তুলসী।

—আরে বাবা বাঘও তো বন্যজন্তু। বন-তুলসীই তার রাম-তুলসী।

ধনেশ দস্তিদারের সিংহ শিকার

সন্ধ্যাব পরে বেড়াইয়া ফিরিয়া ছোটমামা ঘোষণা করিলেন, আজ একটি রত্ন আবিষ্কার করলাম।

রত্ন আবিষ্কার করা ছোটমামার হবি, প্রায়ই করিতেন। আমরা তাঁহাকে রত্নেশ্বব আখ্যা দিয়াছিলাম। বড়মামা প্রকাশ্যেই বলিতেন, আমরা আড়ালে।

বড়মামা বলিলেন, কি আবিষ্কার করলি রে, ও রত্তন? বিড়ি-রত্ন না বিড়িওলা-রত্ন?

ছোটমামা বলিলেন, কি ক'রে বুঝলে?

—তা নয় তো কি আর কোহিনুর কলিনন্ খুঁজে পাবি। তা বল, কি পেলি তা শুনি।

ছোটমামা বলিলেন। বাগবাজার অঞ্চলে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে, বড় রাস্তায় আসিয়া ট্রাম ধরিবেন, গলির মধ্যে নামিল বৃষ্টি। বেগতিক দেখিয়া একটা দোকানের চালার নীচে দাড়াইলেন। বৃষ্টি অনেকক্ষণ চলিল। দোকানীর ক্ষুদ্র ঘর, সমাদর করিয়া তাহারই মধ্যে তুলিয়া বসাইল। তাহার সঙ্গে কিছু আলাপ-পরিচয় হইল।

ভদ্রলোকের ছেলে। এককালে কোন্ অফিসে চাকরি করিতেন। তারপর কোন সম্ভ্রম-ঘটিত কারণে চাকরি ছাড়িয়া দেন, একেবারে উগাণ্ডায় চলিয়া যান। সেখানেও একই ব্যাপার, সাহেবের চোখে বাঙালীর সম্ভ্রমের প্রশ্ন। আবার ছাড়িয়া দিয়া, দীর্ঘদিন পরে দেশে ফিরিয়াছেন। সহায়-সম্বল নাই, অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইতেও অনিচ্ছুক, অতএব পান-বিড়ির দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন। একা মানুষ, যা পান তাহাতেই চলিয়া যায়। আর, ভাল না চলিলেই বা

কি—দাসত্বের কালিয়া-পোলাওয়ের চেয়ে স্বাধীন উপার্জনের শাক-ভাত ভাল, ইহাই তাঁহার অভিমত।

বড়মামা বলিলেন, নাম কি ভদ্রলোকের? জিজ্ঞেস করেছিস?

—ধনেশ্বর দস্তিদার।

—ধনেশ্বরই বটে। পকেটে না থাক ধন স্বভাবে আছে, কি বলিস? কিন্তু, দস্তিদার মানে? ঘোষ দস্তিদার, বরিশাল-গাভার?

—তা তো জিজ্ঞেস করি নি। খেয়াল হয় নি।

বড়মামা একটু ভাবিলেন, বলিলেন, না, ঘোষ দস্তিদার হ'লে তাই-ই বলত। চট্টগ্রামের দস্তিদার হ'তে পারে। তাদেরও তো বিরাট বংশ, তাদেরই কেউ হবে হয়ত।

আমি বলিলাম, কোথায় দোকানটা তাঁর?

ছোটমামা বলিলেন, তোর সে জেনে কি হবে?

—যাব। উগাণ্ডায় ছিলেন বলছ, নিশ্চয়ই শিকারী লোক। সিংহও মেরেছেন হয়ত।

বড়মামা বলিলেন, নাঃ, সত্যি ভাল ছাত্তর তুই। উগাণ্ডায় সিংহ থাকে তাও জানিস? বল্ তো আর কোথায় কোথায় থাকে সিংহ?

আমি বলিলাম, উগাণ্ডা, কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা। ইণ্ডিয়াতে এককালে খুব বড় জাতের সিংহ ছিল এখন নেই। এখন যা আছে সে মিনমিনে পেটরোগা। গুজরাটে, আছে রাজপুতানায়, আছে ইউপিতে বিহারে আছে। বাংলাদেশেও আছে কিছু কিছু।

—বাংলাদেশে, তার মানে?

—মানে, আছে। অবশ্য প্রতাপ সিংহ রাজসিংহ'র মত বড় নয়। তবু, আছে—রায়পুরে, পাইকপাড়ায়, বেলফুলিয়ায়—

—অ।

—তা থাক। কিন্তু সত্যি ছোটমামা, সে ভদ্রলোককে নিয়ে আসতেই হবে। গল্প শুনব।

—যাঃ, আসবেন কেন।

—কেন আসবেন না। বললেই আসবেন। শিকারী লোকরা গল্প শোনাতে ভালবাসে। আর না হয় তো বল আমরাই চলে যাব দল বেঁধে। তবে সেটা হচ্ছে দোকান, মানে বিজনেস্ আওয়ার্স্—

বড়মামা বলিলেন, বাঃ, তোরা শুনবি, আমরা বাদ? ডেকেই নিয়ে আয় একদিন।

ছোটমামা বলিলেন, বেশ, বলে দেখব।

পরদিন বিকালবেলায় ছোট মামা বলিতে গেলেন, এবং একেবারে সে লোককে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভাবিয়াছিলাম, খুব দর্শনীয় চেহারা হইবে। তাহার কিছুই না।

সাধারণ আকৃতি, মাঝারি গড়ন, একটু বা রোগার দিকে। গায়ের রং এককালে ফর্সা ছিল এখন তামাটে হইয়াছে, বোধ হয় উগাণ্ডার রৌদ্রে পুড়িয়া। চক্ষু দুটি বড় বড়, ভাসা ভাসা। কোন একদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকান না, কথা যখন বলিতে থাকেন তখনও চক্ষু দুইটি ইতস্তত চলিয়া বেড়ায়—নিশ্চয়ই শিকারের সময়ে সর্বদা চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখার অভ্যাস হইতে এমন হইয়াছে।

আমরা সমাদর করিয়া বসাইলাম, সরবৎ জল খাবার দিলাম, সকলে মিলিয়া ঘিরিয়া বসিলাম—গল্প বলুন।

ভদ্রলোক বড় লাজুক প্রকৃতির, কথা বলিতেই চান না। বড় বড় শিকারীদের বোধ হয় ঐ রকম হইয়া যায়—বনের মধ্যে নিঃশব্দে চলা ফেরা করিতে করিতে। যত বলি বলুন, ততই বলেন, কি বলব।

আমরা ছাড়িবার পাত্র নই। পাইয়াছি যখন, সিংহ শিকারের গল্প শুনিবই। বলিলাম, সিংহ শিকারের গল্প। আপনি উগাণ্ডায় ছিলেন তো, নিশ্চয়ই সিংহ দেখেছেন। নিজেও মেরেছেন?

—সিংহ? আমি? তা, মানে—

—বলুন না, মেরেছেন?

—তা, অবশ্য—

—বলুন।

ধনেশ্বরবাবু মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আর ভয় নাই নিশ্চয়ই সিংহ শিকারের গল্প মনে করিয়া লইতেছেন, এখনই বলা শুরু করিবেন—লাফ দিবার পূর্বে বাঘ সিংহ যেমন আড়ি পাতিয়া লয়।

এইবার বলিবেন মনে হইতেছে, এমন সময়ে বড়মামার মেজ ছেলে শিবু গোল বাধাইয়া দিল। সে অত্যন্ত চঞ্চল, কোন অবস্থাতেই ধৈর্য ধরিতে পারে না। ধনেশ্বরবাবু মুখ তুলিলেন, সকলের দিকে একবার করিয়া তাকাইয়া লইলেন। বুঝিলাম, গল্প শুরু হইতেছে।

কিন্তু শিবুর দিকে তাকাইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, আপনি কান্তি বাবুকে চেনেন?

আমরা হুস্‌হাস্‌ করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিতে গেলাম, কিন্তু তাহার আগেই ধনেশ্বরবাবু কথাটা শুনিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইলেন, বলিলেন, কান্তিবাবু কে?

তখন আর থামানো যায় না। শিবু বলিল, কেন, প্রসিদ্ধ শিকারী কান্তি চৌধুরী?

বৃথা চেষ্টা। তবুও আমি বলিলাম, থাম্‌ না। শুনছিস উনি ছিলেন উগাণ্ডায়, আর কান্তি চৌধুরী তো ইণ্ডিয়ার। উনি চিনবেন কি করে?

ধনেশ্বরবাবু অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, একটা হাত ঈষৎ তুলিয়া বলিলেন, দাঁড়াও দাঁড়াও।

তারপর বলিলেন, আমাকে চেনে বলেছে?

—তা জানি নে। তিনিও বড় শিকারী। তাঁর গল্প অনেক শুনেছি কিনা।

—উগাণ্ডাতে?

—না। এই দেশেই। সোঁদরবনে, ব্যাঙ্গালোরে, আসামে—

—থাম তো। কি রকম চেহারাটা? দেখেছ তাকে?

—হ্যাঁ, কতবার। খুব গ্র্যাণ্ড দেখতে। লম্বা-চওড়া, ফর্সা, মস্তবড় নাক—এমন জোয়ান, দেখলে বাঙালী বলেই মনে হয় না।

—বটে। টাক আছে, মাথাজোড়া পেল্লায় টাক—আর কানের ওপরদিকে ছোট ছোট ফুটো?

—ফুটো দেখিনি। টাক আছে, ভীষণ চকচকে টাক।

—তাই বল।

—চেনেন?

—মনে তো হচ্ছে। কিন্তু সে কান্তি চৌধুরী হ'ল কবে?

—কেন? কান্তি চৌধুরী নাম নয় তার?

—হতেও পারে। অনেককাল দেখা নেই, এখন তার নাম কি হয়েছে কে জানে। তবে আমি যখন চিনতাম তখন নামটা একটু অন্যরকম ছিল।

—কি ছিল?

—সিং। কান্ত সিং।

—সেকি!

বড়মামা বলিলেন, ওরে, এও যে সিংহ রে।

আমরা বলিলাম, তবে কেন বলেন চৌধুরী?

—তা, আমরা অনেক সময়ে চৌধ্‌রী বলেও ডাকতাম তাকে।

—তাহ'লে খুব চিনতেন বলুন।

—তা, হ্যাঁ, বলতেও পার।

—কি ক'রে চিনতেন? একসঙ্গে শিকার করতে গিয়ে নিশ্চয়ই? বলুন না—আমরা একসঙ্গে কোলাহল করিয়া উঠিলাম।

ধনেশ্বরবাবু নিঃশব্দে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। আমরা একটু থামিলে বলিলেন, সত্যি শুনতে চাও কান্তি চৌধুরীর কথা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ধনেশ্বরবাবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। বড়মামার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি জানেন, একটা লোকের আড়ালে তার সম্বন্ধে আলোচনা করা—

শিবু বলিল, বাঃ! তাহ'লে তো ইতিহাস পড়াই যায় না মোটে।

আলেকজাণ্ডার, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, কাউকেই তো দেখি নি।

আমি বলিলাম, ওরে সেইজন্যেই ইতিহাসের বইয়ে ছবি দিয়ে দেয়; সেই ছবি দেখে দেখে তাদের কথা পড়তে হয়।

বড়মামা বলিলেন, তা, তেমন খারাপ আলোচনা যদি হয় না-হয় নাই বললেন।

ধনেশ্বরবাবু বলিলেন, না, খারাপ আর এমন কি। বেশ, বলছি, কিছু না হয় বাদসাদ দিয়েই বলব।

শিবু বলিল, আর, সিংহ শিকারের গল্প?

—একদিনে সব হয় কি ক'রে? সে নাহয় আরেকদিন তখন হবে।

—আবার আসবেন?

—তা আসব না-হয়। এবার শোন। কান্তি চৌধুরী বললে তো তাকে? আসলে লোকটা কান্তিও নয়, চৌধুরীও নয়—বাঙালীই নয় আদপে। যাক, এক-এক ক'রে বলছি শোন।

অনেকদিন আগের কথা। তখন আমার অতি অল্প বয়স। এক সায়েবি ফার্ম, কাঠের কারবার, তাইতে চাকরি করতাম। মস্তবড় ফার্ম, বিলেতে হেড অফিস, আদ্ধেক ইণ্ডিয়া আর বার্মা জুড়ে কারবার। বড় সায়েব ছিলেন অ্যাটকিনসন, আমি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। আমাকে বড় ভালবাসত সায়েব। সায়েব লোক, ব্যবসা খুব ভাল বোঝে, কিন্তু লেখাপড়ায় ঢুঁঢুঁ। আমরা ভাবি সায়েব হ'লেই ভাল ইংরিজি জানবে, তা কিন্তু নয়। অ্যাটকিনসন সায়েব ইংরিজি বলত যাহোক একরকম, লিখতে গেলেই কলম ভেঙে একাকার। চিঠিপত্র রিপোর্ট যা কিছু সব, আমাকেই লিখতে হ'ত। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে—ইংরিজি লেখাটা আমার আসতও ভাল, তাছাড়া ফার্মের কাগজপত্রে শুদ্ধ হিসেব ভুল হিসেব দু'রকমই লিখতে হয়। সায়েবরা আর যাই বল, গুণের কদর বোঝে। আমারও তাই বিশেষ খাতির ছিল সায়েবের কাছে। অনেকের অবশ্য চোখ টাটাত তাতে—বাঙালীর মত হিংসুটে জাত নেই। তা টাটায়, আমার কি করবার আছে বল।

একবার, সায়েব লঞ্চে ক'রে টুরে বেরিয়েছে। দেশের সর্বত্র বড় বড় বন ইজারা নেওয়া আছে, নিজের চোখে না দেখে বেড়ালে চলে না। আমায় তো সঙ্গে থাকতেই হবে। ডায়মণ্ডহারবার হ'য়ে কাকদ্বীপের দিকে যাব। খুব ভোরে লঞ্চ ছেড়েছে। মেটেবুরুজ ছাড়িয়ে গেছি। নদী শান্ত, মাত্র রোদ উঠছে। সারেং লঞ্চ চালাচ্ছে। সায়েব আর আমি কেবিনে ব'সে।

হঠাৎ লঞ্চ থেমে গেল। সারেঙের জায়গা থেকে কেবিন অবধি চোঙা থাকে, সায়েব চোঙায় মুখ দিয়ে বললে, কি হ'ল ?

সারেং বললে, লাস।

—কই দেখি !

বেরিয়ে এলাম। ভাগ্যিস সারেং দেখে ফেলেছিল, নইলে তলায়ই পড়ত। লঞ্চের সামনে, একটুখানি পাশের দিকে একটি দেহ, আধ-ডোবা অবস্থায় চিৎ হ'য়ে ভাসছে। বিরাট চেহারা, বোঝা যায় হিন্দুস্থানী। সায়েব বললে, তোল।

বোট খুলে লাসকে লঞ্চে তোলা হ'ল। তখন দেখি, প্রাণ আছে। সায়েবই ডাক্তারি জানত কিছু কিছু, ক্রমে তার জ্ঞান হ'ল, সুস্থ হ'ল, তার কাহিনী শোনা গেল। নাম কান্ত সিং, ভাগলপুর জেলায় বাড়ি। গাঁয়ের নাম বলেছিল, মনে নেই।

নৌকোমাঝি। সেকালে বিহারী মাঝিরা বড় বড় নৌকো নিয়ে ভাড়া খাটতে আসত। সে বিরাট নৌকো, হাজার মণ পাঁচহাজার মণ মাল নেয়, কলকাতা থেকে বরিশাল নোয়াখালি ডিব্রুগড় অবধি চ'লে যায়। এখন আর সেসব নৌকো দেখতে পাইনে। সে নৌকোকে ঠেলে নাড়ানো যেত না, স্রোতের জোরে আর পালের জোরে টিপটিপ ক'রে চলত, ছইয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বিশ-ত্রিশ জোয়ান বিশ-ত্রিশখানা দাঁড় মেরে এক-আধটুকু এগিয়ে নিত।

এক-একটা নৌকোতে লোক থাকত ত্রিশ-চল্লিশ জন। হয়ত এক গাঁয়ের, হয়ত পাশাপাশি গাঁয়ের। আসত, নৌকো চালাত, দু'বছর

পাঁচ বছরে একবার বাড়ি যেত। সব ভাল, কিন্তু একটি ব্যাধি ছিল তাদের। কেউ ম'রে গেলে, কে হাঙ্গামা ক'রে পোড়াতে যায়, টান মেরে জলে ফেলে দিত। মরবার তরও সইত না অনেক সময়; যদি মনে হ'ল মিথ্যে ঝামেলা, বাঁচবার আশা নেই, হয়ত জ্যান্তটাকেই দিত চার হাত-পা ধরে নদীতে ফেলে। মিটে গেল ঝামেলা, কেই বা জানছে। তারপর, দেশে যখন গেল, খুব হাউমাউ ক'রে কেঁদে-কেটে বলে দিলে, আহা কত করলাম কত ডাক্তার-বদ্যি, কিচ্ছুতে ধ'রে রাখা গেল না। বিশেষ ক'রে কলেরা-টলেরা হ'লে আর ফেলতে বিলম্ব নয়।

এরও তাই। হয়েছিল প্রচণ্ড জ্বর, বেহুঁস অবস্থা দেখে দিয়েছে জলে ফেলে। ভাগ্যিস আমাদের চোখে পড়েছিল।

কোন্ নৌকো কখন ফেলেছে সে খোঁজ করা বৃথা। তাকে লঞ্চে নিয়েই আমরা টুর সারতে চলে গেলাম। কলকাতায় ফিরে এলাম প্রায় মাসখানেক পরে। তখনও সে সঙ্গেই রয়েছে।

কলকাতায় এসে সায়েব বললে, তোমার সে নৌকোর মাঝির নাম নম্বর বল, আমি পুলিশকে দিয়ে খোঁজ করাব।

সে বললে, খোঁজ ক'রে কি হবে।

সায়েব বললে, তাহ'লে দেশেই ফিরে চলে যাও। টাকা দিচ্ছি।

সে বললে, কি হবে গিয়ে। অ্যাদ্দিনে তারা খবর দিয়ে দিয়েছে আমি বেঁচে নেই। দেশে থাকবার মধ্যে আছে বড়ভাই, সে এতদিনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমার জমিটুকু দখল ক'রে নিয়েছে। এখন গিয়ে মিথ্যে দাঙ্গা বাধানো।

সায়েব বললে, কি করবে তাহলে?

সে বললে, কিছুই করব না। আমি তো মরেই গিয়েছি, তুমি বাঁচালে। আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিও না, আমি তোমার কাছেই থাকব।

সায়েব তাকে অফিসের দরোয়ান করে নিলে।

নাম তার কান্ত সিং। ঐরকম নৌকোর মাঝিমাল্লাদের অনেকে চৌধুরী ব'লে ডেকে থাকে, যেমন ডাকে কলকাতায় মোষের গাড়ির

গাড়োয়ানদের ; তাই অফিসের কেউ কেউ তাকে চৌধুরী বলে ডাকত। সেই নামকেই বদলে সে কান্তি চৌধুরী বানিয়ে নিয়েছে বুঝতে পারছি।

কান্ত সিং, বা কান্ত চৌধুরী যাই বলুন, র'য়ে গেল। নামে দরোয়ান, কাজে বড় সায়েবের বডিগার্ড।

হ্যাঁ, একথা বলব, সায়েবের ওপরে যে টান আর নিষ্ঠা দেখালে, সে দেখবার বস্তু। সায়েবের ডাকে একপায়ে খাড়া, তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এক কথায়। কিন্তু তেমনই আবার, অন্য কারু কথাও কানে নেবে না কারু মান রেখেও কথা বলবে না। ফলে অফিসের অনেকে ক্রমশ তার ওপরে চটে যেতে লাগল। আবার, সবাই চটা জেনেই হয়ত, বড়সায়েব তাকে বেশী বেশী আদর দিতে লাগল।

দোষে গুণে লোকটা ছিল অদ্ভুত। হিন্দুস্থানীর জাত, লম্বা-চওড়া গড়ন, ফর্সা রং, মাথাভরা টাক ব'লে প্রচণ্ড পাগড়ি, জাঁকালো দাড়ি আর গোঁপ—দশাসই পুরুষ। উর্দি এঁটে বন্দুক-কিরীচ বেঁধে কার্টিজের মালা ঝুলিয়ে যখন টান হ'য়ে দাঁড়াত, যেন যাত্রাগানের আস্ত রাজাটা নেমে এল। বুদ্ধিও রাখত। লেখাপড়া বিশেষ জানে না, অথচ এমন চোস্ত বাংলা বলতে শিখল, কে বলবে তার সাতপুরু কলকাতার বাসিন্দা বাঙালী নয়। শুনে শুনে ইংরেজিও বলতে শিখল কিছু—তার ভাষার দৌড় থাক না থাক, উচ্চারণে ঢঙে-ঢাঙে একেবারে নিখুঁত। বুদ্ধি রাখত, ভাল বুদ্ধিও, ফিচেলী বুদ্ধিও। কিন্তু রাখলে কি হবে, ভাল বুদ্ধিটাকে কাজে লাগাত শুধু বড় সায়েবের কাজ করবার জন্যে, সে বেলায় তার ত্রুটি নেই। অন্য কাজের বেলায় সে বুদ্ধি তার শিকেয় উঠে যায়। আর এক গুণ, গুল্প-গল্পের রাজা। আরে ব্বাপ রে বাপ, গুল ঝাড়তে বসল তো বসল, অসংখ্য রাজা আর উজীর লাইন ক'রে ঝড়াঝ্‌ঝড় প'ড়ে প'ড়ে ম'রে যেতে লাগল। তবু হ্যাঁ, ক্ষমতা ছিল—বলতে জানত। এনতার গুল চালাচ্ছে, সবাই বুঝতে পারছি তার এক বর্ণও সত্যি নয় সম্ভব নয়, তবু কিন্তু চুপ করে শুনে যাচ্ছি—গল্প

শুনে হোক না হোক তার বলবার বাহার দেখে। আর সে গল্পই কতরকম—না দেখেছে হেন দেশ নেই না জানে হেন বস্তু নেই।

চলল। কেটে গেল বছর চারেক। তার পরের কথা বলি।

বার্মার এক জঙ্গল এলাকা ইজারা নেবার কথা হচ্ছে। নিলাম ডেকে তার কাগজপত্তর বুঝে নিতে হবে, মাপ-চৌহদ্দি ঠিক করে নিয়ে দখল গেড়ে আসতে হবে। বিদেশ, তায় বিরাট এলাকা, অনেক টাকার অনেক দায়িত্বের ব্যাপার। বড়সায়েব নিজেই যাবেন। যাবার সব ঠিকঠাক, সেখানে চিঠি দিয়ে তারিখ-টারিখ স্থির হ'য়ে গেছে, সায়েবের মেয়ে অসুখে পড়ল। বাড়াবাড়ি অসুখ, ক'দিন নেবে ডাক্তার বলতে পারছে না। সে মেয়েও বাপের অতি ন্যাওটা, বাপ চোখের আড়াল হ'লে মেয়ে হেদিয়ে যাবে। ডাক্তার বললে, সায়েবের যাওয়া চলবে না।

বিষম বিপদ। সায়েব বললেন, দস্তিদার আমি তো যেতে পারছি নে, তুমিই চলে যাও। গিয়ে যতটা পার কাজকর্ম এগিয়ে রাখ, আমি এদিককার একটু সুবাহা হলেই চ'লে আসব।

'না' বলা যায় না। তায় নতুন দেশ দেখবারও ইচ্ছে নেই এমন নয়। বললাম, বেশ, বল তো যাব। কিন্তু তুমি গেলে যা হ'ত আমি কি সেরকম পেরে উঠব ?

সায়েব বললে, সেটুকু বিশ্বাস তোমার ওপরে না থাকলে কি আর পাঠাচ্ছি। চ'লে যাও, কিছু চিন্তা কোরো না।

স্থির হ'ল আমিই যাব, আমার সঙ্গে দরোয়ান কেরানী ঠাকুর-চাকর যাবে। আর, বনবাদাড়ে কাজ, যদিই বিপদ-আপদ হয়, ব'লে সায়েব বললে, বডিগার্ডও যাবে একজন আমার সঙ্গে। বডিগার্ড মানে, কাস্তু সিং। লোকটাকে আমার পছন্দ নয়। অথচ সায়েব নিজে বলছেন, 'না' বলতে পারি নে। বললাম, বেশ, তাই চলুক।

রেঙ্গুনে নেমে নিলেম ডেকে নিলাম। তারপর কাগজপত্র বুঝে

নিয়ে জায়গা দখল নিতে চললাম। বার্মা রেলওয়ের শেষ স্টেশন মিচিনা—সেখান থেকে আরও অনেকটা যেতে হয়, পাহাড় বন ভেঙে পথ। ফরেস্টার সায়েব একজন থাকে, সে-ই অভ্যর্থনা ক'রে নিলে। পাশেই একটা বাংলো মতন। অফিসার-টার এলে থাকে। সেইটে খুলে দিলে।

সারাদিন বনে বনে ঘুরি জরিপ ক'রে ক'রে খোঁটা মারি, রাত জেগে রিপোর্ট লিখে পাঠাই। কাজ বেশ এগোচ্ছে। এদিকে প্রতি ডাকেই সায়েবের চিঠি পাচ্ছি—মেয়ে এখনও সুস্থ হয়নি, একটু কমলেই চলে আসছি, চিন্তা কোরো না। ফরেস্টার সায়েবটি ভাল লোক, আমারই বয়সী। ফুরসৎ পেলেই এসে বসে, গল্পগুজব জমায়। একা একা বনপুরীতে পড়ে আছে, সঙ্গীসাথী পায় না তো। আমাকে পেয়ে তাই তার ফুর্তির শেষ নেই।

প্রথম থেকেই কিন্তু একটা বিপদ দেখা দিলে। যেদিন গিয়ে পৌঁছেছি, তার পরদিন সকালবেলার কথা।

বন দেখতে বেরোব; তার আগে বাংলোর বারান্দায় ব'সে ফরেস্টার সায়েব আর আমি, কাগজপত্র দেখছি। এর মধ্যে ছুটো মেয়ে এসে বাংলোয় ঢুকল। সেই দেশী মেয়ে, ঘাঘরা-কাঁচুলি পরা। বললে, সায়েব কিছু খেতে দাও। আমি পয়সা বার করছি, সায়েব হাত চেপে ধরলে। বললে, এমন কাজও কোরো না। বলে ধমকে তাদের তাড়িয়ে দিলে।

আমি বললাম, গরীব মানুষ, দুটো পয়সা দিতাম। তাড়িয়ে দিলে কেন?

সায়েব বললে, এরা কে, জান?

—কে?

—এরা হচ্ছে যাযাবর বেদে। ভিক্ষে ক'রে বা ফিরিওয়ালা সেজে বেড়ায়, আসলে এদের ব্যবসা হচ্ছে চুরি-ডাকাতি। ভিক্ষে চাইতে এল, সেই তাকে দেখে নিলে কোথায় কি আছে। পয়সা আছে

জানলে রাত্রে এসে খুন ক'রে যাবে তোমাকে। এদের কক্ষণো প্রশ্রয় দেবে না, বাংলোর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবে না।

আমি সেইদিনই দরোয়ান চাকর সবাইকে বারণ ক'রে দিলাম, এদের কোনক্রমেই বাংলোতে ঢুকতে না দেয়, বাইরেও এদের সঙ্গে কথাবার্তা না বলে।

কিন্তু দু'দিন না যেতেই চুরি শুরু হ'ল। আজ ক্ষুরের ব্লেড নেই, কাল সাবানখানা উধাও, তার পরদিন পকেটের ছুরিটা নিরুদ্দেশ। যায় কোথায়? সায়েব বললে, বেদেদের কাজ। টুকিটাকির ওপর প্রচণ্ড লোভ এদের।

কিন্তু, তারা নেয় কখন? বাংলোয় ঢুকছে কি ক'রে? একদিন আমার সোনার বোতামটাই চ'লে গেল। সায়েব বললে, ও হ'য়ে গেছে, বেদেলোকে প্রয়াণ করেছে।

আমি বললাম, চাপ দিয়ে বার করা যায় না?

সায়েব বললে, অসম্ভব। এদের হাতে মাল গেলে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণুর সাধ্যি নেই খুঁজে বার করেন। আর, করবেই বা কে? এদের সার্চ বা অ্যারেস্ট করতে পাবে, একমাত্র পুলিশ। তারা থাকে বহু দূরে, শহরে। আমি এক পারি জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিতে। তাও, যদি গাছ কাটে বা হরিণ মারে, তবেই। তা যতক্ষণ না করছে কিচ্ছুটি করবার জো নেই।

বেশ, চলুক। আমি আর কি করব বলুন—সারাদিন থাকি বাইরে বাইরে, ঘর থাকে চাকর-বাকরের জিম্মায়। আমার আড়ালে তারা কে কি করছে, কি ক'রে লক্ষ্য রাখব। যাকগে, সেধে বিপদ ডেকে আনে যদি, নিজেরাই মরবে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল, গেটের বাইরে দু'টো বেদে মেয়ে দাঁড়িয়ে, কান্ত সিং তাদের সঙ্গে কি কথা বলছে, যেন খুব গোপন কথা।

আমাকে দেখেই মেয়েদুটো সট্ ক'রে স'রে পড়ল। কান্ত সিংকে

ডেকে বললাম, কি কথা বলছিলে, ওদের সঙ্গে?

বললে, তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

বললাম, তাড়িয়ে দিচ্ছিলে তো অতক্ষণ ধ'রে কথা কিসের? আর অমন ফিসফিসিয়ে?

সে হঠাৎ রুখে উঠল, বললে, আমার মরজি আমি কথা কয়েছি।

আমার অসহ্য বোধ হ'ল। বললাম, মুখ সামলে কথা বলবে তুমি।

সেও সমান তেজে জবাব দিলে, মুখ সামলাবেন আপনি। আমার মালিক আপনি নন।

তাকে হয়ত মেবেই বসতাম সেদিন। রেগে গেলে আমার জ্ঞান থাকে না, আব বেয়াদবি সহ্য করাও আমার কোষ্ঠিতে নেই। চড় একটা প্রায় তুলেছি হাতে, ঠেকিয়ে দিলে ফরেস্টার সায়েব। হঠাৎ পেছন থেকে এসে ডাকলে, কি হচ্ছে?

যাই হোক নিজেদের মধ্যেব ব্যাপার, সে হাজার হোক বিদেশী সায়েব, তায় অন্য অফিসের। তার সামনে আর কেলেঙ্কারিটি করলাম না। কান্তুকে বললাম, আচ্ছা, যাও, পরে হবে।

সে গরগর করতে করতে চলে গেল।

সন্ধ্যার পরে, কাগজপত্র নিয়ে একা বসেছি, দরোয়ান অযোধ্যা সিং এল। বললে, সায়েব, এতদিন কথা কইনি, এবার বলতে হ'ল। কান্তু সিং-এর হালচাল ভাল নয়।

বললাম, কি হয়েছে?

—আজই দেখলেন তো। ঐ বেদেগুলোর সঙ্গে এসে অবধি ভাব জমাচ্ছে। আপনার বোতাম কোথা গেল? ওরাই নিয়েছে।

—বাংলোয় ঢুকল কি ক'রে?

—ঢুকতে হবে কেন। বাংলোর ভেতরে কি লোক নেই?

—তুমি প্রমাণ করতে পারবে?

—প্রমাণ কি ক'রে করব বলুন। আমি থাকি গেটে ব'সে। ও থাকে যেখানে খুশি, যখন ইচ্ছে ঘরের ভেতরে আসছে যাচ্ছে। বড় সায়েবের পুষ্যিপুত্তুর, কাউকে গ্রাহ্যি করে না। আপনি এখানে মালিক, আপনাকেই কিরকম শুনিয়ে দিলে। আমি কথা বলব কোন্ সাহসে, বলুন?

—তবে আজ বলছ কেন?

—আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করল, দেখে সহ্য হ'ল না। মেরেই হয়ত বসতাম তাকে, ফরেস্ট সায়েব এসে পড়ল বলে চেপে গেলাম।

—আমিও তো তাই। কিন্তু ব্যাপারটা কি, খুলে বল তো! ঐ মেয়েগুলোর সঙ্গে ওর ভাব হ'ল কি ক'রে? খারাপ কিছু, বলছ?

—না, তা নয়। সে দোষ নেই, ঝুট্ কেন বলব।

—তবে?

—কান্ত সিং নেশাখোর, ভীষণ গাঁজা খায়। জাহাজে কাস্টম ছিল, নিয়ে আসতে পারে নি। এখানে বনের মধ্যে মাল পাচ্ছে না। বলতেও পারছে না আপনাকে। তাই ওদের সঙ্গে ঘর করেছে। ওরা গাঁজা দেয়, ও তার দাম মেটায় ঘরের জিনিসপত্র দিয়ে। অত পয়সা কোথা পাবে?

—ব্লেড?

—শুধু ব্লেড কেন। বোতামও তো আছে। বেদেরা বুনো, টুকিটাকি জিনিসের ওপরে ভারি লোভ ওদের!

—তা, জান তো মেরে তাড়িয়ে দাওনি কেন?

—একজন তো নয়। বনের মধ্যে তাঁবু ফেলেছে, ষাট-সত্তর জন। জোয়ান পুরুষ আছে অনেক, বাঘা-বাঘা কুকুর আছে। তাদের ঘাঁটাতে যাওয়া সোজা কথা নয়।

—ভাল কথা।

—বোতাম বলেই নয়। টাকার ব্যাগ গুণে দেখেছেন?

—না তো!

—দেখবেন।

সেদিন থেকে আমি নজর রাখলাম। ব্যাগের টাকা গুণে নিয়ে ব্যাগ টেবিলে দেরাজে ফেলে রেখে দিই; যেমন আগে রাখতাম। পরে যখন গুণে দেখি, দেখি সত্যি কিছু কমেছে। বুদ্ধিমানের চুরি, একবারে বেশী নেয় না, যেন ধরা না পড়ে—হ'ল কিছু রেজকী, হ'ল একটা দুটো টাকা—এমনিভাবে যাচ্ছে।

কয়েকদিন দেখে দেখে, তারপর আর সন্দেহ রইল না। কান্ত সিং-এরও দেখি, মেজাজ দিন দিনই কড়া হয়ে যাচ্ছে। দুই চোখ লাল হয়েই থাকে, চোখ উর্ধ্বমুখী, কথায় কথায় দরোয়ান কেরানী চাকর ঠাকুরের সঙ্গে লেগে যায়।

মহা চিন্তা। অথচ, বলি কাকে? দরোয়ান অযোধ্যা সিং হাজার হোক দরোয়ান, তার সঙ্গে বেশী ফিসফিস করা যায় না, থাকার মধ্যে, আছে ফরেস্টার সায়েব। শেষে আর উপায় না পেয়ে তাকেই বললাম।

সে শুনে বললে, খুবই সম্ভব।

বললাম, বনের মধ্যে, ওরাই বা পায় কোথায়?

সায়েব বললে, আবগারীর মাল নয়। বনের মধ্যে বুনো ভাঙ বুনো গাঁজার অভাব নেই। বেদেরা তার চোরাই কারবারী। বন থেকে ভেঙে আনছে, দাম বাবদে যা পেলে তাই লাভ। আর, এ মালও একেবারে 'র', অত্যন্ত কড়া, আবগারীর মাল এর কাছে লাগে না।

—কিন্তু তাহলে, এখন উপায়?

সায়েব বললে, ভাববার কথা। এই কড়া মাল, তায় অফুরন্ত পাচ্ছে আর অফুরন্ত খাচ্ছে, এতে মাথা খারাপ হ'য়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অথচ, যা বললে তা শুনে তো মনে হয় একে কন্ট্রোল করার সাধ্যি তোমার হবে না।

বললাম, তা হবে না, কারণ ও জানে ওকে কন্ট্রোল করবার

এক্তিয়ার আমার নেই। মনিবের পুষ্যিপুত্তুর হলে যা হয়। কিন্তু, এখন আমি কি করব একটা বুদ্ধি বাৎলাও।

সায়েব বললে, করবার মধ্যে তো আছে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেখানে বেদেও নেই বুনো ভাঙও নেই। কিন্তু সে তো এখনই হচ্ছে না।

—না। এখানকার কাজ না সেরে আমি যেতে পারছি নে। বড় সায়েব কবে আসতে পারবেন সে বিধাতাই জানেন। অথচ, এভাবে চলতে থাকলে ও কখন কি কাণ্ড ঘটিয়ে বসে তার ঠিক কি। হয়ত দেখব ওকে হাত ক'রে নিয়ে তারা বাংলোতে হানা দিয়ে বসেছে।

সায়েব বললে, আমারও ঠিক সেই ভয়। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ওকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া এবং এমন ছুতো করে, যাতে আসল কথাটা বুঝতে না পারে। এখন কথা হচ্ছে, সেই ছুতোটা কি হতে পারে। আচ্ছা, ওর বৌ-ছেলে কোথায়? ধর হঠাৎ একটা চিঠি এল তাদের কেউ অসুস্থ—

—তবেই হয়েছে! বৌ-ছেলেপুলে পুড়িয়ে খেতেও কিছু নেই। অন্তত ও নিজে যতদূর বলে। ঠিক আছে, আমিই ভেবে দেখব কি কি ফন্দী করা যায়।

অনেক ভেবে, শেষটা অযোধ্যা সিং দরোয়ানের সঙ্গেই আবার পরামর্শ করলাম। লোকটি ভাল, রাজি হ'য়ে গেল।

দু'একদিন তাকে তাকে থেকে, যখন ঠিক দেখা গেল কান্ত সিং নেশায় টং হ'য়ে আছে, দরোয়ান তার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধালে। এক কথা থেকে পাঁচ কথা, কান্ত সিং-এর মেজাজ চড়ে যাচ্ছে, দরোয়ান তাকে খুঁচিয়ে আরও রাগিয়ে দিচ্ছে। বেশীক্ষণ দিতে হ'ল না, কান্ত সিং পাগলা হ'য়ে দরোয়ানকে আক্রমণ করলে, তাকে বেদম মার মারলে।

আমি, ফরেস্টার সায়েব ওৎ পেতেই ছিলাম, হৈ হৈ করে গিয়ে পড়লাম। অনেক কষ্টে তাদের ছাড়িয়ে দিলাম। খুব চোখ রাঙিয়ে

বললাম, এসব কী ব্যাপার ?

কান্ত সিং পাল্টা চোখ রাঙিয়ে বললে, আপনি আমার মালিক নন।

ফরেস্টার সায়েব বললে, কি অসম্ভব বেয়াদব! একে আপনি সরিয়ে দিন, এ প্রকৃতির লোককে আমি আমার এলাকায় থাকতে দেব না।

আমি বললাম, শুনলে ? তোমাকে আমার দরকার নেই। তুমি কালই কলকাতায় ফিরে যাবে।

কান্ত সিং চোখ আরও লাল ক'রে বললে, ঠিক আছে, আমিও আপনার কাছে থাকব না। কালই চ'লে যাব কলকাতায়।

পরদিন তাকে বিদায় ক'রে দিলাম। ফরেস্টার সায়েবের এক চাপরাশী সঙ্গে গেল, একেবারে জাহাজে তুলে দিয়ে ফিরে এল, যেন যাবার পথে কোন বজ্জাতি না করতে পারে।

অ্যাটকিনসন সায়েবকে আমি চিঠি লিখে দিলাম, বিশেষ কারণে কান্ত সিংকে আমি ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি; সমস্ত ডিটেইলস দেখা হ'লে বলব।

এর বেশী লেখা দরকার হবে বলে আশা করি নি। কিন্তু আশ্চর্য, ফেরত ডাকে সায়েবের চিঠি এল: কান্ত সিং-এর মুখে সব কথা শুনলাম। তোমার কাছ থেকে এরকম ডিজগ্রেসফুল আচরণ আশা করি নি। তুমি এই চিঠি পেয়েই কলকাতায় চ'লে আসবে এবং তোমার কাজের কৈফিয়ৎ দেবে। অবশ্য যদি দেবার মত কৈফিয়ৎ কিছু থাকে।

সেইদিন বুঝলাম, সায়েবেরও মতিভ্রম হয়। এতদিন ধ'রে এতখানি ক'রে আমাকে চিনেছে সায়েব, একটা গেঁজেল চাকরের মুখে চুকলি শুনেই সেই আমার প্রতি এইরকম ব্যবহার ? আমার পিত্তি চড়ে গেল। সেইদিনই রেজিগনেশন লিখে ডাকে ছেড়ে দিলাম, কাগজপত্র সব কেরানীর জিম্মা করে দিয়ে সে ডাকবাংলো ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ফরেস্টার সায়েব অনেক ক'রে বললে, তুমি নিদেন আমার গেস্ট হ'য়ে থেকে যাও আর ক'টা দিন।

আমি বললাম, না। এবার অ্যাটকিনসন নিজে এসে হাজির হবে। তার সঙ্গে দেখা হোক আমি চাইনে। এসে নিশ্চয়ই আমাকে হাতে ধ'রে অনুরোধ করবে চাকরি না ছাড়ি, কিন্তু আমি সে অনুরোধ রাখতে পারব না। এক্ষেত্রে দেখা না হওয়াই ভাল।

সে কথা ফরেস্টার সায়েবও মেনে নিলে। বললে, দেখ দস্তিদার, সেও সায়েব আমিও সায়েব—আমরা জাতভাই, তুমিই বরং অন্য-লোক। তবু একথা বলব, তুমিই ঠিক করেছ। তোমার অ্যাটকিনসন সায়েব যদি সত্যি আসে, তাকেও একথা আমি স্পষ্ট শুনিয়ে দেব, রেয়াৎ করব না।

তারপর বললে, তুমি এখন কোথায় যাবে, কি করবে?

আমি বললাম, কোথায় যাব জানি নে। একটা পেট, যা ক'রে হোক চলে যাবেই। করব কি তাই বা বলি কি ক'রে। তবে এটা স্থির, চাকরি আর করব না।

সায়েব আর কিছু বললে না। ঘণ্টাখানেক পরে, আমি তখন বাক্স গোছাচ্ছি, হঠাৎ চলে এল। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড দস্তিদার, তুমি ইস্ট আফ্রিকায় যাবে?

আমি বললাম, আমার সব সমান। যেতে আপত্তি নেই কিছু। কিন্তু আফ্রিকা মানে, কোথায়?

বললে, উগাণ্ডায়। আমার এক কাজিন থাকে সেখানে। রেল লাইন বসানো হচ্ছে. তার ইঞ্জিনীয়ার। তাদের লোক দরকার, আমাকে লিখেছিল। তোমার মত লোক পেলে সে লুফে নেবে।

—মানে, চাকরি তো?

বললে, না না। ব্যবসা। রেলের লাইন বসছে; তার গায়ে গায়ে স্টেশনে স্টেশনে স্টল দিতে হবে, লোকালয় গড়ে তুলতে হবে। তুমি খাঁটি লোক, খাটিয়ে লোক, তুমি ঠিক পারবে, তোমাকে আমি

চিনে নিয়েছি। যাবে, বল! তো আমি তাকে চিঠি লিখে দিই।

লোভ হ'ল। বললাম, কিন্তু স্টল দেব যে, টাকা কোথায়?

সায়েব বললে, টাকা দেবে রেল কোম্পানি। তারাই টাকা দিয়ে স্টল খাড়া করে দেবে, তুমি সেটা চালাবে। কমিশন পাবে, তাই থেকে কেটে কেটে দাম শোধ ক'রে দেওয়া হবে। তারপরে স্টল তোমার। দেখ ভেবে।

ভাববার বিশেষ কিছু ছিল না। বার্মা থেকেই সোজা জাহাজ ধরলাম। গিয়ে পৌঁছবার মত টাকা হাতেই ছিল কোনক্রমে, তবু যদি দরকার হয়—বলে পাঁচশ টাকা সায়েব নিজে থেকে আমাকে দিয়ে দিলে। আমি অবশ্য সে টাকা দু'তিন মাসেই তাকে শুধে দিলাম।

এই হ'ল আমার উগাণ্ডা যাবার কাহিনী। তারপর সেখানে অনেক বছর কাটিয়েছি, সে অনেক কথা। এখন ধরুন, বয়সও হ'ল, বনেবাদাড়ে প'ড়ে থাকতে আব ভাল লাগে না, বুড়ো বয়সে দেশের মাটির টানও বাড়ে। তাছাড়া, উগাণ্ডাও আর সে উগাণ্ডা নেই। উগাণ্ডা বলে নয়, সমস্ত আফ্রিকান কলোনিতেই এখন গভর্ণমেণ্টের পলিসি বদলে গেছে। আগে হাতে পায়ে ধ'রে সাধাসাধি করত যাতে ইণ্ডিয়ানরা সে দেশে যায়, এখন উলটো ঠেলা লাগাচ্ছে। তাই ভাবলাম, ধুত্তোর ছাই, পরের দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকব, তাও লাথি-ঝাঁটা সয়ে? মনে হ'ল, ব্যস, দিলাম স্টল-টল ছেড়ে, জায়গা-জমিও কিছু করেছিলাম সব ফেলে দিয়ে ঘরেব ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। এখন, যা হোক ক'রে কালী দু'মুঠো জুটিয়েও দিচ্ছেন, চোখ বুজব যেদিন মা গঙ্গাও হাতের কাছেই রইলেন। আর কি চাই, বলুন।

রাত্রি হইয়াছিল। আমরা ট্যাক্সি ডাকিয়া তাঁহাকে তুলিয়া দিলাম। বলিলাম, আবার কিন্তু আসতে হবে, উগাণ্ডার গল্প আমাদের শোনা হ'ল না।

ঘরে ফিরিবামাত্র বড়মামা বলিলেন, কি হ'ল রে। মুখ লম্বা লম্বা কেন?

শিবু বলিল, ধ্যেৎ, শিকারই শোনা হ'ল না।

আমি বলিলাম, তুই-ই তো সব ভেস্তে দিলি।

বড়মামা বলিলেন, শুনলি কি তাহ'লে, এতক্ষণ ধ'রে?

শিবু বলিল, সে তো অন্য গল্প।

বড়মামা বলিলেন, এই বুদ্ধি নিয়ে! ওরে মুখ্যু, সিংহ শিকারই তো ক'রে গেল।

আমরা বলিলাম, তার মানে?

বড়মামা বলিলেন, মানে তোদের কান্ত সিং বা কান্তি চোধুরী, যাই বলিস। মেরে একেবারে লাস ক'রে দিয়ে গেল না তাকে?

মানুষের মীননেস

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

শিকারীকে সব রকম বিপদের জন্যে তৈরি থাকতে হয়। বিপদ আগে থেকে জানান দিয়ে আসে না, সত্যিকার বিপদ আসে হঠাৎ। সেই সময়ে যে মাথা ঠিক রেখে চলতে পারে, সেই বাঁচে ; না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু।

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, রোজাকে বাগে পেলে ভূতে ছেড়ে কথা কয় না। জানোয়ারদেরও তাই। শিকারী যেমন তাদের মারবে ব'লে তাকে তাকে থাকে, তারাও শিকারী দেখলে চিনে নেয়, ও তাদের একটা ইন্‌স্টিংক্‌টের মত। বাগে পেলেই তারা শিকারীকে আক্রমণ করে। শিকারীর প্রাণ ঝুলছে সূক্ষ্ম সুতোর ওপর,—চারদিকে হুঁস রেখে তাকে চলতে হয়, কখন যে কোন জিনিসটা কি ভাবে কাজে লেগে যায়, তার কিচ্ছু ঠিক নেই। এই ধর নেপালের সেই ভালুকের ব্যাপারটা।

হঠাৎ-বুদ্ধি খাটিয়ে আর একবার কি ভয়ানক বেঁচে গিয়েছিলাম, সেই গল্প বলি শোন।

বার্মার একটা জঙ্গল আমাদের কোম্পানি থেকে ইজারা নেওয়া হচ্ছিল। জায়গাটা আপার বার্মায়, মিচিনা থেকে কিছু দূরে। ওদিকটাতে বার্মা রেলওয়ের শেষ স্টেশনই মিচিনা, সেখানে নেমে আরও অনেকটা যেতে হয়।

হাজার দশেক একর নিয়ে বন। সেই বন মেপেজুপে চৌহদ্দি ঠিক ক'রে নিতে হবে, ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করতে হবে, কাঠ কাটাবার জন্যে লোকজন ঠিক করতে হবে, কাঠ

কাটিয়ে কোন্ পথে চালান দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে—সে এক এলাহি ব্যাপার। যাকে তাকে দিয়ে সে কাজ হয় না। তায় আবার জায়গাও খারাপ, না আছে লোকালয় না আছে পথঘাট, বন ভর্তি ময়াল সাপ হাতী আর বাঘ। জেনে শুনে সেই মৃত্যুপুরীতে কোন কর্মচারী যেতে চায় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল আমিই যাব।

আমরা বলিলাম, বার্মাতেও কি বাঘ আছে? রয়াল বেঙ্গল?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, রয়াল বেঙ্গল বল কাকে?

আমরা বলিলাম, কেন, বড় বাঘ যেগুলো।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বড় বাঘ হ'লেই রয়াল বেঙ্গল হয় না। অবশ্য ভুলটা শুধু তোমাদের নয়, ও ভুল অনেকেই করে।

আমরা বলিলাম, তবে?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বেশ, সেই কথাটাই তোমাদের আগে একটু ব'লে নিই। ভুল ধারণা থাকাটা কোন কাজের কথা নয়।

বলতে গেলে গোটা ভারতবর্ষই বাঘের দেশ। সায়াম চায়নাতেও বাঘ আছে, তবে সেগুলো এর কাছে কিছুই নয়। আফ্রিকায় বাঘ নেই।

ইণ্ডিয়াতে অনেক রকম বাঘ পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রধান দুটি জাত—ডোরাদার আর বুটিদার। ডোরাদার বাঘরা দেখতে বড়, তাদের শক্তিও বেশী। বুটিদাররা ছোট, এদের চলতি নাম চিতেবাঘ বা গুলবাঘা। ঘ্যাতর্ ঘ্যাতর্ ক'রে ডাকে তাই পূর্ববঙ্গে বলে ঘ্যাতরা বাঘ। ইংরিজিতে বলে লেপার্ড বা প্যান্থার। মানুষকে এরা বড় একটা ঘাঁটায় না, মাছ ছাগল ভেড়া কুকুর গরু এইসব খায়। বিশেষ করে এদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কুকুর। পোষা জন্তু মারবার সুবিধা হবে ব'লে এরা অনেক সময় গ্রামের ভেতরে এসে বাসা করে। মানুষের পাশাপাশি থেকে থেকে, মানুষকে ভয়ডরও কম করে।

লেপার্ড আর প্যান্থার আসলে একই, না দুটো জাত তা নিয়ে তর্ক আছে। কেউ বলেন একই, কেউ-বা বলেন দুটো আলাদা ভ্যারাইটি।

কিন্তু আলাদা যাঁরা বলেন, তাঁরাও এদের মধ্যে তফাৎটা ঠিক কোথায় তা স্পষ্ট বলতে পারেন না। কেউ বলেন, লেপার্ডের গায়ের চক্করগুলোর মাঝখান ফাঁপা, প্যান্থারের চক্কর নিরেট কালো। কেউ বা বলেন ঠিক তার উলটো। কিন্তু এও দেখেছি, বাচ্চা বয়সে যার চক্করের সবটা কালোয় ভরাট, বড় হ'লে তার চক্কর বাড়ল, মাঝখানে ফাঁক দেখা দিলে। আবার কেউ বা বলেন, লেপার্ডরা গাছে চড়তে জানে না, প্যান্থাররা জানে—আমেরিকার জাগুয়ার এরই জাত-ভাই। একথাও কতদূর ঠিক তা বলা শক্ত। আসলে বেড়ালের জাত, গাছে চড়তে জানে সবাই—তবে ভারী হ'য়ে গেলে সাধ্যে কুলোয় না সব সময়ে।

লেপার্ড প্যান্থারকে কেউ কেউ বলেন, চিতা। সেটা একেবারেই ভুল। চিতেবাঘ এদের বলা হয়, কিন্তু 'চিতা' সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। তার দেহ হালকা, গড়ন এবং চলাফেরা অনেকটাই কুকুরের মত। নখ খোলা, গায়ে চক্কর নয়, কালো ছিট। চিতা দৌড়তে ওস্তাদ; শিকারী কুকুরের মতই এদের কাজে লাগানো যায়। আকবর অনেক চিতা পুষতেন। চিতাকে চেন বেঁধে বনে নিয়ে যাওয়া হ'ত। হরিণ দেখিয়ে চিতাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ত—চিতা দৌড়ে হরিণকে ধরত, কামড়ে আটকে রাখত যতক্ষণ শিকারী গিয়ে না পৌঁছয়। ভারতবর্ষে এক-কালে অনেক চিতা ছিল, এদের প্রধান আড্ডা ছিল সি. পি, যাকে বল মধ্যপ্রদেশ। এখন ভারতবর্ষের চিতা লোপ পেয়ে গেল। পৃথিবীতে এখন চিতা আছে শুধু আফ্রিকাতে। ইংরেজিতে এদের 'Cheetah'ই বলা হয়।

ডোরাদার বাঘদের ইংরিজি নাম টাইগার। টাইগারকে এক কথায় ভারতবর্ষেই জীব বলা চলে। কাছাকাছি দুটো একটা জায়গা, যেমন, বার্মা সায়াম ইন্দোচীন আর প্যাসিফিকের দু'চারটে দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও টাইগার নেই। সাইবেরিয়াতে আছে, খুব বড় সাইজ, প্রায় সাদা রং; সে জাতই আলাদা।

ইণ্ডিয়ান টাইগারদের ভেতরে দুটো গুষ্ঠি। একটা থাকে সমতল

জায়গায়। এদের প্রধান আড্ডা হচ্ছে সুন্দরবন, মানে বরিশাল খুলনা চব্বিশ পরগণা এই তিন জেলার দক্ষিণ দিকে, বে অব্ বেঙ্গলের ধার ঘেঁসে। সেখানে জমি স্যাঁৎসেতে ভিজে, তার ওপর নলখাগড়া হোগলা আর তারাগাছের জঙ্গল, সেই জঙ্গলে এদের বাস। ভিজে জায়গায় থাকে, তায় সমতল দেশ ব'লে লাফালাফি বেশি করতে হয় না, তাই এরা গায়ে খুব ভারী হয়। সাধারণত এদের স্বভাবও একটু আলসে। কিন্তু শক্তি রাখে দারুণ, থাবার এক ঘায়ে একটা বড় ষাঁড়কে ঘায়েল ক'রে দিতে পারে। এদেরই নাম বাঘের রাজা—রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

অন্য জাতটা থাকে পাহাড় অঞ্চলে। সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ায়, জব্বলপুরে, হাজারিবাগের দিকে এদের দেখা যায়, কিন্তু এদের বড় আড্ডা হচ্ছে হিমালয়ের তলাকার জঙ্গলে। তার মানে ইউ. পি.র উত্তরে কুমায়ুন থেকে শুরু ক'রে হিমালয়ের রেঞ্জ ধ'রে পূবদিকে যদ্দুর যাও—নেপাল ভোটানের তরাই, আসাম আর বার্মার জঙ্গল, সব এদেরই রাজত্ব। আসাম আর বার্মার পাহাড়ও আসলে হিমালয়েরই দুটো ডাল কিনা! সায়াম আর আনামে যে বাঘ পাওয়া যায়, তারাও জাতে এদেরই জ্ঞাতি ভাই, তবে তাদের আকার আর শক্তি দুই-ই এর চাইতে ঢের কম।

রয়াল বেঙ্গলের মত এই বাঘেরা গায়ে ভারী হয় না, এদের দেহ হালকা। পাহাড়ে পাহাড়ে ছোটাছুটি করে ব'লে এদের গায়ে চর্বি বেশি জমতে পায় না। রয়ালের তুলনায় এরা চটপটেও ঢের বেশি। রয়াল গায়ের জোরে যা করে এরা সেটা ঐদিক দিয়ে পুষিয়ে নেয়।

দুটো জাতের চেহারাতেও তফাৎ আছে। রয়ালের মুখটা বেশি খোলো, রঙটা একটু বেশি লাল ঘেঁষা। পাহাড়ী বাঘের রঙে হলদের ছাঁটটা বেশি। তবে সে তফাৎ পাকা লোকের চোখে ছাড়া ধরা পড়ে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেও রঙের জেল্লা বদলে যায় কিনা!

আর একটি কথা আছে। বুড়ো হ'লে বা জখম হ'লে বাঘ অন্য

জন্তু ধরতে পারে না, তখন মানুষ খেতে শেখে এবং একবার মানুষ-খেকো হ'য়ে গেলে আর অন্য জন্তু খেয়ে স্বাদ পায় না—একথা নিশ্চয়ই শুনেছ।

অতি বাজে কথা। সায়েবদেব কথা—কবে কোন সায়েব কথাটা বলেছিল মাথা খেলিয়ে, তার পর থেকে সবাই তাই মুখস্থ বলে আসছে। কিন্তু ঐ কথায় বিশ্বাস ক'রে যদি ভাবো, এই বাঘটা কখনও মানুষ খায় নি, অতএব তোমাকে খাবে না, তবেই গেলে।

আসল কথাটি হচ্ছে, বাঘ অতি সুবোধ জন্তু, একেবারে কথামালার গোপাল—যাহা পায় তাহাই খায়। বিশেষ করে রয়াল বেঙ্গল। মানুষ পেলেও খাব না এমন কথা কক্ষনো বলে না। মানুষ ছাড়া আর কিছু খাব না এমন জিদও নেই তাদের। বনের মধ্যে নিত্যি খাবাব জোটে না—পেলে তো গোটা আধখানা ষাড়কে একবারে পেটে পুরলে; আবাব না মিলল তো হপ্তা-ভর টানা উপোস দিলে। বাছাবাছি করলে তার চলে না। সুন্দরবনের বাঘ মানুষ পেলেই খায়, তার সাক্ষী বাংলাদেশের বাওয়ালীবা, য'বা কাঠ কাটতে আর মৌ ভাঙতে যায় আর একটু অসতর্ক হ'লেই বাঘের পেটে চ'লে যায়। তবে হ্যাঁ, মানুষের সঙ্গ অপছন্দ করে সব জানোয়ারই—বেকায়দা বুঝলে তাকে এড়িয়েও চলতে চায়। নোংবা-বুদ্ধিতে মানুষের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না, জানে তো!

যথাসময়ে আউটরাম ঘাটে গিয়ে জাহাজে চাপলাম। সঙ্গে চলল আমার চাকর বিশু, অফিসের এক দরোয়ান, আর এক কেরানী। দরোয়ান অযোধ্যা সিং পুরোনো লোক। কেবানীটিকে আমি চিনতাম না, নতুন বহাল হয়েছে।

রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছে নিলেম ডেকে নিলাম। তারপর কাগজপত্তর সব বুঝে নিয়ে রেলে চাপলাম।

রেঙ্গুন থেকে রেলে ক'রে মিচিনা। সেখান থেকে কতক হেঁটে,

কতক ঘোড়ায় চেপে বনের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। ফরেস্ট ডিপার্ট-মেণ্টের এক সায়েব থাকে সেখানে, সে আমাদের রিসিভ ক'রে নিলে। বললে, রেঙ্গুন থেকেই সে টেলিগ্রাম পেয়েছে আমরা যাচ্ছি। তার বাড়ির কাছাকাছি একটা ছোট্ট বাংলোমতন আছে, অফিসার কেউ এলে থাকে। সেইটে আমাদের জন্য ছেড়ে দিলে।

পরদিন থেকে আমাদের কাজ শুরু হ'ল। সারাদিন বন্দুক ঘাড়ে ক'রে কুলি নিয়ে বনে বনে ঘুরি, মাপ-জোখ দেখে দেখে পিলার গাড়ি, বা বাংলোয় ব'সে ব'সে কন্ট্রাক্টর আর কুলির সর্দারদের সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক করি; রাতের বেলা দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘুমোই, আর মাঝে মাঝে যখন ঘুম ভাঙে দূর থেকে শেয়াল আর বাঘের ডাক শুনি।

এমনি ক'রে হপ্তা দুই কেটে গেল।

সায়েবটি ভারি কাজের লোক, আমাদের নানা ভাবেই সে সাহায্য করছিল। কাজও এগোচ্ছিল চমৎকার। সেদিক থেকে অসুবিধে কিছু নেই, তবু যাবার পরদিন থেকেই একটা ব্যাপার বড্ড মুশকিল বাধিয়ে তুললে।

প্রথম যেদিন গিয়ে পৌঁছেছি তার পরদিন সকালবেলাকার কথা।

বন দেখতে বেরোব, তার আগে বাংলোর বারান্দায় ব'সে ফরেস্টার সায়েবের সঙ্গে চা খাচ্ছি আর কাগজপত্র দেখছি। এর মধ্যে দুটো মেয়ে এসে বাংলোয় ঢুকল। সেই দেশী মেয়ে, বয়স বেশি নয়, বেদেদের মত ঘাগরা পরনে। বললে, সায়েব কিছু খেতে দেবে? তোমাকে নাচ দেখাব।

আমি বললাম, নাচ দেখাতে হবে না বাপু, পয়সা নিয়ে যাও। ব'লে পয়সা দিতে যাচ্ছি, ফরেস্টার সায়েব বাধা দিলে। বললে, খবরদার অমন কাজটি কোরো না। ব'লে ধমকে মেয়ে দুটোকে ভাগিয়ে দিলে।

আমি বললাম, গরীব মানুষ, দুটো পয়সা দিতাম। তাড়িয়ে দিলে কেন?

সে বললে, তুমি এদের জান না তো, ভয়ঙ্কর চীজ। প্রশ্রয় দিলে আর রক্ষে নেই।

আমি বললাম, কেন?

সায়েব বললে, এরা হচ্ছে এই দেশী যাযাবর বেদের জাত, দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। মেয়েগুলো ভিক্ষে করে, নাচ দেখায়, আর সেই তাকে ঘুরে ঘুরে খবর জোগাড় করে। আসলে এদের পেশাই চুরি চামারি। তোমাদের ইণ্ডিয়াতে সব ক্রিমিনাল ট্রাইবরা আছে না? ঠিক তাদের মত। পয়সা আছে জানলে খুন ক'রে যাবে তোমাকে। এদের কক্ষনো পয়সা কড়ি দেবে না, বাংলোর ত্রিসীমানায় আসতে দেবে না।

বিশু বললে, এই তো কাছেই বনের মধ্যে ওদের তাঁবু। অনেক লোক, ষাট-পঁয়ষট্টি জন হবে, ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সব রকম আছে দেখলাম।

আমি বললাম, যাক, আবার এলে তাড়িয়ে দিস।

সত্যি দুদিন না-যেতে চুরি আরম্ভ হ'ল। চান ক'রে এসে জামা পরব, সোনার বোতামটা উধাও হয়েছে। আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজলাম, বৃথা। বিশু বললে, ঠিক ঐ বেদেদের কম্ম। সেদিন শার্ট গায়ে বারান্দায় বসে ছিলেন তখন বোতাম দেখে গেছে, আজ ভোরে ঢুকে চুরি করেছে।

অসম্ভব নয়। আমরা চারটি মোটে প্রাণী, যে যার কাজ নিয়ে থাকি। চোরের পাহারা তো দেয় না কেউ। আশেপাশে আর জনমানব নেই, ওরা ছাড়া চুরি করবেই বা কে!

সায়েবকে বললাম। সায়েব বললে, তখনই বলেছি। এবার থেকে সাবধান থাকবে।

আমি বললাম, সে তো যেন থাকলাম। কিন্তু বোতামটা?

সায়েব বললে, ও গেছে। এদের হাতে জিনিস গেলে স্বয়ং পরমেশ্বরের সাধ্য নেই খুঁজে বার করেন।

আমি বললাম, তবু তো একটা চেষ্টা করা যায়।

সায়েব বললে, করবে কে? আমার এদের সার্চ বা অ্যারেস্ট করার রাইট নেই, সে রাইট পুলিশের। পুলিশ থাকে বহুদূরে—শহরে।

আমি বললাম, তুমি কিছুই করতে পার না?

সায়েব বললে, আমি এক পারি জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিতে, তাও যদি গাছ কাটে বা হরিণ মারে তবেই। তা যতক্ষণ না করছে কিচ্ছু করার সাধ্য নেই।

ভাল কথা।

চুরি চলতে লাগল। আজ পেপার-ওয়েট যায়, কাল যায় ছুরি হারিয়ে, তার পরদিন যায় সাবান। সায়েবকে বললাম, এ তো মহা বিপদ দেখছি!

সায়েব বললে, টুকিটাকি জিনিসের ওপর ওদের ভয়ানক লোভ। বুনো জাত কিনা!

সে তো বুঝলাম। কিন্তু সেই অজ বনের মধ্যে জিনিস হারালে পাই কোথায় বল তো? মহা সাবধান হ'য়ে থাকি, তবু কিছু হয় না, যা যাবার যায়ই। লোক দেখি না অথচ চুরি হয়, যেন মন্তরের খেলা।

এমনি ক'রে দিন কাটতে লাগল।

সেদিনটা ভয়ানক খেটেছি। সকালে আটটা না বাজতে বেরিয়ে গেছি, সারাটি দিনই কেটেছে পায়ের ওপর।

ফেরার পথে আবার ফরেস্টার সায়েবের ওখান হয়ে, বাংলোয় এসে যখন পৌছলাম তখন ন'টা বেজে গেছে।

বাংলোয় ঢুকেই শুনলাম ভেতরে একটা তুমুল ঝগড়া চেঁচামেচি চলেছে, অযোধ্যা সিং দরোয়ানে আর কেরানীতে। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু শুনতে চেষ্টা করলাম। শুনলাম দরোয়ান বলছে, সায়েব এলে আজ আমি সব কথা ব'লে দেব।

কেরানী চড়া গলায় বললে, যা না শালা, বল গে যা তোর বাবাকে।

দরোয়ান বললে, খবরদার বলছি মুখ খারাপ করবে না, খুব তো ফটং ফটং করছ, এস আবার মাসকাবারে ধার চাইতে। খাইয়ে বেব তখন।

কেরানী বললে, তবে রে শালা পাজি।

এর পরে আর চুপ ক'রে থাকা যায় না। গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলাম, বিশু!

আমার আওয়াজ পেয়ে ঝগড়া থেমে গেল। বিশু বেরিয়ে এল। আমি বললাম, ওটা কি হচ্ছিল?

বিশু বললে, ও তো রোজই হচ্ছে। দুটোই সমান, সারাদিনই ঐ চলে।

আমি বললাম, বল আমি ডাকছি।

দুটিতে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। দরোয়ান রাগে ফুলছে। কেরানী ভিজে বেড়ালটি, মুখে কথা নেই। সত্যি বলতে, এর আগে আমি লোকটাকে বিশেষ চেয়ে দেখি নি। এখন তার দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম। যেটুকু চেহারা চোখে পড়ল, তাইতেই আমার অভক্তি ধ'রে গেল। রোগা পাঁশুটে চেহারাটি, অথচ বাবুগিরির সখটুকু আছে, চুলে ঢেউ-খেলানো টেড়ি; হাবা-গোবা মুখ কিন্তু চোখ-দুটো সব সময়ে টুলটুল করছে যেন ভয়ানক নার্ভাস—এই ধরনের লোকগুলো বড্ড ছিঁচকে হয়।

একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, কিসের ঝগড়া হচ্ছিল?

দরোয়ান সেলাম ঠুকে বললে, সায়েব, আপনি বিচার করুন, রসুই ঘরে আস্ত এক টিন ভর্তি চিনি রেখেছি, তার আদ্ধেকের বেশি কেরানী বাবু চুরি ক'রে খেয়ে দিয়েছে।

কেরানী হাঁউমাউখাউ ক'রে বললে, আজ্ঞে না স্যর, খাই নি। সব ঐ শালার বানানো।

আমি ধমকে বললাম, চুপ করুন। সুপিরিয়ারের সামনে এই ভাষা বলতে আপনার লজ্জা হ'ল না?

দরোয়ান বললে, আপনি নিজে দেখবেন সায়েব, ভাঁড়ারের ঘি মশলা মিষ্টি কিচ্ছু থাকে না, সব চুরি ক'রে ক'রে খায়। বড়ী তাজ্জবকী বাত।

কেরানী বললে, না স্যর। আমি ভদ্দরলোকের ছেলে স্যর, ওর কথায় আপনি বিশ্বাস করবেন না। আপনাকে বলছি আমি যদি স্যর খেয়ে থাকি, তবে আমি কায়েতের ছেলে নই।

আমি বললাম, থাক, হয়েছে। আপনি অফিস স্টাফ আর ও দরোয়ান, আপনি ওর সঙ্গে সমানে ঝগড়া গালিগালাজ করতে যান কি ব'লে? যে অফিসে আপনি চাকরি করেন, তার একটা ডিগনিটি নেই?

সে বললে, না স্যর, আমি গালিগালাজ করি নি।

আমি বললাম, মিথ্যে কথা ব'লে লাভ নেই, একটু আগেই আমি নিজে শুনেছি। ভদ্রলোক কায়েতের ছেলে হয়ে আপনি ইতর ছোটলোকের মত দিব্যি গালেন, এ কী আপনার প্রবৃত্তি! ডিসগ্রেস! ফের যেন আমার কানে এসব না আসে।

দরোয়ানকে বললাম, তোমার যা নালিশ থাকে আমাকে বলবে। তুমি কেন তোমার অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাও? ফের অমন হ'লে আমি তোমাকে ডিসমিস ক'রে দেব।

দুটোতেই গজগজ করতে লাগল।

সারাদিন খাটুনির পর আবার এই উৎপাত, মাথাটাই গরম হয়ে গেল সেদিন। ঘুম আর পায় না, খাওয়া দাওয়া সেরে অনেক রাত অবধি বাইরে ব'সে ব'সে বই প'ড়ে কাটালাম।

বিশু আমার ঘরে জলটল দিয়ে মশারি ফেলে দিয়ে গেল। তখন হঠাৎ বললে, দরোয়ান মিছে বলে নি। কেরানীবাবুর একটু হাতটান অভ্যেস আছে।

আমি বললাম, যাঃ!

সে বললে, সত্যি। আপনার চায়ের বিস্কুট পর্যন্ত চুরি ক'রে খায়। আমি নিজে দেখেছি।

আমি বললাম, যদি খেয়েই থাকে একদিন, কি হয়েছে? খিদে পেয়েছে, খেয়েছে। এসেছিস বিদেশে বিভুঁয়ে কোথায় মিলে মিশে সব থাকবি, না খালি ঝগড়া আর খেয়োখেয়ি। বকাস্ নি এখন, যা।

পরদিন খুব ভোরে আমার বেবোবার কথা। কিন্তু অনেক রাত ক'রে শুয়েছি, ঘুমই ভাঙল সাতটায়। তাড়াতাড়ি ক'রে মুখ হাত ধুয়ে কিছু খাবার নাকে মুখে গুঁজে নিয়ে পোশাক পবলাম। দরোয়ানকে বললাম, তৈরি হয়ে নাও, সঙ্গে যাবে।

সে বন্দুক কিরিচ বেঁধে নিলে। বন্দুক ছাড়া এ পথে এক পা চলা যায় না। আমি বিশুকে বললাম, আমার বন্দুক?

বিশু বললে, ঐ তো র‍্যাকে। দেখে নিন।

আমি বললাম, কেন, টোটা ভরিস নি?

সে বললে, তা ভরেছি তবু একবার দেখে নেওয়া ভাল।

সে কথা ঠিক, সাবধানের মার নেই। বন্দুক ভেঙে দেখলাম দুটি ঘরেই কার্টি্রজ পোরা আছে।

বেরোচ্ছি, দেখি বাংলোর ঠিক বাইবে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কেরানীটি, সেদিনের সেই বেদে মেয়েদুটোর সঙ্গে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কইছে। আমাকে দেখেই তারা একটু যেন কেমন হয়ে গেল। কেরানী ঘুরে দাঁড়াল। মেয়েদুটো স'রে পড়ল। আমার তখন এসব দিকে তাকাবার সময় নেই, আমি ভাল ক'রে এদের লক্ষ্যও করলাম না তখন, সোজা বেরিয়ে গেলাম।

দিনের কাজ সেরে যখন বাড়িমুখো হলাম তখন বেলা দুপুর পেরিয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে দারুণ, দুজনেই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলেছি। আগে আগে আমি, পেছনে দরোয়ান।

পাহাড়ে জায়গা, জমি সেখানে উঁচুনীচু। এক জায়গায় রাস্তাটা একটা মস্ত টিলার গা বেয়ে উঠে আবার নীচে নেমে গেছে। রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড়ের গা, আর অন্যদিকে বোধহয় ধ্বস নেমে

পাহাড় ভেঙে পড়েছে, সেখানটা প্রায় হাজার ফুট খাড়া খড্। পা ফসকে তার ভেতরে পড়লে আর রক্ষে নেই।

সাবধানে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দুজনে এগোচ্ছি।

রাস্তার মাথায় উঠতে তখন অল্প বাকি, হঠাৎ একটা বোট্‌কা গন্ধ নাকে এল। দাঁড়িয়ে পড়লাম। দরোয়ানও আমার পাশে এসে থামল। বললে, উঃ, কিসের বিশ্রী গন্ধ, সায়েব?

বললাম, বাঘ।

দরোয়ান ঘাবড়ে গেল। বললে, রাম রাম, সে কি কথা?

আমি বললাম, কথা ঠিকই, এ গন্ধ ভুল হয় না। কিন্তু দিনদুপুরে পথের মাঝখানে বাঘ ব'সে কি করছে?

দরোয়ান বললে, এখন উপায়?

আমি বললাম, উপায় আর কি, যেভাবে হোক যেতেই হবে পথ ক'রে। এক কাজ কর, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ক'রে দাও। আওয়াজ শুনলে খুব সম্ভব বাঘ স'রে যাবে। আওয়াজ ক'রেই আবার গুলি ভ'রে নেবে কিন্তু।

কাঁধে ঝোলানো ছিল জলে ফ্ল্যাস্ক আর কাঁটাকম্পাশ, সেগুলোকে নামিয়ে রাখলাম, রেখে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়ালাম। পেছন থেকে দরোয়ান বন্দুক তুলে ফাঁকা আওয়াজ করলে।

আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতে সামনে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝোপ ন'ড়ে উঠল; তারপরই তার ভেতর থেকে গর্জন ক'রে রাস্তার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

বন্দুকের আওয়াজ শুনলে বাঘ ভয় পেয়ে স'রে যায়, এই চিরকাল জানি। এ ব্যাটা বোধহয় সদ্য কোথাও তাড়া খেয়েছিল, ক্ষেপে রয়েছে। কিন্তু তখন আর লড়াই করা ছাড়া পথ নেই। দরোয়ানকে ডেকে বললাম, হুঁসিয়ার! সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলে সই ক'রে ঘোড়া টিপলাম।

খট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল শুধু। গুলি ছোটে নি। সর্বনাশ!

বাঘ আমার দিকে ফিরে তাকালে। তখন আর ভাববার সময় নেই; আবার অন্য ঘোড়াটা টানলাম। আবার খট্‌ ক'রে শব্দ হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ এসে আমার ঘাড়ের ওপর পড়ল।

অনেকের ধারণা আছে, বাঘ আড়ি না ক'রে আক্রমণ করতে পারে না। বাজে কথা। আড়ি করার কোন ব্যাপারই নেই। বাঘের আক্রমণ একটা অদ্ভুত জিনিস, দেখবার মত দৃশ্য। বাতির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিলে একটা লম্বা আলোর লম্বা লাইন চোখে পড়ে, দেখেছ? বাঘের চার্জও কতকটা সেইরকমের। হলদে একটা আলোর রেখা যেন চট্‌ ক'রে সামনের দিকে ছিটকে চ'লে যায়, ভাল বোঝাই যায় না কি হ'ল—চোখ পালটাতে না পালটাতে বাঘ শিকারের ওপর এসে পড়ে।

এও তাই হ'ল, বন্দুক নামাতে না নামাতে বাঘ এসে আমাকে ধরলে। সোজা খাড়া হয়ে উঠে সামনের দুই থাবা আমার দুই কাঁধে দিয়ে দাঁড়ালে, তারপর সামনে ঠেলা দিয়ে আমাকে চিৎ ক'রে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

আমার অবস্থাটা বোঝ। চিৎ হ'য়ে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই, একদম বাঘের মুখের তলায়। প্রথম ধাক্কাতেই প্রায় পড়েছিলাম, বন্দুকটা মাঝখানে প'ড়ে বাঘকে একটু ঠেকিয়ে দিলে তাই বেঁচে গেছি। পড়তে পড়তে এক পা পেছনে হ'টে গিয়ে টাল সামলে নিলাম। তারপর শুরু হ'ল দুজনে ঠেলাঠেলি। সেও আমাকে ঠেলে ফেলবে, আমিও তার ঠেলা স'য়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

সাধারণ মানুষের চেয়ে আমার গায়ে জোর একটু বেশিই। তবু তার সঙ্গে পারা যা'য় না। মন তিনেক ওজন তার গায়ে, আর দুর্দান্ত শক্তি—সেই ওজন দিয়ে সে আমাকে চাপ দিচ্ছে, সামলানো কি সোজা কথা! কোট শার্ট ফুঁড়ে আমার দুই কাঁধে তার নখ বিঁধে বসেছে, বেশ টের পাচ্ছি, কাঁধ বেয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে আমার মুখ গলা কামড়াবার চেষ্টা করছে, আমি মাথা

পেছনে সরিয়ে নিচ্ছি। বাঘের দুই রিস্ট আমি দুহাতে ধ'রে ঠেলা দিচ্ছি কাঁধটা যদি ছাড়ানো যায়—কিন্তু সে অসম্ভব ব্যাপার। একটা কিন্তু মজা দেখলাম, কাঁধ বেয়ে রক্ত পড়ছে, মাংস কেটে তার নখ বসেছে স্পষ্ট টের পাচ্ছি, কিন্তু কাঁধে কোথাও ব্যথা লাগছে না, সমস্ত যেন কোকেন লেগে অবশ হ'য়ে গেছে। বাঘ সিংহের আক্রমণে এমন হয়, বইয়েও পড়েছি। হয়তো তখনকার মত একটা নার্ভাস প্যারালিসিসই হয়, না কি কে জানে!

সবচেয়ে বড় মুশকিল হ'ল, পাথরের রাস্তা, জুতো আটকাতে পারি না, খালি পা হড়কে যায়। বাঘ একটা ক'রে ঠেলা মারে, আর আমি এক পা দু' পা ক'রে পেছন হটি—নইলে তাকে রোখা যায় না।

দরোয়ান ওদিকে পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। করবেই বা কি—হাতে বন্দুক, তবু সে গুলি করতে পারছে না। বাঘ আর তার মাঝখানে আমি, গুলি লাগবে আমার গায়ে।

তবু সে-যাত্রা আমার প্রাণ সে-ই বাঁচিয়ে দিলে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বললে, হুঁসিয়ার, খড্! শুয়ে পড়ুন!

খড্! মনেই ছিল না। তার চীৎকার কানে গিয়ে আচমকা মুখ ফিরিয়ে পেছনে চাইলাম। দেখি, হটতে হটতে রাস্তার কিনারায় চ'লে এসেছি, হাত তিন-চারেক পেছনেই খড্। আর কয়েক পা পেছোলেই হ'য়ে গিয়েছিল, একদম খডের মধ্যে!

খডের মধ্যে! ভাবতেই হঠাৎ আরও একটা কথা মনে জেগে উঠল। লোকে শুনলে বলবে পাগলামো, কিন্তু তখন আমার কেমন মনে হ'ল, এ ছাড়া বাঁচবার আর কোন উপায় সেই, এই শেষ ভরসা! আর সে সময় তখন সমীচীন অসমীচীন ভেবেই বা কি করব, প্রাণ তো যেতেই বসেছে।

পেছন থেকে আবার দরোয়ানের গলা কানে এল—শুয়ে পড়ুন!

হঠাৎ মনে হ'ল দরোয়ানের মুখ দিয়ে ভগবানই আমাকে ব'লে দিলেন কথাটা।

বাঘের দুই থাবা আমার দুহাতে ধরাই ছিল, গায়ে যতটুকু শক্তি ছিল একত্র ক'রে তাকে এক ধাক্কা মাবলাম, থাবা একটু যেন কাঁধ থেকে আলগা হয়ে গেল। যেতেই আমি বাঁ পা দুমড়ে চিৎ হ'য়ে শুযে পডলাম। পডতে পডতে বাঘকে দিলাম এক হ্যাঁচকা টান, আর সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-খানা তুলে বাঘের তলপেটে লাগিয়ে প্রাণপণ জোবে এক ঠেলা।

বাঘ এ রকম আচমকা প্যাঁচের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে একেবারে উলটো ডিগবাজি খেযে আমার মাথা ডিঙিয়ে সোজা খডের মধ্যে অদৃশ্য হ'যে গেল।

তাডাতাডি উঠে গিযে খডেব কিনারায ঝুঁকে পডে চেযে দেখলাম, বাঘ একেবারে সেই হাজার ফুট নীচে পাথরের ওপব আছডে পডে সাবাড হ'যে গেল।

দবোযান ছুটে কাছে এল। তার তখনও গলার স্বর কাঁপছে। বললে, সাযেব, এ কি কাণ্ড হ'ল? বডী তাজ্জব কী বাত!

আমি বললাম, পবমাত্মা বাঁচালে কে মারে, বল?

দবোযান ঘাড নেডে বললে, খুব ঠিক কথা।

সে যতটা অবাক হযেছিল, আসলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তত আশ্চর্য কিছু নয। ওটা জুজুৎসুর একটা সোজা প্যাঁচ, ওকে বলে স্টমাক থ্রো।

হাঁপিয়ে গিযেছিলাম, সেইখানে ব'সে একটু জিবিযে নিলাম। বন্দুকটা তখনও মাটিতে পড়ে। দবোয়ান সেটাকে তুলে আনলে। বললে, গুলি চলল না কেন?

বললাম, সেইটেই আশ্চর্য লাগছে। আসবার আগের দিন টোটা কিনেছি। বডা কোম্পানির মাল, খারাপ হবার কথা নয়। খোল তো বন্দুক!

দরোয়ান বন্দুক ভেঙে কার্টিজ দুটো বার করলে। অবাক কাণ্ড!

তাতে বারুদ গুলি কিচ্ছু নেই, দুটো খালি কার্ট্রিজের খোল শুধু বন্দুকে পোরা ছিল। আমার রক্ত চ'ড়ে গেল। বাংলোয় চল, জল্‌দি।

একরকম দৌড়েই দুজনে বাংলোয় এসে পৌঁছলাম। বিশুকে বললাম, আমার বন্দুকে গুলি তুই নিজে দিস নি?

সে বললে, আমিই তো ভরেছি, কাল রাত্রে। রোজ যেমন ভরি।

আমি বললাম, তারপর, আজ বন্দুক ধরেছিল কে?

বিশু বললে, সকালবেলা তো আপনাকে বললাম, বন্দুক দেখে নিন। কি হয়েছে?

আমি বললাম, দেখে মানুষ নেয় কার্ট্রিজ আছে কি না তাই। কার্ট্রিজ বার ক'রে দেখে না। কে ধরেছিল বন্দুক, তাই বল।

বিশু বললে, কেরানীবাবুকে একবার দেখেছিলাম বন্দুকের কাছে ঘুরঘুর করতে। তাইতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

বললাম, ডাক তাকে।

কেরানী এল। তাকে বললাম, তুমি আমার বন্দুক ধরেছিলে কেন?

কি বুকের পাটা, বেমালুম ব'লে দিলে, কই, আমি তো ধরি নি!

বিশু বললে, ধরেছেন। আমি দেখেছি।

কেরানী খ্যাঁক ক'রে উঠল, তবে রে ব্যাটা পাজি, মিথ্যে নালিশ করছ! আমি স্যর ভদ্দরলোকের ছেলে স্যর, আমি বন্দুক দিয়ে কি করব?

আমার আর সহ্য হ'ল না। তার চুলের মুঠি ধ'রে ঠাস ক'রে এক থাপ্পড় কষিয়ে বললাম, ফের ইতরামো! বল, কেন ধরেছিলে বন্দুক? কার্ট্রিজ বার ক'রে নিয়ে খালি খোল পুরে রেখে দিয়েছ, আমাকে খুন করবার মতলব?

সে কথার জবাব দেয় না, খালি মোচড় খায় আর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে। আমি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, আজ মেরেই ফেলব তোমাকে। কি করেছ কার্ট্রিজ দিয়ে?

বলতেই সকালবেলার কথা মনে পড়ে গেল। বললাম, আমি যখন বেরোই, সেই বেদে মেয়েদের সঙ্গে তোমার অত কি কথা হচ্ছিল ?

সে বললে, ভিক্ষে চাইতে এসেছিল স্যর, তাই তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

দরোযান বললে, ভিক্ষে চাইতে এসেছিল, তাই তাদের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলছিলে ? বড়ী তাজ্জবকী বাত !

আমি বললাম, বুঝেছি। কার্ট্রিজ চুরি ক'রে তাদের কাছে বেচেছ। ভেবেছিলে এক ঢিলে দুই পাখি মারবে, পয়সাও হ'ল, আমিও মরলাম, কেমন ?

সে তখনও গোঁ ছাড়বে না। হাউ হাউ ক'রে বললে, মিছে সন্দেহ করছেন আমাকে স্যর, এ সব দরোয়ানের কাজ। আপনাকে বলছি, আমি যদি স্যর ক'রে থাকি তবে আমি কায়েতের ছেলে নই।

আমি তার চুলে আর-একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, চুপ !

লোকটা এবারে বুঝলে তার পরিত্রাণ নেই। বুঝে সে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে দুই হাতে আমার হাতটাকে খিমচে ছ'ড়ে রক্তারক্তি ক'রে দিলে।

তারপরে আর ধৈর্য থাকে না। বিশু আর দরোয়ান ছুটে এল, বললে, আপনি ছেড়ে দিন সায়েব, আমরা দেখে নিচ্ছি।

আমি বললাম, না।

লোকটার মুখ দিয়ে তখন গাঁজলা ভাঙছে, দুই চোখ রক্তবর্ণ, পাগলের মত। দাঁত বার ক'রে বললে, বেশ করেছি। কেন আমাকে কাল গালাগাল দিয়েছিলে ?

আমি বললাম, সেই রাগে তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে ? নাও, এবার কর খুন। করলে না ?

ব'লে ঠাস ঠাস ক'রে আর কয়েকটা চড় মারলাম। চড়ের চোটে সে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর লাথি মেরে মেরে তাকে বাংলো থেকে দূর করে দিলাম। বললাম, থানা পুলিস করা আমার স্বভাব

নয়। কিন্তু ফের যদি তোমাকে এখানে দেখতে পাই তো আর জ্যান্ত ফিরবে না, মনে রেখো।

সে আর কথাটি কইলে না, উঠে সুড়সুড় ক'রে স'রে পড়ল।

আমি দেশে ফিরলাম আরও মাসখানেক পরে। তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। কিন্তু ভেবে দেখ কী সাজ্ঘাতিক ব্যাপার! বনের মধ্যে বাঘে তাড়া করবে এব মধ্যে আশ্চর্য কিছু নেই, সেজন্যে মানুষ তৈরীও থাকে। কিন্তু ঠিক সঙ্কটের মুহূর্তে দেখা গেল বন্দুকে গুলি নেই, সত্যিকার বিপদ বলে এটিকে। এতেই মানুষ মারা পড়ে। সেইজন্যেই বলেছিলাম, মাথা কখনও হারাবে না, কখন কি উপায়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে, তার কিচ্ছু ঠিক নেই। নইলে, কবে কোন্ ছেলেবেলায় শিখে-ছিলাম জুজুৎসু, তখন কে জানত পঁচিশ বছর পরে সেই বিদ্যে এমন ক'রে কাজে লেগে যাবে!

আমরা বলিলাম, সে কেবানীর নাম কি ছিল?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, আরে, সে গোলা লোক। নাম শুনলেই কি চিনবে তাকে?

আমরা বলিলাম, বলুন না।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, ধনেশ দস্তিদার। শুনেছি পরে নাকি কোথায় একটা পান-বিড়িব দোকান করেছিল। সেইখানে ব'সে ব'সে বিড়ি পাকাত, আর আমার কুচ্ছো করত। কিন্তু কুত্তার ডাকে কি হাতী মরে!

পরশুরাম

শ্রীচরণেষু

অচেনা পাড়ায় বাড়ি খুঁজে খুঁজে
চলেছি রাত্রিবেলা—
পথে নেই আলো, আঁধার আকাশে
গহন মেঘের মেলা।
পকেটে রয়েছে ঠিকানাটা লেখা,
অক্ষর তারও যাচ্ছে না দেখা—
একটি শুভ্র আলোকের রেখা
তোমার জানালা থেকে
পড়েছিল পথে—তারই মাঝে ধ'রে
ঠিকানা নিলাম দেখে।

"সম্বুদ্ধ"

কান্তি চৌধুরী আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন।

তখন আমরা শিশু, তিনি অতি বৃদ্ধ। দীর্ঘ রৌদ্রদগ্ধ গৌরবর্ণ মূর্তি, মাথায় বিপুল টাক, উন্নত নাসিকা।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় কান্তি চৌধুরীর বৈঠকখানায় আমরা যাইতাম। কান্তি চৌধুরী গল্প বলিতেন, আমরা শুনিতাম। যৌবনে কান্তি চৌধুরী প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন। সেই শিকারের গল্পই তিনি বলিতেন। আমরা শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। মুগ্ধ না হইলে কান্তি চৌধুরী রাগ করিতেন।

কান্তি চৌধুরী মারা গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গল্প মরে নাই। আমাদের স্মৃতিতে তাহারা বাঁচিয়া আছে।

সেই গল্প দুই-একটা আপনাদের শুনাইব। যেমন শুনিয়াছি, ঠিক তেমনটিই শুনাইব।

বাঘের থাবা

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

তখন সোঁদরবন ছিল বাঘের আড্ডা। ঝোপে ঝাড়ে বাঘ গিসগিস করত। স্টীমার চলবার সময় নদীর দু' পাড়ে বাঘ এসে গজরে লাফিয়ে পড়ত। এখন সে বাঘ আর নেই, ম'রে হেজে গেছে। যা দু-একটা এখনও দেখা যায়, সে না-খেয়ে আধমরা। পূর্বপুরুষের সে তেজ আর নেই।

একবার হ'ল কি, তখন সবেমাত্র ওদিকে স্টীমার-লাইন খুলেছে। বাঘের উপদ্রবে লাইন চলে না। লোকজন তো প্রাণ হাতে ক'রেই চলে। সেজন্যে নয়, তাদের অভ্যেস আছে। কিন্তু স্টেশন-ঘর অবধি বাঘের দৌরাত্ম্যে থাকে না। রাতারাতি হানা দিয়ে সব ভেঙেচুরে সারা ক'রে দেয়।

আমি তখন ছুটিতে, সায়েবের টেলিগ্রাম পেলাম, চৌধুরী, শিগগির এস। যমের ডাকে দেরি সয়, সায়েবের ডাকে সয় না। টেলিগ্রাম পেয়েই রেলে চড়লাম। সোজা কলকাতায়।

সায়েবের বাড়ি পৌঁছে দেখি, সায়েব ব'সে আছে। তার সঙ্গে আর একটা সায়েব, ভুঁড়ি দেখলেই বোঝা যায় বড় চাকরি করে। আমার সায়েব তো আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, বাঁচালে চৌধুরী, তোমার জন্যেই ব'সে আছি। বন্দুক এনেছ তো?

বন্দুক ছাড়া আমি এক পা চলতাম না। বললাম, এনেছি। কেন বল তো?

সায়েব বললে, বলছি। অন্য সায়েবটাকে চিনিয়ে দিয়ে বললে, ইনি হচ্ছেন মিঃ ক্র্যাম্প, সোঁদরবনের মধ্য দিয়ে যে নতুন স্টীমার-

লাইন হয়েছে, তার এজেণ্ট। তোমার কাছে ইনি সাহায্য চান।

বললাম, কিসের ?

ক্র্যাম্প সায়েব বললে, বাঘে আমার সর্বনাশ করলে। পরশু খবর পেলাম, মীরপুর ব'লে একটা স্টেশনকে-স্টেশনই বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

আমি বললাম, মীরপুর আমি চিনি। বাঘে কি খেয়েছে ?

ক্র্যাম্প সায়েব বললে, সব। স্টেশনমাস্টার, সিগ্‌ন্যালের লালবাতি, টিকিটের বাক্স, মায় চেয়ার টেবিল সুদ্ধু।

আমার সায়েব বললে, তাই তোমাকে ডেকেছি। বাঘ মারতে হবে। তুমি ছাড়া আর কারও কম্ম নয়।

ক্র্যাম্প সায়েব বললে, আমার লোকজনও গেছে সেখানে, তবু তোমার ওপরই আমার ভরসা। যদি পার চৌধুরী, আজন্ম তোমার কেনা হয়ে থাকব।

তথাস্তু।—বন্দুক ঘাড়ে ক'রে গিয়ে স্টীমারে উঠলাম।

মীরপুরে গিয়ে দেখি, অবস্থা ভয়ানক। লোকজন ভয়ে ঘরের বার হয় না। চাষ-আবাদ, বনের গাছকাটা, সব একদম বন্ধ।

আমার নাম শুনে সেখানকার শিকারীরা দেখা করতে এল। তাদের সর্দার ছিল কেতুলাল। লোকে বলত কালকেতু। কালকেতুই বটে। বিরাট জোয়ান। সাড়ে চার হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া কাঁধ, দেহের প্রত্যেকটি সুতো লোহা দিয়ে তৈরি। না জানে ভয়ডর, না জানে বিশ্রাম। একা হাতে বনের মধ্যে ঢুকে সে বাঘের সঙ্গে লড়াই করত। খেজুরগাছ-কাটা হেঁসো দিয়ে বাঘ মারত।

কালকেতুকে আমি আগেও অনেক দেখেছি। তার সঙ্গে শিকারেও গেছি। তাকে ভয় পেতে কখনও দেখি নি। এবার দেখলাম, সেই কালকেতুও ভয় পেয়েছে। আমাকে বললে, দুঃসাহস করবেন না, এ বাঘ নিয়ে খেলা নয়। স্টেশনের বাইরে নরম মাটিতে বাঘের থাবার দাগ পাওয়া গিয়েছিল। কালকেতু আমাকে নিয়ে গিয়ে

দাগ দেখালে। মেপে দেখলাম, সোজাসুজি পাঞ্জা এগারো ইঞ্চি হ'ল। বাঘের থাবা এত বড় হতে পাবে, এ কথা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। বললাম, কেতু, এ সত্যি বাঘ নয়, কোন দুষ্টলোকে দাগ বানিয়ে বেখেছে। বাঘেব থাবা এত বড় হতে পারে না। থাবাই যার এতখানি, সে বাঘ কত বড় ?

কেতু বললে, বাঘ মিথ্যে নয়, আরও লোকে তাকে দেখেছে। কিন্তু এ বনের বাঘ নয়, ডাইনি বাঘ। আমাদের সাঁই গুনে বলেছে, একে ঘাঁটাতে গেলে আমাব মাথা থাকবে না।

আমি বললাম, সেকি হে, তুমিও শেষে ভয় পেলে নাকি ? তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ কেতু।

কেতু বললে, বুড়ো হই নি কত্তা, আমি সেই কালকেতুই আছি। কিন্তু দেবতার সঙ্গে তো গা-জোরি চলে না।

আমার তখন বোখ চ'ড়ে গেছে। বললাম, দেবতা-টেবতা শুনতে চাই না, ও বাঘ আমার চাই। বড় বাঘ না হ'লে মেরে মজা কি, বল ? বন্দুক কিনেছি কি বনবেরাল মারব ব'লে ?

কেতু কম কথার মানুষ। বললে, যা বোঝেন। আমি কিন্তু ভাল বুঝছি না।

আমি বললাম, তোমার কিচ্ছু বুঝতে হবে না, বাড়ি গিয়ে টাঙ্গি বল্লম নিয়ে এস। মাথাই থাকবে না বলেছে সাঁই, প্রাণ থাকবে না তো বলে নি।

কেতু বললে, বল্লম টাঙ্গি সঙ্গেই আছে। তবে বাড়িতে খবরটা দিয়ে যাই।

পাশের একজনকে ডেকে কেতু তার বাড়িতে পাঠালে। বললে, মহেশ, বউকে বলবি, চাল যেন নেয় না হাঁড়িতে, বাঘের হাতে ধর মারাই পড়ি। বেঁচে জীয়ে ফিরি তো তখন রাঁধলেই হবে। আমাকে বুঝিয়ে বললে, পুবদেশী মেয়ে কিনা, ওইটেই ভাল বোঝে।

আমি বললাম, আর দেরি নয়, চল, 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়া যাক।

বেরিয়ে তো পড়লাম। আমি, কেতু, স্টীমার-কোম্পানির দুই সায়েব, আর শ-খানেক বীটার। পায়ের দাগ ধরে ধরে বনের মধ্যে ভাঙা গাছপালার চিহ্ন দেখে ঘুরে ঘুরে বাঘের খোঁজ করতে লাগলাম, বাঘ আর পাই না। সকালবেলা বেরিয়েছি, দুপুর হেলে যায়, তবু বাঘ বেরোয় না। সায়েবরা বললে, চৌধুরী, বাঘ নেই, তোমার নাম শুনেই পালিয়েছে। চল, এবার ফেরা যাক। আসল কথা ব্যাটাদের খিদে পেয়েছে।

আমি বললাম, সায়েব, ফিরতে হয় তোমরা ফেরো, আমি বাঘ না মেরে ফিরব না। কেতুও আমার কথাতে সায় দিলে। অগত্যা সায়েবরা মুখ চুন করে রইল, ফেরার নাম আর করলে না।

ঘুরতে ঘুরতে আর বন ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে বেলা যখন প্রায় তিনটে হবে, তখন বাঘের দেখা পেলাম।

কেতু সকলের আগে আগে যাচ্ছিল, তার হাতে বল্লম। তার একটু পেছনে ছিলাম আমি আর সায়েব দু'টো। আর একটু পেছনে একদল শিকারী। সামনে একটা ছোট্ট ঝোপ, উঁচু নয়, কিন্তু পাতায় লতায় ঠাসা। অতটুকু ঝোপের মধ্যে বাঘ বসে আছে, কেউ ভাবে নি। কেতুও না। তায় আবার হাওয়া বইছিল আমাদের পেছন থেকে, বাঘের গায়ের গন্ধও আমরা পাই নি। ঝোপটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কেতুর হঠাৎ কি খেয়াল হল, হাতের বল্লম দিয়ে দিলে ঝোপের মধ্যে এক খোঁচা। বাস, আর যায় কোথা! ঘাঁক ক'রে বাঘ লাফিয়ে উঠে দু'হাতে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলে। কেতু প্রথমটা ভড়কে গেল, বল্লম হাত থেকে প'ড়ে গেল। কিন্তু ধন্য সাহস, সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে এক হাঁক দিলে, খবরদার!

মনে হল, বাঘের গর্জনের চাইতেও আকাশ-ফাটা গর্জন কেতুর। তারপরই দেখলাম দুজনে জড়াজড়ি করে মাটিতে গড়াচ্ছে। কেতু দু'হাতে বাঘকে জড়িয়ে ধরেছে।

আমার পেছনে সায়েব দু'টো ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। আমি বন্দুক তুললাম। কিন্তু গুলি ছুঁড়লে কেতুকে লাগবার ভয়।

কেতু চেঁচিয়ে বললে, হুজুর, গুলি করুন, দেরি করবেন না। ব্যাটার গায়ে বেজায় জোর, ধরে রাখতে পারছি না।

আমি বললাম, তোমার গায়ে লাগবে। তুমি এক কাজ কর। আমরা চট ক'রে খানিকটা পিছিয়ে যাই, তারপর তুমি বাঘকে ছেড়ে দাও। আমাদের তাড়া ক'রে খোলা জায়গায় এলেই গুলি করব।

কেতু বললে, অত সময় নেই, আপনি গুলি করুন। আমার জন্যে ভাববেন না, আমার কম্ম এমনিই হ'য়ে গেছে। মাথাটাকে সাবড়ে দিয়েছে একেবারে।

বলতে বলতেই হঠাৎ ধস্তাধস্তি থেমে গেল। লম্বা ঘাসের মধ্যে দুজনে গড়াচ্ছিল ব'লে আমরা স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। এইবার হঠাং ঘাসবনের ওপরে বাঘের মাথাটা জেগে উঠল। কেতু নীচেয় পড়েছে, বাঘ তার ওপর চেপে ব'সে আমাদের দিকে দেখছে। আর দেরি নয়। বন্দুক তুলে বসালাম মাথা সই ক'রে এক গুলি। গুলি খেয়ে বাঘ ভয়ানক গর্জন ক'রে লাফ দিলে, আমি সেই লাফের ওপরই আর এক গুলি বসালাম। সায়েবরাও গুলি ছুঁড়লে।

বাঘ মাটিতে পড়ল, কেতু আর আমাদের মাঝখানটায় খোলা জমিতে। প'ড়ে আর উঠতে পারলে না, শুয়েই ছটফট করতে লাগল। তখন আরও গোটা দুই গুলি বসিয়ে তাকে ঠাণ্ডা ক'রে দিলাম।

বাঘটাকে মেপে দেখেছিলাম, ল্যাজসুদ্ধ্ চোদ্দ হাত। এতবড় বাঘ আমি আর কখনও দেখি নি।

আমরা বলিলাম, আর কেতুর কি হ'ল ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বলছি সবই। কেতু ভেবেছিলাম ম'রেই গেছে। তারপর কাছে গিয়ে দেখলাম, মরে নি, অজ্ঞান হয়ে আছে।

কিন্তু সে মরারই দাখিল। আমাকে বলেছিল, মাথাটা সাবড়ে দিয়েছে ; দেখলাম, একটুও মিথ্যে বলে নি। ধস্তাধস্তির মধ্যে কোন্

ফাঁকে বাঘ তাকে এক মোক্ষম থাবা বসিয়েছে, থাবার চোটে তার মাথার খুলি দুই কানের বরাবর ফেটে চৌচির হ'য়ে গিয়ে মাথার ওপরদিককার খাপড়াটা একেবারে উড়ে চলে গেছে।

সায়েবদের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডির বোতল ছিল। তাই খাইয়ে তাকে একটু তাজা করলাম। তারপর সেই অবস্থায়ই তাকে তুলে নিয়ে স্টেশনে ফিরে এলাম।

তখন আমাদের যা অবস্থা, বুঝতেই পার। বনের মধ্যে না আছে ডাক্তার, না আছে ওষুধপত্তর, সম্বলের মধ্যে ক' শিশি টিংচার আইডিন, আর সায়েবদের বোতলে ব্র্যাণ্ডি। তাই একটু একটু দিয়ে তাকে জীইয়ে রাখতে লাগলাম। মাথার খাপড়া উড়ে গেলেও, কি ভাগ্যিস ঘিলুটায় চোট লাগে নি। ঘিলুর ওপরে এক টুকরো কচি কলাপাতা বিছিয়ে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলাম।

সায়েবরা স্টোভ জ্বেলে চা আর হালুয়া করতে বসল।

ঘণ্টাখানেক পরে কেতুর জ্ঞান হ'ল। কাঠপ্রাণ একেই বলে। চোখ চেয়ে প্রথম কথাই বললে, বাঘ মরেছে?

বললাম, মরেছে। উঠো না, শুয়ে থাক।

কেতু বললে, মাথাটার দশা কি? আছে, না গেছে?

বললাম, ভেতরটা আছে। বাইরেটা নেই।

কেতু যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে বললে, সাঁই তখুনি বলেছিল।— বলে খানিকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে আবার চোখ খুলে বললে, মহেশ কই? বউকে বলে এসেছে?

আমি বললাম, মহেশ তো যায় নি।

কেতু চমকে উঠে বললে, সর্বনাশ!—ব'লে উঠে বসতে গেল। আমরা ধরে রাখলাম। কিন্তু রাখা কি যায়। কেতু আমার দিকে চেয়ে বললে, মাথায় একটা পাগড়ি বেঁধে দিন তো ঠেসে। টনটন করছে। দিন, তারপর বাড়ি যাই।

আমরা বললাম, এখন বাড়ি যায় না। মাথার খুলি নেই, যাবে

কি করে? রোদের ঝাঁজে ঘিলু গ'লে যাবে।

কেতু বললে, যায় যাবে। ওদিকে কোন্ কেলেঙ্কারি বেধে বসে আছে, তার ঠিক নেই। একে এই বেলা, তায় ভাত রেঁধে রেখেছে। এখন কি ঘিলু সামলাবার সময়?

সে এক যুদ্ধু! আমরাও তাকে উঠতে দেব না, সেও যাবেই। শেষ পর্যন্ত সে ক্ষেপে গেল। বললে, খুলি নেই খুলি নেই তো সেই থেকেই শুনছি। তার করছেন কে কি? খুলি তো আর চামড়া নয় যে ফের গজাবে।

আমি দেখলাম, বিপদ। এই অবস্থায় যদি মেজাজ গরম ক'রে মাথায় রক্ত চড়িয়ে বসে, তবে আর রক্ষে নেই! বললাম, দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।

আমার মাথাটার এই একটা মজা দেখেছি, বিপাকে পড়লেই আমার চমৎকার বুদ্ধি গজায়। কি উপায় করি, ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বারান্দায় এলাম। বারান্দায় বেরুতে চোখে পড়ল, ঘরের পাশে ক'টা নারকোলের গাছ। বাস্, আর আমাকে পায় কে। একটা বীটারকে বললাম, গাছে ওঠ। বেশ কচি আর বড় দেখে ডাব পাড়বি এক কাঁদি।

ডাব পাড়া হ'ল। একটা ডাব কেটে তার মালার আধখানাকে চেঁছে ঠিক ক'রে নিয়ে কেতুর মাথায় বসিয়ে দিলাম, দিব্যি কাপেকাপ বসে গেল। সায়েবদের সঙ্গে সুজি ছিল, ভিজিয়ে রোলাম করে কেতুর নতুন খুলি জুড়ে দিলাম, মাথা বেমালুম আস্ত হয়ে গেল। বুনো জাত কিনা, একটুখানি ওষুধপত্তর পড়লেই অদ্ভুত রকম কাজ দেয়।

কেতু উঠে বসল। তারপর দাঁড়ালে। তারপর বললে, এবার বাড়ি যাই।

তার সঙ্গে দু'জন লোক দিয়ে দিলাম, বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে। তাকে বলে দিলাম, এখন কিছুদিন মাথা গরম করবি না। বউ ঝগড়া করলেও সয়ে যাবি। রোদে বেরোবি না। আর রোজ বেশ করে

সরষের তেল মাথায় মাখাবি। তেলে পেকে খোলা পোক্ত হয়ে যাবে।

ঠিক তাই হ'ল। এর বছর দুই পরে কেতুর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। দেখলাম, তেল-চুকচুকে টাকটি গামছা ঢাকা দিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেমন আছ? শুধোতে হেসে বললে, বেশ আছি। টাক হয়ে বরং ভালই হয়েছে, উকুনে খায় না। তেলও কম লাগে। ওঃ, সে যা তার টাক, যদি দেখতিস! আমার টাক কোথায় লাগে তার কাছে! যেন তাজমহলের গম্বুজ, অবশ্যি কালো রঙের।

আমরা বলিলাম, কিন্তু টাক হয়ে রইল বেচারীর! কেশরঞ্জন মাখিয়ে দেখলে হ'ত না?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বলেছিলাম। মেখেওছিল দিনকতক। তা, গজাল গুচ্ছের নারকোলের আঁশ। তাই শেষটা কেতু আর মাখে নি। বলেছে, থাক্, আমার টাকই ভাল।

সাপের ছোবল

সাপ ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন : সাপ আর তোমরা কি দেখেছ ! সাপের রাজা হচ্ছে অহিরাজ, যার নাম শঙ্খচূড়। ইংরেজীতে বলে, কিং কোবরা। সার্থক নাম। বারো হাত অবধি লম্বা হয়, ফণা তুলে দাঁড়ালে মানুষ-প্রমাণ উঁচু। গায়ে জোরও তেমনই, তিন মাস বয়সের ছাগল-ভেড়ার বাচ্চাকে মুখে নিয়ে অক্লেশে ছুটে চ'লে যায়। আর বিষের তো কথাই নেই। কেউটেকে লোকে বিষাক্ত বলে জানে, কেউটের বিষের সাতগুণ জোরালো হচ্ছে শঙ্খচূড়ের বিষ। যাকে কামড়ায়, বিষের তেজে তার মাথার দু-পাশে কপাটির হাড় দুমড়ে কুঁচকে যায়, তাই থেকে ওর নাম শঙ্খচূড়। কপাটির হাড়কে সংস্কৃতে শঙ্খ বলে কিনা। সাপের রাজা সাপ, ও তোমার গে কেউটে বল, করাত বল, মাম্বা বল, র‍্যাটলস্নেক বল, শঙ্খচূড়ের কাছে কেউ নয়।

আমরা বলিলাম, আপনি দেখেছেন সে সাপ ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, দেখি নি তো কি শোনা কথা বলছি ? শোনা কথা আমি বলি না। দেখেছি, শিকার করেছি, তার কামড় খেয়েছি। সেই গল্পই আজ বলব।

অনেকদিনের কথা। তখন মোটে শিকার করতে শিখেছি। বাঘ-ভালুক তখনও মারিনি। তখন ফাঁক পেলে বনে যাই, শেয়াল শূয়োর হরিণ মেরে হাতের নিশানা ঠিক করি। আমার এক বন্ধু ছিল চিদম্বরম। কলকাতায় আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। চিদম্বরম মাদ্রাজী বামুন। ব্যাঙ্গালোরে তাদের কাঠের কারবার ছিল। সেবার চিদম্বরম আমাকে নেমন্তন্ন করলে তাদের ওখানে বেড়াতে যেতে,

চিদম্বরমের বোনের বিয়ে। কলেজে তখন গ্রীষ্মের ছুটি। গেলাম।

বিয়ে-টিয়ে হ'য়ে গেল। কিন্তু চিদম্বরমের মা আমাকে ছাড়তে চান না। বড় ভাল লোক ছিলেন তিনি। চমৎকার ইংরেজী কথাবার্তা জানতেন, ওটা সব মাদ্রাজীই শেখে। আর হিন্দীও জানতেন বেশ। তিনি বললেন, তোমার তো তাড়া কিছু নেই, এ'লে তো ক'টা দিন থেকে যাও। আর তো আসবে না। সে এক মহা মুশকিল। আমার মন ছটফট করছে বাড়ি ফেরার জন্যে, বাড়ি ফিরে আমি আসামের এক বন্ধুর ওখানে যাব, হরিণ মারতে যাবার নেমন্তন্ন। অথচ ওরা না ছাড়লে জোর করেই বা চলে আসি কি করে। যাক, কায়ক্লেশে চোখমুখ বুজে গোটাকতক দিন কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে এক ব্যাপার ঘ'টে গেল।

চিদম্বরমের মা লক্ষ্য করেছিলেন, আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। একদিন তাই নিয়ে তিনি কথায় কথায় আমাকে একটু ঠাট্টা করলেন, মাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয়, না? এখানে আমরা সব বিদেশী পর, কি দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখব বল!

আমি বললাম, তা নয়, মা আমার নেই।

তিনি বললেন, তবে?

তখন তাঁকে বললাম আমার নেমন্তন্নের কথা। সারা বছর তো কলকাতায় কলেজের বই নিয়ে পড়ে থাকি। ছুটি-ছাটায়ও যদি একটু ডাংপিটেপনা না করতে পারি, তবে প্রাণ বাঁচে কিসে?

তিনি শুনে হেসে বললেন, এই কথা! তা সেজন্যে তোমার আসাম ছোটবার কি দরকার? হরিণ মারতে চাও, আমাদেরই তো কত ইজারা বন রয়েছে। মার না হরিণ যত পার।

আমি বললাম, সত্যি আছে?

চিদম্বরম বললে, চল, কালই দেখবে, সত্যি কি না। অবিশ্যি এখানে আসামের মত প্রকাণ্ড হরিণ পাবে না। নীলগাই বা অ্যাণ্টেলোপ এখানে নেই। কিন্তু রকম-ফের অনেক পাবে, চিতাহরিণ,

কৃষ্ণসার, ওয়াটার ডিয়ার।

পরদিন ভোর না হ'তে দু'জনে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চিদম্বরম নিলে তার বাবার ভারী বন্দুক, আর আমার জন্যে এল পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোকের একটি হালকা রাইফল। সাইক্লে বন্দুক ঝুলিয়ে নিয়ে দু'জনে চললাম, সঙ্গে একজন আরদালী। হরিণ মারতে গেলে অল্প লোক যাওয়াই সুবিধে, ভিড় ক'রে গেলে হরিণ পালিয়ে যায়।

শহর ছেড়ে অনেক দূর গিয়ে তাদের বাগান। বনের মধ্যে যদ্দুর সাইক্ল চলে, গিয়ে আমরা সাইক্ল রেখে বন্দুক নিয়ে বনে ঢুকলাম। আরদালীটা রইল সাইক্লের পাহারায়।

বনের মধ্যে দু'জনে ঘুরছি, এটা সেটা দেখছি, মাঝে মাঝে গুলিও ছুঁড়ছি। আমি একটা চিতাহরিণ মারলাম। বেশি বড় নয়, কিন্তু ভারি নধরকান্তি হরিণটা। চিদম্বরম মারলে দুটো ময়ূর। ময়ূরের মাংস খেতে চমৎকার, সেটা বোধ হয় জান।

বেলা তখন দশটা। চিদম্বরম বললে, এস, ফেরা যাক। বাড়ি পৌঁছতে বারোটা বাজবে।

ময়ূর আর হরিণ ঘাড়ে করে দু'জনে চলেছি। কাঁধে স্ট্র্যাপে বন্দুক ঝুলছে। যে পথে এসেছিলাম, ফেরার সময় চিদম্বরম সে পথে না গিয়ে বনের মধ্যে অন্য পথ ধরলে। বললে, পথ কম, যদিও একটু ঝোপঝাড় ভাঙতে হবে।

যেখানটাতে আমরা সাইক্ল রেখে গিয়েছিলাম সেখানে পৌঁছতে আর সামান্যই বাকি, তখন এক কাণ্ড ঘটল। চিদম্বরম আগে আগে পথ খুঁজে খুঁজে যাচ্ছিল। পেছনে আমি হরিণ ঘাড়ে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছি। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল ডান দিকে একটা ঝোপের দিকে। আমরা যেখানে, ঝোপটা তার থেকে জোর ত্রিশ হাত। ঠিক তার বাইরে আমাদের দিকে পেছন আর ঝোপের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি চিতাহরিণের ছানা।

দেখেই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। চিদম্বরমও থামল। এত কাছে এমন সুন্দর একটি হরিণ, একে না মেরে যাওয়া যায় না।

চিদম্বরম বললে, আমি মারি।

আমি বললাম, তাহলে আমার বন্দুকটা নাও। তোমার হাতিমারা বন্দুকের গুলি লাগলে ও হরিণ একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

হরিণ ময়ূর মাটিতে নামিয়ে দু'জনে দাঁড়ালাম। চিদম্বরম বললে, দাও বন্দুক। কিন্তু চৌধুরী, একটা জিনিস বুঝছি না। বাচ্চাটা ও রকম দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? পালাচ্ছে না কেন?

কথাটা আগে আমার মনে হয় নি। এখন শুনে আমারও মনে হ'ল, সত্যিই তো! শম্বর হরিণ এমনিতেই বড্ড ভীতু, মানুষের সাড়া পেলেই টেনে ছুট লাগায়। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাওয়াই শক্ত। আর এ ব্যাটা আমাদের মোটে ত্রিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে, আমরা আসতে শব্দ-সাড়াও নেহাত কম করি নি, তবু যেন তার ভ্রূক্ষেপই নেই। কি হয়েছে ওটার?

আমি বললাম, হয়তো ওটা কালা বা কানা, আমাদের সাড়া পায় নি।

চিদম্বরম বললে, কানা হ'তে পারে না, যখন দেখা যাচ্ছে ঝোপের ভেতর তাকিয়ে রয়েছে। আর কালা হ'লেও আমাদের গন্ধ তো না পেয়ে পারে না। এর ভেতর আর কিছু আছে নিশ্চয়।

আর খানিক লক্ষ্য ক'রে দেখে চিদম্বরম বললে, হয়েছে। লক্ষ্য করেছ, এখানকার মাটিটা কেমন ভিজে-ভিজে? ওখানটায় বোধ হয় কাদা আছে, হরিণ কাদায় আটকে গেছে।

আমি বললাম, তা হলে বন্দুক রাখ, ওকে জ্যান্তই ধরে নিয়ে যাব।

বন্দুক রেখে আমি পা টিপে টিপে হরিণের পেছন দিকটায় চললাম। তার অমন নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবার কারণ কিন্তু টের পেলাম একেবারে তার পাশে গিয়ে। তার যখন একেবারে কাছে গেছি, তখনও সে মুখ ফেরাচ্ছে না দেখে আশ্চর্য লাগল। কাদায়

আটকে যেতে পারে, তাই ব'লে মানুষ কাছে এলে পালাবার চেষ্টাও করবে না কেন হরিণ? তখন তার চোখ-বরাবর ঝোপের মধ্যে চেয়ে দেখেই চমকে গেলাম। ঝোপের ভেতর থেকে একটা সাপের শুধু মাথাটা বেরিয়ে আছে। মাথাটা প্রায় আমার হাতেব মুঠোর সমান বড়; আর তার চোখ দুটো যেমন হিংস্র, তেমনই উজ্জ্বল। সেই দুটি চোখ হরিণবাচ্চার দিকে চেয়ে স্থির হ'য়ে আছে; আর সেই দৃষ্টির সঙ্গে চোখ মিলিয়ে হরিণবাচ্চা একেবারে অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাপার বুঝতে দেবি হ'ল না। অজগববা এইভাবে সম্মোহিত করে জানোয়ার ধবে খায়—বইয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমার কি খেয়াল হ'ল, হরিণটাকে বাঁচাতে হবে। মনে হ'তেই চেঁচিয়ে বললাম, চিদম্বরম, হুঁশিয়ার, অজগর! সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে তার পেছনের ঠ্যাং ধরে হরিণবাচ্চাকে প্রাণপণ জোরে এক পাশে ছুঁড়ে দিলাম, সেটা দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। আর নিজেও এক লাফে যতটা সম্ভব পেছন দিকে সবে গেলাম। কিন্তু ত'রপরই যা কাণ্ড হল, ভাবতে আমার এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।

হিস্-বুঁ করে একটা তীক্ষ্ণ গর্জন কানে এল, যেন মস্তবড় একটা লাট্টুর ডাক। তাবপরই ঝোপেব ভেতর যাকে অজগর ভেবেছিলাম, সেই ভয়ানক সাপ লাফিয়ে ঝোপের বাইরে এসে ফণা তুললে। আমার তখন ভাববারও সময় নেই। এক পলকের জন্যে চেয়ে দেখলাম, আমার হাত-পাঁচেক মাত্র সামনে সেই দানব সাপ ফণা তুলে আমার মাথা-সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। গোখরোকে দেখেছি, ফণা তুলে দুলতে থাকে। এ সাপ দুললে না, সোজা খাড়া হয়ে রইল এক সেকেণ্ড কি দু' সেকেণ্ড। তারপরই হিস্ করে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোবল মারলে। আমি তখন পেছন দিকে আর একটা লাফ মারতে যাচ্ছি, সে লাফ আর মারা হ'ল না। সাপের ছোবল এসে আমার পায়ের ওপর পড়ল। টের পেলাম, যেন দুটো হিম বরফের শলা আমার পায়ের পাতা ফুঁড়ে ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই

সেহ ছোবলের ধাক্কায় আমি পাক খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। পড়তে পড়তে কানে এল চিদম্বরমের ডাক, হুঁশিয়ার! তারপর দুম করে বন্দুকের শব্দ।

ব্যাপারটাকে ঠিক ব'লে বোঝানো যায় না, হঠাৎ আমার মনে কি রকম একটা আক্রোশের ভাব এল। আমাকে তো ছুবলেছেই, ব্যাটা সাপকে কেন ছেড়ে কথা কইব! এর পরে যা করলাম, তা আমি স্ব-ইচ্ছেয় করি নি, যেন আমার হাত ধবে আর কেউ করিয়ে নিলে। পায়ে ছোবল লাগতে আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপরই দেখলাম, আমি লাফিয়ে উঠে বসেছি, আর দুই হাতে আমার পায়ের পাতা আর সাপের মাথা একসঙ্গে ঠেসে চেপে ধরেছি। কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও অসম্ভব কিছু হয় নি। তখন তো আর ভাববার সময় ছিল না, ব্যাপারটা যা হয়েছিল পরে বুঝলাম।

জুতো ফুঁড়ে পা ফুঁড়ে পায়ের ভেতব বিষদাঁত ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গেছি, সেই গড়াবার ফলে সাপের মাথা কাত হয়ে মাটিতে চেপে গেছে। তাই আর সে ছোবল মেরেই মাথা তুলে নিতে পারে নি, সাপের মাথা আমার পায়ের সঙ্গে আটকে রয়েছে। আমি প্রাণপণ ক'রে মাথা চেপে রাখলাম, ওদিকে চিদম্বরম আর একটা গুলি ছুঁড়ে ছুটে কাছে এল। টিপের বাহাদুরি বলতে হবে, সাপ আর নড়াচড়া করলে না, গুলির চোটে তার ধড় প্রায় দু' খণ্ড হয়ে গেছে। নইলে ওই সাপ একবার মোচড় কষাতে পারলে আর তাকে চেপে রাখা আমার সাধ্য হ'ত না।

চিদম্বরম আমার পা-টাকে উল্টে-পাল্টে দেখলে। তারপর হঠাৎ আমার পিঠে এক চাপড় মেরে বললে, সাবাস! একেই বলে—মির‍্যাক্‌ল।

আমি বললাম, ধর তো ভাই, মাথাটাকে পা থেকে আলগা করে দাও। বড্ড টনটন করছে।

চিদম্বরম বললে, খবরদার, অমন কাজও ক'রো না। ভাগ্যের

জোরে বেঁচে গেছ, নইলে এতক্ষণ হ'য়ে যেতে।

আমি বললাম, কিন্তু অজগর ছোবল মারে এটা এই প্রথম দেখলাম। ব্যাটার বোধ হয় ক্ষিধেটা বেজায় লেগেছিল, তাই রাগও চড়ে গিয়েছিল।

চিদম্বরম বললে, আ কপাল, অজগর বলছ তুমি কাকে? এ তোমাদের কেউটের বাবা, এর নাম শঙ্খচূড়। আমরা বলি হামাড্রায়াদ।

আমি শিউরে উঠে বললাম, এই! কিন্তু তা হলে এতক্ষণ বেঁচে রইলাম কি করে?

চিদম্বরম বললে, তাই তো বললাম—মির‍্যাক্‌ল। যাক, সে কথা তোমাকে পরে বুঝিয়ে দোব, এখন আগে তোমাকে বাঁচিয়ে নিই। পা নেড়ো না।

আমি ঠায় বসে রইলাম, চিদম্বরমের কথামত সাপের মাথাটাকে পায়ের ওপর ঠেসে ধ'রে রেখে। চিদম্বরম্ বেল্ট থেকে ছোরা বার করলে, মাথা থেকে কয়েক আঙুল পেছনে সাপের গলাটাকে পেঁচিয়ে কাটলে, তারপর শার্ট ছিঁড়ে সাপের মাথা আর পা সুদ্ধু ক'ষে জড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে। বেঁধে আরদালীকে ডেকে দু'জনে কাঁধে ক'রে আমাকে নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এল। তারপর গাড়ি ডেকে বাড়িতে। শিকারের ময়ূর আর হরিণ সেই বনের ভেতরই পড়ে রইল। বাড়ি এসে চিদম্বরম, তার দাদা ছিলেন ডাক্তার, তাঁকে নিয়ে আমার ডাক্তারি করতে বসল। ডাক্তারি না বলে তাকে মিস্ত্রিগিরি বললেই ঠিক হয়। ল্যান্সেট দিয়ে শেলাই কেটে আগে সে জুতোর তলাটা খসিয়ে ফেললে। তখন দেখলাম, সাপের চার ইঞ্চি লম্বা মোক্ষম বিষদাঁত আমার পা ফুঁড়ে জুতোর তলা ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে।

তিরিশ টাকা দামের বিলিতী হান্টিং বুট, তলা তার পেটা লোহার মত শক্ত।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এতই জোর ছিল এর ছোবলে ?

চিদম্বরম বললে, এই জোর ছিল বলেই আজ বেঁচে গেলে। একেই আমি তখন বলেছিলাম—মির‍্যাক্‌ল। কি হয়েছে জান ? বিষদাঁতের আগা জুতোর তলা অবধি ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। তাই দাঁতের ছ্যাঁদা দিয়ে যে বিষ সাপ ঢেলেছিল, তাও সবই বাইরে ছিটকে পড়েছে, রক্তে মিশতে পারে নি। তা নইলে হামাড্রায়াদের বিষে মানুষ বাঁচে জোর তিন মিনিট।

আধ ঘণ্টা ধরে সে কি কসরৎ! ওযুধের গামলার ওপর পাটাকে ঝুলিয়ে সাপের মাথাটাকে নেড়েচেড়ে টিপেটুপে সবটুকু বিষ বার করে ফেলা হল, দাঁতের গোড়ার হাড়টাকে করাত দিয়ে কেটে দাঁত আলগা ক'রে নিয়ে, দাঁতের ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে ওযুধজলের পিচকিরি চালিয়ে সব বিষ ধুয়ে ফেলে, দাঁতের ছ্যাঁদায় তুলো গুঁজে, তবে সেই দাঁত পা থেকে টেনে খোলা হল। খুলতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত। চিদম্বরমের দাদা বললেন, রক্তটা বেরিয়ে গিয়ে ভালই হয়েছে, ঘা সেপটিক হবার ভয় রইল না।

পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে চিৎ হয়ে রইলাম, পাক্কা বাইশটি দিন লাগল সেই ঘা শুকোতে।

চিদম্বরম না থাকলে আব সে যাত্রা বাঁচতে হত না।

ভালুকের আলিঙ্গন

কান্তি চৌধুরী বললেন :

সোঁদরবনের বাঘ, আসামের হাতি, আর ভালুক দেখতে চাও তো যাবে নেপালের তরাইয়ে। মধুপুরের ভালুক দেখেছি, আসামের ভালুক মেরেছি, সি. পি. তে ভালুক শিকার করেছি, কিন্তু নেপাল-তরাইয়ের মত জবর ভালুক কোথাও দেখি নি। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনই হিংস্র। একবার তার হাতে প'ড়ে মরতে মরতে আশ্চর্য রকমে বেঁচে গিয়েছিলাম। ঠিক সময়টি বুঝে মাথায় একটা অদ্ভুত বুদ্ধি গজিয়ে গিয়েছিল ব'লে তাই রক্ষে, নইলে আর এখন তোমাদের কাছে ব'সে গল্প বলতে হ'ত না। সেই গল্প বলি, শোন।

আমার মেজকাকা নেপালে ডাক্তারি করতেন। তখন নেপালে বাঙালীদের বড় মান। চাকরি করতে হোক, ব্যবসা করতে হোক, যাঁরাই নেপালে যেতেন, একেবারে লাল হয়ে ফিরতেন। মেজকাকাও লাল হয়েছিলেন।

কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখনও তিনি পুরোপুরি লাল হন নি, সদ্য লালচে হযে উঠেছেন। মানে টাকা পয়সা পেতে শুরু করেছেন। কাটমাণ্ডু থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে যুধাপুর বলে একটা জায়গায় তিনি তখন ডাক্তারি করতেন।

আমার তখন বছর ত্রিশ বত্রিশ বয়স হবে। ক' বছর হ'ল চাকরিতে ঢুকেছি। চাকরি করি, আর ছুটি পেলেই টেনে বাইরে দৌড় মারি। এর মধ্যেই একবার মেজকাকাব চিঠি পেয়ে নেপালে গিয়ে হাজির হলাম।

সেখানে গিয়ে দেখলাম, জায়গাটা ভারি মনোরম। গরমের দিন,

কিন্তু পাহাড়ের ওপর বলে বেশ একটু শীত আছে। জায়গাটা আধা শহর আধা গ্রাম, চারিদিকে পাহাড় আর বন, দেখবার মত সীনারি। মেজকাকা তখনও পরিবার নিয়ে যান নি, শহরের প্রায় বাইরে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটা বাংলো মতন বাড়ি, এক নেপালী চাকরকে নিয়ে সেই বাড়িতে তিনি থাকেন। চাকর কাজকর্ম রান্নাবান্না করে, মেজকাকা রুগী দেখে বেড়ান, রুগী না থাকলে বেড়িয়ে বেড়ান। সত্যি, অমন সুন্দর জায়গায়, হাতে কাজ না থাকলে ঘরে বসে থাকাই পাপ।

আমিও গিয়েই বেড়াতে শুরু করলাম। খুব ভোরবেলায় উঠে বেরিয়ে যেতাম। কোন দিন একলা, কোন দিন বা সঙ্গী জুটত। সামনাসামনি যে-কোন একটা রাস্তা ধ'রে সোজা চ'লে যেতাম, দু' মাইল তিন মাইল গিয়ে আবার ফিরে আসতাম। এসে মুখ টুথ ধুয়ে চান করতাম, তাইতেই বেলা দশটা বেজে যেত। পাহাড়ী রাস্তা তো, তাড়াতাড়ি চলা যায় না।

নেপালের ওপর দিকে বাঘ আছে শুনেছি। ওখানে দেখি নি। বাঘ বোধ হয় আরও ওপরে থাকে, আরও গভীর জঙ্গলে। ওখানটাতে ছিল ভালুক। মাঝে মাঝে পাহাড়ীরা ইয়া বড় বড় ভ'লুক মেরে নিয়ে আসত। মেজকাকা আমাকে প্রথম দিনই সাবধান করে দিয়েছিলেন, একা একা যেন বনের মধ্যে না ঢুকি। আমি তাই বনের মধ্যে যেতে হলে প্রায়ই কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম। তার আরও একটা কারণ ছিল, পথ হারাবার ভয়। বনের মধ্যে অনেক জায়গাই দেখতে এক রকম, পথ ভুল করবার সম্ভাবনা থাকে।

ওখানে যাবার দিনকয়েক পরে একদিন এক পাহাড়ী জিনিসপত্র বেচতে এল ; তার কাছে একটা খুব সুন্দর ভোজালি পেয়ে আমি সেটা কিনে ফেললাম। বনে-বাদাড়ে ঘুরতে একটা অস্ত্র হাতে থাকা ভাল, আর কিছু না হোক, তাতে মনে ভরসা থাকে। আমি তাই রোজ বেরুবার সময় ভোজালিটাকে বেল্টে ঝুলিয়ে নিতাম। কোন দিন সেটা কাজে আসবে ভাবি নি। ভোজালি নিয়ে বেড়াতে যাবার মধ্যে



যে থিয়েটারী ছেলেমানুষি থাকে, তাই নিয়ে মেজকাকা আমাকে ঠাট্টাও করতেন। একদিন কিন্তু সেই ভোজালিই কাজে লেগে গেল। এমন ক'রে, যে সেটা হাতে না থাকলে সেইদিনই আমার জীবনের ইতি হ'য়ে যেত।

সেদিন সকালবেলা বে'রিয়ে মাইল চারেক হেঁটে এসেছি। আগের রাত্রে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, বেশ একটু শীত-শীত করছে। বেলা দশটা বাজে। কিন্তু আকাশে মেঘ, জলো হাওয়া, গায়ের জামা খুলতে ইচ্ছে করছে না। আমার পরনে বুট-পট্টি, প্যাণ্ট, শার্ট, বেল্টে ভোজালি। একেবারে নাইতে যাবার আগেই জামা খুলব বলে আমি কাপড় না ছেড়েই দাড়ি কামাতে বসলাম। ভোজালি সুদ্ধ বেল্টটাও পরাই রইল, সেটা অনেকটা মনের ভুলে।

কামাতে ব'সেই মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেল। মুখে সাবান-টাবান ঘষে ক্ষুর খুলতে গিয়ে দেখি, তার ব্লেডখানা উধাও হয়েছে। দেখেই মনে হ'ল, নিশ্চয় থাপার কম্ম। থাপা মামার ভৃত্যটির নাম। ক্ষুরের ব্লেডের ওপর তার ভযানক লোভ, পেলেই চুরি করে—এ খবরটা মামাই আমাকে ব'লে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে না ব'লে-ক'য়ে ক্ষুরের বাক্স থেকে ব্লেড বার ক'রে নিয়ে যাবে, আর আমি কাজের সময় একমুখ সাবান মেখে ছুঁচো সেজে বাড়িময় হাতড়ে মরব, এ সওয়া যায় না। রেগে এক হাঁক দিলাম, থাপা। কোথায় থাপা, তার সাড়াই নেই। অথচ দু' মিনিট আগে সে আমাকে কামাবার জন্যে গরম জল দিয়ে গেছে। উঠে গিয়ে রান্নাঘরে উঁকি মারলাম, সেখানেও থাপা নেই। অগত্যা রাগে গরগর করতে করতে এসে বাক্স খুলে নতুন ব্লেড বার করলাম। ক্ষুরে ব্লেড ফিট ক'রে মুখে ব্রাশ ঘ'ষে ক্ষুর হাতে নিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ ঘরের পেছন দিকে বিকট এক চীৎকার —আ আ আ—মেরা জান বাঁচাও!

এমন ভীষণ সে চীৎকার, শুনে লাফিয়ে উঠলাম, তারপর ক্ষুর হাতে ক'রেই ছুটে বাংলোর পেছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

প্রথমটা কিছুই দেখতে পাই না। কে চ্যাঁচালে? চীৎকার করে বললাম, কে? উত্তর নেই। আরও একটু দাঁড়িয়ে শেষে ভাবলাম, কিছু নয়, কোন দুষ্ট লোকের নষ্টামি। ফিরে ঘরে ঢুকতে যাব, এমন সময় আবার সেই চীৎকার কানে এল। এবার অনেক আস্তে, যেন যে চীৎকার করছে তার শক্তি কমে এসেছে।

এবার জায়গাটা ঠাওর হল। ঘরের পেছনে হাত পঞ্চাশ দূরেই একটা বাগান, ছোট বড় নানান রকমের গাছ। তার ভেতর থেকে চীৎকারটা আসছে। কিন্তু ওখান থেকে অমন চীৎকার কে করে? তবে কি পাহাড়ী ডাকাত কাউকে ওখানে খুন করছে? বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটলাম, সেই অবস্থায়ই। বাগানের ভেতর ঢুকতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, দেখেই চক্ষুস্থির। একটু আগে একটা বড় বাদাম-গাছ, তার তলাটায় দাঁড়িয়ে থাপা আর এক বিরাট-আকৃতি ভালুকে লড়াই চলেছে। লড়াই তাকে ঠিক বলা যায় না, কারণ ব্যাপারটা একতরফা। থাপা প্রায় অজ্ঞান, ভালুক দাঁড়িয়ে উঠে দু' হাতে থাপাকে জড়িয়ে বুকে চেপে ধ'রে চাপ দিচ্ছে। জান বোধ হয়, ভালুকেরা ওই রকম করেই মানুষ মারে, চাপের চোটে দম বন্ধ হ'য়ে পাঁজরা চুরমার হ'য়ে মানুষ অক্কা পায়। ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন আর কি! থাপার তখন শেষ অবস্থা। লড়বার মত তার শক্তি নেই, বোধ হয় চেতনাও নেই, অসাড় হ'য়ে সে ভালুকের দুই হাতে ঝুলছে।

দেখে প্রথমটা থ হ'য়ে গেলাম। না হোক শহর, বনও তো নয়। দিনদুপুরে বাড়ির ওপর এসে ভালুক মানুষকে আক্রমণ করে কখনও শুনি নি। আর ভালুকও বটে। ইয়া আলিসান দেহ, কটা কটা লম্বা লোম। দেখে চিনলাম, গ্রিজলি জাতের ভালুক। ভালুকদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড় আর হিংস্র জাত।

আমার মাথার মধ্যে তখন বিদ্যুতের মত বেগে চিন্তা চলছে। একবার ভাবলাম, ছুটে বন্দুক নিয়ে আসি। আবার মনে হল, আনতে আনতে থাপার কম্ম সারা হয়ে যাবে। আর কাকার যে ছোট বন্দুক,

তার এ গুলিতে ভালুকের কিছুই হবে না। কাকা শিকারী নন, নেহাৎ একটা রাখতে হয়, তাই হালকা বন্দুক রাখেন। আমি বন্দুক নিয়ে যাই নি। কি করি, ভেবে কূল পাই না। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতেও হ'ল না। আমাকে দেখেই ভালুক থমকে গিয়েছিল। আমি কি করব, বুদ্ধি স্থির করার আগেই সে ঘোঁত ক'রে এক গর্জন ছাড়লে, তারপর থাপাকে ছেড়ে আমার দিকে তেড়ে এল। সামনাসামনি হাতাহাতি ক'রে তার সঙ্গে পারা অসম্ভব। আমি চট করে ফিরে দৌড় লাগালাম। কিন্তু দু'পা না যেতেই ভালুক আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। তখন আর কি করি, যা থাকে কপালে—ল'ড়েই মরি, ব'লে ভোজালি খুলে ফিরে দাঁড়ালাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই ভালুক তার দুই বিশাল হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

আমাকে তো দেখছ, সাধারণ মানুষের চাইতে আমি লম্বায় একটু বেশিই। তবু ভালুক দু' পায়ে দাঁড়িয়ে আমার মাথা ছাড়িয়েও উঁচু হয়ে উঠল।

তার বিরাট দুই হাতের এক বজ্রচাপুনি খেয়েই বুঝলাম, এবার আর রক্ষা নেই; সেই আলিঙ্গন সামলাতে পারে, এত জোর মানুষের পাঁজরায় নেই। এক ভরসার মধ্যে, ভোজালি টেনে বার করার সময় আমার ডান হাতখানা উঁচু করে তুলেছিলাম, তাই ভালুক আমার বাঁ হাতসুদ্ধু বুকটাকে জড়িয়ে ধরলেও, ডান হাতখানা তার আলিঙ্গনের বাইরে রয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলাম, প্রাণ তো গেছেই, তবু যা পারি দু' ঘা মেরে নিই। সে আমাকে চেপে আমার দমবন্ধ করে ফেলবে, আর আমি ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে তাকে ঘায়েল করে ফেলব, এর মধ্যে যে আগে কাজ সারতে পারবে, তারই জিত, সেই বাঁচবে। ভরসা নেই বুঝেছিলাম, কিন্তু তখন প্রাণের মায়া বা ভয় ক'রেও লাভ নেই। মরিয়া হয়ে প্রাণপণে একটা হ্যাঁচকা দিলাম, এক সেকেণ্ডের জন্যে ভালুকের আলিঙ্গন একটু আলগা হয়ে গেল। সেই ফাঁকে আমি বাঁ হাতখানাকে দুমড়ে তুলে বুকের ওপর আড় ক'রে দিলাম। এতে

লাভ হ'ল এই, ভালুকের বুক আর আমার বুকের মাঝখানে রইল আমার হাতখানা, ফলে চাপটা সোজাসুজি আমার বুকের ওপর পড়ল না, হাতের চাড় দিয়ে তাকে একটু আলগা করে রাখতে পারলাম। কিন্তু সেভাবে আর কতক্ষণ রাখা যায়! ভালুকের চাপ একটু আলগা হ'য়েই আবার আরও জোরে চেপে বসল। আমি প্রাণপণে বাঁ হাতে তার চাপ সামলাতে সামলাতে ডান হাতে ভোজালি তুলে ভালুকের গায়ে কোপ বসালাম। এক কোপ, দু' কোপ, তিন কোপ—ও হরি, তার গায়ে কোপই বসে না। দেড় বিঘত করে লোমে তার সারা গা ঢাকা, সেই লোমে ভোজালি আটকে যায়, ভালুকের গা পর্যন্ত পৌঁছোয়ই না। ওদিকে চাপ এমন এঁটে বসেছে, বাঁ হাতে প্রাণপণ চাড় দেওয়া সত্ত্বেও আমার বুকে চাপ পড়ছে। তার ওপর ভোজালি দিয়ে কিছু করতে পারব না বুঝে আমার হঠাৎ ভয় ধরে গেল। বুক ঢিপঢিপ করছে, সারা গা বেয়ে কপাল মুখ বেয়ে ঝরঝর ক'রে ঘাম বেরুচ্ছে। ভালুকেরও পরিশ্রম হচ্ছে বুঝলাম। ফোঁস ফোঁস ক'রে তার দুর্গন্ধ নিশ্বাস আমার মুখের ওপর এসে পড়তে লাগল; তার হৃৎপিণ্ডটা দুপদুপ করে শব্দ করছে, স্পষ্ট শুনতে লাগলাম। আমার ডান পাঁজর আর তার হৃৎপিণ্ড প্রায় এক লাইনে, মনে হ'ল তার হৃৎপিণ্ডের নড়াচড়া আমার পাঁজরেই টের পাচ্ছি।

বাপ, কি ভীষণ গন্ধ তার নিশ্বাসে! সে নিশ্বাস নাকে মুখে ঢুকে আমার যেন শ্বাসরোধ হ'ল, মাথা ঘুরতে লাগল। ভোজালিসুদ্ধু ডান হাতখানা আমার পাশে ঝুলে পড়ল। পড়তেই প্যান্টের ডান পকেটে কি একটা শক্ত জিনিসের সঙ্গে ভোজালির বাঁটটা ঠুকে গিয়ে ঠক করে আওয়াজ হ'ল।

আশ্চর্য মানুষের মন! মৃত্যু তখন চোখের সামনে, অথচ আমার মনে একটু জড়তা নেই, বেশ ধীর-সুস্থে চিন্তা করে যাচ্ছি। বোধ হয় মৃত্যু নিশ্চয় জানলে আর আতঙ্ক থাকে না, যত ভয় করে আগেই। ঠক করে শব্দটা কানে যেতেই আমার মনে কি রকম একটা চিন্তা

জেগে উঠল, ওটা কি? কি রেখেছিলাম পকেটে? চাবির গোছা আমি পকেটে রাখি না। মনিব্যাগ রাখি বাঁ পকেটে। আজ পকেটে মনিব্যাগ নিই নি। আজই ভোরে প্যাণ্ট বদলেছি, পকেটে কিছু ছিল না। তবে পকেটে জিনিসটা কি? আর যাই হোক, সেটা এলই বা কোত্থেকে? এক-এক বার মন থেকে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলছি, দূর হোক ছাই, যাই থাক না, এখন আর তাতে কি আসে যায়। কিন্তু তবু চিন্তাটা যায় না, তাড়ালেও আবার এসে মন জুড়ে বসে। এমনই ক'রে মনে মনে মিনিটখানেক ধস্তাধ্বস্তি করার পরে কৌতূহলেরই জয় হ'ল, সেই সময়েও ডান হাতের আঙুল দিয়ে পকেট টিপে টিপে দেখলাম জিনিসটা কি। একটা শক্ত ছোট্ট জিনিস আঙুলে ঠেকল। ইংরেজী T-এর মত তার আকার। ডাঁটিটা সরু, গোল। মাথাটা চ্যাপ্টা।

ক্ষুর! চট ক'রে মনে প'ড়ে গেল, ক্ষুর হাতে ক'রেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তারপর ঝোঁকের মাথায় অজানতে কখন সেটাকে পকেটে পুরে হাত খালি করেছি, নিজেরই খেয়াল নেই।

কিন্তু—ক্ষুর? বিদ্যুতের মত একটা কথা মাথায় খেলে গেল। আর দেরি নয়, আর সময় নেই। ডান হাতের ভোজালি বাঁ হাতের মুঠিতে গুঁজে দিয়ে, পকেটে হাত পুরে ক্ষুরটা বার করলাম। আমার পাঁজরার পাশে, ঠিক যেখানটাতে ভালুকের হৃৎপিণ্ডটা দুপদুপ ক'রে লাফাচ্ছে, সেইখানে ক্ষুর বসিয়ে টান লাগালাম। নতুন জিলেট ব্লেড, চড়চড় ক'রে ভালুকেব বুকের চামড়া পরিষ্কার কামানো হ'য়ে গেল।

উত্তেজনায় তখন আমার হাত কাঁপছে। মনে হচ্ছে, বাঁচতেও বা পারি। ভগবান, আর একটু কালের জন্যে আমাকে শক্তি দাও, আর দু' মিনিট। এক টান, দু' টান, তিন টান। ভালুকের বুকের প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া হয়ে চামড়া কামানো হয়ে গেছে, হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপরে। চামড়ার ওপরে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আর এক টান। যথেষ্ট। ক্ষুরটা ফেলে দিয়ে বাঁ হাত থেকে ভোজালি

নিলাম। জয় মা কালী! গায়ের সবটুকু জোর একত্র ক'রে সেই কামানো জায়গায় ভোজালি বসিয়ে দিলাম, হৃৎপিণ্ডের ওপর।

ভালুক একটা আকাশ-ফাটানো চীৎকার ক'রে উঠল। তার বুক থেকে গরম রক্তের পিচকিরি এসে আমার মুখ-চোখ ছেয়ে দিলে। তারপর তার আলিঙ্গন আলগা হয়ে গেল। ধুপ করে সে মাটিতে প'ড়ে গেল। আমিও ঝোঁকের মাথায় পেছন ফিরে কয়েক পা ছুটে গেলাম, তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

জ্ঞান হ'লে দেখলাম, ঘরে শুয়ে আছি। মেজকাকা আমার মাথায় বরফ দিচ্ছেন। বললেন, লাকি বয়! বড্ড বেঁচে গেছ!

আমার কোথাও হাড় ভাঙে নি। দিনকয়েকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলাম।

থাপাকে কিন্তু বাঁচানো গেল না। তার তিনখানা পাঁজরা ভেঙে ফুসফুসের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। গ্যাংগ্রিন হয়ে সে মারা গেল কাটমাণ্ডুর হাসপাতালে।

মেজকাকা বললেন, ভালুক ওখানে থাকে না। রাত্রে সম্ভবত পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এসেছিল, ভোর হয়ে যাওয়াতে আর ফিরতে পারে নি। থাপা অমন অসময়ে বাগানে কেন গিয়েছিল কে জানে!

ক্ষুরটা আমার কাছে এখনও আছে। যার জন্যেই অমন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে আমার জীবন বেঁচেছে, তাকে কি ফেলতে পারি? যত্ন ক'রে রূপোর কেস তৈরি করিয়ে তাকে বাক্সে তুলে রেখেছি। সেটি হচ্ছে আমার পয়া ক্ষুর।

কুমীরের কীর্তি

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

কি-সব কুমীর কুমীর কর। কুমীরের তোমরা দেখেছ কি! তোমরা যা দেখ, ওকে বলে গোসাপ। এই তো কাগজে সেদিন পড়ছিলাম, আমেরিকায় না কোথায় একটা আঠারো ফুট কুমীর মেরেছে, সেই নাকি তাদের দেশের ওয়ার্লড রেকর্ড। অপরে ছোঃ! আমেরিকার সরুমুখো কুমীর, ও তো মাছখেকোর জাত, ঘড়েল।

কুমীর দেখবে তো যাও ঈস্ট-বেঙ্গলে—ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল। বোশেখ-জষ্ঠি মাসে নদীগুলো সব নতুন জলে ভ'রে ওঠে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় কুমীর। এ আলিপুরের কুমীর নয়, যার একটা মরা কাক খেলে তিন দিন আর খিদে পায় না। এ হচ্ছে জলের রাক্ষস, আসল গঙ্গাদেবীর বাহন। মেঘনা নদীতে এর বাস, সেখান থেকে অন্য সব নদীতে গিয়ে ওঠে। বাইশ হাত চব্বিশ হাত লম্বা, তেমনি বিরাট বেড়, দেখলেই পিত্তি ঠাণ্ডা। আহারও তেমনি। গরু ঘোড়া তার একবেলার জলখাবার। আমেরিকার টিকটিকিকে গিলে খেতে পারে। যেখানে হানা দেয়, নদীর দু' ধারে ত্রাহি ত্রাহি রব প'ড়ে যায়।

আমরা বলিলাম, সে কুমীর মারা যায় না?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, যাবে না কেন! জানলেই যায়। আমি একবার মেরেছিলাম। সেই গল্প বলি, শোন।

ঢাকায় নারায়ণগঞ্জের ওখানে আমার এক মাসীমা ছিলেন। একবার গরমের ছুটিতে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যাই।

ওদিকটাতে আগে কখনও যাই নি। ভারি ভাল লাগল জায়গাটা।

মেসোমশাই ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কন্ট্রাক্টর। শখও ছিল তাঁর, পছন্দও ছিল। নারায়ণগঞ্জ শহর থেকে সামান্য বাইরে, নদীর ঠিক ওপরে বাড়ি করেছিলেন। সুন্দর ছোট্ট বাংলো-প্যাটার্ন বাড়িটি, আশে-পাশে আর বাড়ি নেই, দু'পাশে পেছনে ধানক্ষেত, সামনে নদী। আর তখন বোশেখ মাসের ভরা নদী, বুঝতেই পার। নদীর দিককার বারান্দায় বই হাতে ক'রে বা সবাই মিলে গল্পগুজব ক'রে, তোফা আরামে ক'টি দিন কেটে গেল।

কিন্তু বেড়াতে গেলে হবে কি, কপাল যায় সঙ্গে। যাবার দিন-পাঁচ-সাত পরে। সন্ধের পরে সবাই মিলে গল্প হচ্ছে, আমিও আমার দু' একটা শিকারের গল্প তাদের শোনাচ্ছি। ঠিক এই সময় মেসো-মশাই বাড়ি ফিরলেন। বারান্দায় এসে জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, ওহে শিকারী, কুমীর মারতে পার?

আমি বললাম, কেন?

মেসোমশাই বললেন, এখানকার লোকেরা আমাকে বড্ড ধরেছে। আমার কাছে তোমার নাম শুনেছে কিনা। একটা কুমীর ভয়ানক উৎপাত করছে কদিন ধ'রে। পার তো মেরে দাও।

আমি বললাম, কুমীর মারতে শিকারী কি হবে! জেলেদের খবর দিন না, তারা ছিপ ফেলে তুলে দেবে 'খন।

মেসোমশাই বললেন, না হে না, যা ভাবছ, তুচ্ছ করবার জীব এ নয়, তা হ'লে কি আর তোমায় বলতাম? বঁড়শি ছোঁবার পাত্রই নয় সে, বেজায় চালাক। আর তাকে গেঁথে রাখে, এমন জোর বঁড়শির নেই। রাক্ষস অবতার, দশ দিনে তেরোটি মানুষ মেরেছে।

মানুষ মেরেছে! শুনে ন'ড়েচ'ড়ে খাড়া হয়ে বসলাম। বললাম, বলুন তো ব্যাপারটা, সব শুনি। কোথায় কুমীর?

মেসোমশাই বললেন, এই নদীতেই। বলছি এসে, দাঁড়াও।

কাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে মেসোমশাই এসে বারান্দায় বসলেন। বললেন, শোন এবার কুমীরের ইতিহাস। দিন-কুড়িক আগে এই

কুমীরটা প্রথম দেখা দেয়, এখান থেকে মাইল-সতেরো দূরে একটা জায়গায়। খেয়া-নৌকোয় লোক পার হচ্ছিল, একজন ব'সে ছিল নৌকোর ডালির ওপর, জলের মধ্যে পা ঝুলিয়ে। পা ধ'রে টেনে তাকে নিয়ে যায়। এই হ'ল শুরু। তার পর ক'টি দিন সেখানে অকথ্য অত্যাচার করলে। আট দিনের ভেতর ছ'জন মানুষ তার পেটে গেল। গরু-বাছুর তো কত যে নিলে, তার হিসেব নেই। এত বড় ষণ্ডা কুমীর—নদীর ধারে মাঠে বাঁধা রয়েছে গরু, দিনদুপুরে ডাঙায় উঠে সেই গরুকে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চ'লে গেল, শতেক দেড়-শ মানুষের চোখের সামনে।

আমি বললাম, মারতে কেউ চেষ্টা করলে না?

মেসোমশাই বললেন, চেষ্টা করলে কি হবে! বঁড়শি ফেলা হ'ল, দুটি দিন সে আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করলে, টোপ ছুঁলেও না। তারপর বঁড়শি খেয়েছিল অবশ্য। কিন্তু তাকে ধ'রে রাখে কার সাধ্য! সারাটা দিন বঁড়শি মুখে ক'রে ছুটোছুটি করলে, পেছনে ছোট ছোট নৌকোয় শিকারীরা ছুটছে, তাদের হাতে বঁড়শির কাছি। সন্ধেবেলা হঠাৎ কাছি আলগা হয়ে গেল, বঁড়শি কেটেছে। তার পরই শিকারীদের একখানা নৌকো উলটে প'ড়ে গেল। তাড়া করলে কুমীর পালাবার পথ খোঁজে, ইনি পালটা লড়াই করেন। নীচে থেকে আচমকা ভেসে উঠে নৌকোখানাকে পিঠে ক'রে উলটে দিলে। লোকগুলো জলে পড়ল, তাদের একজনকে মুখে নিয়ে ছুট দিলে। দিলে তো দিলে—সোজা আমাদের এইখানে। কদিন ধ'রে যা উপদ্রব করছে, সে কহতব্য নয়।

আমি বললাম, এখানেও মানুষ মেরেছে?

মেসোমশাই বললেন, মেরেছে শুধু? ওই তো বললাম, দশ দিনও হয় নি এসেছে, এর মধ্যেই তেরোজন সাবাড়। তায় আবার কাল যা করেছে শুনে এলাম, এমন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন কাণ্ড মানুষে করতে পারে শুনলে বিশ্বাস হয় না।

আমি বললাম, কি করেছে ?

মেসোমশাই বললেন, এখান থেকে মাইলটাক দূরে একটা বুড়ী থাকে—বুড়ী আর তার মেয়ে, আর কেউ নেই। নদীর ধারে চালা বেঁধে দু'জনে থাকে, বনবাদাড় কুড়িয়ে শাকপাতা এনে বাজারে বেচে, লোকের বাড়ি কাজে-কর্মে খেটে দেয়, ধান ভেনে মুড়ি-খই ভেজে দেয়, কখনো সখনো ভিক্ষেও করে। এ বাড়িতেও অনেক বার এসেছে। তোমরাও তাকে চেন তো---সেই যে এবার দোল বেঁধে দিয়ে গেল।

মাসীমা বললেন, কার কথা বলছ, শরির মা ? তাকে খেয়েছে ?

মেসোমশাই বললেন, তাকে খেলেও তো হ'ত। খেয়েছে শরিকে।

মাসীমা বললেন, ওমা, সে কি কথা! কোথা থেকে তাকে নিলে ?

মেসোমশাই বললেন, বাড়ির উঠোন থেকে। কাল সকালবেলা। কারা মুড়ির ধান ভানতে দিয়েছিল, উঠোনে চাটাই বিছিয়ে সেই ধান শুকোতে দিয়েছে। শরি গিয়েছিল ধান নেড়ে দিতে। নদীর ওপরেই ওদের বাড়ি তো। নদীর দিকে পেছন ক'রে সে উবু হয়ে ব'সে ধান নাড়ছে, এদিকে নদী থেকে কুমীরও নিঃশব্দে উঠে এসেছে। শরিটা কিছু টের পায় নি।

কি সর্বনাশ! তার পর ?

তার পর টের পেলে বোধ হয় যখন কুমীর একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। তখন তাকে দেখতে পেয়ে কি অবস্থা হয় বুঝতেই পার। শরি চীৎকার ক'রে দৌড় দিলে, কুমীর তার পেছনে তাড়া করলে। চীৎকার শুনে লোকজন ছুটে এল, বুড়ীও ছুটে বেরুল, কিন্তু তাকে বাঁচাবে কে! মেয়েটাও একটা ভুল করলে, ঘরের দিকে গেলে হয়তো বা মাচায়-টাচায় উঠে বাঁচতে পারত, সে ছুটল মাঠের দিকে। মাঠে এখন নতুন লাঙল দেওয়া হচ্ছে, সে এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে চলাই যায় না। মেয়েটা নাকি যা চেঁচিয়েছে শুনলাম, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। সে চেঁচাচ্ছে আর দৌড়চ্ছে, আর তার পেছনে পেছনে

দৌড়চ্ছে কুমীর। লোক জুটেছিল কম নয়, কিন্তু কাছে এগুতে কেউ সাহসই করলে না। ছুটতে ছুটতে মেয়েটা অনেক দূর গিয়েছিল, কিন্তু কপালে আছে মরণ, হঠাৎ সে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেল। বাস্, আর কি, পলক না পড়তে কুমীর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কুমীরের স্বভাবই হ'ল শিকার কাদায় পুঁতে পচিয়ে খাওয়া। ডাঙায় উঠে শিকার ধরলেও তাকে জলে টেনে নিয়ে যায়। এ ব্যাটা কিন্তু তা করলে না। সেইখানে ব'সেই মেয়েটাকে খেলে।

মাসীমা বললেন, খেলে মানে?

মেসোমশাই বললেন, খেলে মানে খেলে। ক্ষিদেটা বোধ হয় বেজায় লেগেছিল। তাকে পুরোপুরি মারতেও তর সইল না, টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে গবাগব গিলে ফেললে। একটা একটা ক'রে হাত পা টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে আর বাকি দেহটা ছটফট করছে, ভাবতে পার সে দৃশ্য?

মাসীমা 'উঃ' ব'লে দু'হাতে চোখ ঢাকলেন।

আমার তখন রক্ত ফুটছে। বললাম, আর লোকগুলো দাঁড়িয়ে খালি চেয়ে চেয়ে দেখলে? কেউ কিছু করলে না?

মেসোমশাই বললেন, কি করবে! সে দানবের সঙ্গে লড়া সম্ভব নয়। তাড়াতাড়িতে যে যা হাতের ধারে পেয়েছে নিয়ে ছুটে এসেছে, কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে দা, কারও বা হাতে বল্লম। তাতে ও কুমীরের কি হবে? আর তখন যা তার বীভৎস মূর্তি—দুটো লোক তো অজ্ঞানই হয়ে গেল দেখে।

মাসীমার মেয়ে লীলা, তার তখন দু' চোখ জ্বলছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, আহা রে, সোনার বাছা রে। একটু গরম দুধ ক'রে খাইয়ে দিলে না কেউ?

মেসোমশাই বললেন, তবে হ্যাঁ, সাহস বটে বুড়ীটার। আর তখন প্রাণের মায়া করবেই বা সে কার জন্যে? মেয়েকে খাচ্ছে দেখে বুড়ী ক্ষেপে গেল, তাকে ধ'রে রাখা যায় না। লোকেরা আটকাতে গেল,

তাদের হাত ছিনিয়ে বুড়ী গিয়ে কুমীরের ওপর পড়ল। মুখে তাকে গালাগাল দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে—ছাড় ছাড় ছাড় ছাড় ছেড়ে দে ছেড়ে দে, আর কুমীরের গায়ে পিঠে এলোপাতাড়ি কিল চড় লাথি মারছে। শেষটা উবু হয়ে প'ড়ে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে কামড়ে ধরলে। পাগলের মত তাকে কামড়াতে আর আঁচড়াতে লাগল। কুমীরের কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই, দশ মিনিটের মধ্যে মেয়েটাকে সারা ক'রে ধীরে সুস্থে নদীতে গিয়ে নামল। বুড়ীটা পেছন পেছন ছুটেছিল, তাকে ল্যাজের এক ঝাপটা মারলে, বুড়ী বিশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

মাসীমা ধীরে ধীরে বললেন, আমার কাছে একখানা কাপড় পরতে চেয়েছিল।

আমার খুন চেপে গেল। বললাম, আমি এ কুমীর মারব।

মাসীমা মুখ তুলে চাইলেন। ধরা গলায় বললেন, যাও বলতে প্রাণ চায় না, তবু বলব একে মেরে এস। মানুষের এত বড় শত্রুকে যদি শক্তি থেকেও না মার, তবে মিছেই পুরুষ হয়ে জন্মেছ।

লীলা দু'চোখ বড় বড় ক'রে বললে, একে মারতে পারলে তবেই বুঝব তুমি মানুষ।

সে রাতটা কাটল। সকালবেলা উঠে আমি বললাম, এখানে এদেশী শিকারী নেই? তাদের একবার খবর দিতে হবে। কুমীর মারবার কলকায়দা জানে, এমন লোক যারা থাকে ডেকে পাঠান।

মেসোমশাই তখন কাজে বেরোচ্ছেন। বললেন, আমি আজই তাদের সব খবর দিয়ে দেব।

মেসোমশাই বেরিয়ে গেলেন। আমি বন্দুক খুলে সাফ করতে বসলাম।

বেলা তখন ন'টা হবে, হঠাৎ নদীর দিকে একটা হৈ-চৈ উঠল। ছুটে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালাম। নীচেই নদীর খাড়া পাড়, বারান্দা

থেকে নদী অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। দেখলাম, খানিক দূরে নদীর পারে অনেক লোক জমেছে। নদীর দিকে চেয়ে দেখি, মাঝ-নদীতে দু'খানা নৌকো। একখানা সরু লম্বা জেলে-ডিঙি, তাতে জন-তিনেক লোক দাঁড়িয়ে। একটির পরনে খাকি হাফপ্যান্ট মাথায় টুপি। আর দু'জনের পোশাক দেখে মনে হ'ল পুলিস কনস্টেবল। চারজন মাঝি নৌকো বাইছে, আর পুলিসরা জলের দিকে ঝুঁকে কি দেখছে। অন্য নৌকোটা ছোট্ট ডিঙি, তাতে লোক নেই, ঘুরতে ঘুরতে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

তার পর চোখে পড়ল, জলের ওপর একটা মানুষের মাথা। লোকটা সাঁতার কাটছে, পুলিসের নৌকোটাও তার দিকেই বেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পরই যা ঘটল, ভয়ানক কাণ্ড। নৌকোটা তার থেকে তখন হাত দশ বারো মাত্র দূরে, হঠাৎ লোকটার পাশে জলের ওপর একখানা ভয়ঙ্কর মুখ ভেসে উঠল। কুমীর। পুলিসেরা চেঁচিয়ে উঠল, লোকটাও মুখ ফেরালে, কিন্তু পলক না পড়তে কুমীর বিরাট হাঁ ক'রে তার ঘাড় কামড়ে ধরলে। ধ'রেই ডুব।

পারের লোকেরা হল্লা করতে লাগল। কেউ কেউ টিন পেটাতে লাগল। কেউ কেউ রাগে নদীর মধ্যেই ঢিল ছুঁড়তে লাগল।

পুলিসের নৌকো একটুক্ষণ এদিক ওদিক করলে, কিন্তু তখন আর মাঝগাঙে ব'সে থেকে তারা কি করবে। শেষে ছোট ডিঙিখানাকে ধ'রে নিয়ে তারা পারে এসে উঠল।

আমি নেমে গেলাম। লোকেরা পরিচয় করিয়ে দিলে, নারায়ণগঞ্জের টাউন দারোগা। দারোগাবাবু মেসোমশাইকে চিনতেন। আমার সঙ্গে আমাদের বারান্দায় এসে উঠলেন।

তাঁকে বসিয়ে বললাম, ব্যাপারটা কি হ'ল, বলুন তো ?

তিনি বললেন, হ'ল যা তা তো দেখতেই পেলেন। বাপ, মনে করতে গায়ে কাঁটা দেয়।

বাস্তবিক তখনও তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে।

আমি বললাম, এটুকুন তো স্বচক্ষেই দেখলাম। আগের ইতিহাসটা কি? লোকটা কে?

দারোগা বললেন, ফেরারী আসামী। পাকা জালিয়াৎ।

আমি বললাম, কি জাল করত?

দারোগা বললেন, মুদ্রা। জিনিয়াস! স্বদেশী সিকি দু'আনি যা তৈরি করে, দেখে কে বলবে কান্ট্রিমেড। বার দু' তিন জেলও খেটেছে, আবার বাইরে এসে কারখানা বানিয়েছে। কিছুদিন ধ'রে এঁর খোঁজ হচ্ছিল, ডুব মেরে মেরে বেড়াচ্ছিলেন।

আমি বললাম, আজ বুঝি খোঁজ পেয়েছিলেন?

দারোগা বললেন, হ্যাঁ। ব্যাটার সাহস বলতে হবে, সবগুলো পকেট ঠেসে সিকি দু'আনি নিয়ে বাজারে গিয়েছে, দোকানীদের বলেছে, টাকার ভাঙানি চাই? একসঙ্গে অতগুলো নতুন সিকি দু'আনি দেখে তাদের হয়েছে সন্দেহ, তাকে বসিয়ে থানায় খবর দিয়েছে। এ-ও কম যায় না, আমাদের দূরে দেখেই টেনে দৌড় দিয়েছে। ছুটে যখন দেখলে পারবে না, তখন এক ডিঙি খুলে নিয়ে নদীতে নামল। বোধ হয় ভেবেছিল নদী পাড়ি দিয়ে পালাবে। আমরা ধর-ধর হয়েছি দেখে জলে লাফিয়ে পড়েছে। তারপর এই কাণ্ড।

আমি বললাম, যাক, সে যা হবার তা হয়েছে, ভেবে আর লাভ নেই। কিন্তু যা ভয়ঙ্কর জীব নদীতে এসে বাসা বেঁধেছে, একে মারবার জন্যে আপনারা চেষ্টা করছেন না?

দারোগা বললেন, চেষ্টা হচ্ছে না কে বললে? গবর্মেণ্ট থেকে একশোটি টাকা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে মশাই। কিন্তু দেখলেন তো স্বচক্ষে, ও দানবকে মারবে কে, বলুন?

আমি বললাম, আমি মারব। এ-লাইনে আমার নাম হয়তো শুনেছেন।

দারোগা বললেন, তা শুনেছি বই কি। কিন্তু সত্যি পারবেন?

আমি বললাম, আশা তো করি, যদি আপনারা একটু সাহায্য

করেন। রিওয়ার্ডের টাকা আমি চাই নে, সে আপনাদেরই থাক। আমার ট্রফি পেলেই হ'ল।

দারোগা বললেন, কিন্তু আমাদের কাছে কি সাহায্য চান আপনি, বলুন? একটা অ্যারেস্ট-ওয়ারেণ্ট?

আমি বললাম, না, চাই একখানা স্টীমলঞ্চ। যা চেহারা দেখলাম, নৌকো ক'রে একে তাড়া করতে ভরসা হয় না। আপনাদের জল-পুলিসের ছোট লঞ্চ যদি একখানা বন্দোবস্ত করতে পারেন, তবে আমি একবার কপাল ঠুকে দেখি!

দারোগা বললেন, লঞ্চ পাওয়া শক্ত হবে না, সায়েবকে বললেই হুকুম দেবেন। তার জন্যে তো ভাবি না, কিন্তু মারবেন কি ক'রে? দেখা যদি বা পান, বন্দুকের গুলি এর গায়ে বিঁধবে না। বঁড়শিও ছোঁয় না। কদিন ধ'বেই বঁড়শি ফেলা হচ্ছে।

আমি বললাম, বন্দুকে বঁড়শিতে হবে না, সে আমিও বুঝেছি। অন্য কোন উপায় করতে হবে।

দারোগা বললেন, আর কি উপায় আছে? তবে একটা অবশ্য ক'রে 'দেখতে পারেন। এদিককার লোকেরা কুমীর মারবার জন্যে একটা ফিকির খাটায়, ছাগল ভেড়া মেরে তার ভেতরটাতে পাথুরে চুন পুরে সেলাই ক'রে জলে ছেড়ে দেয়। সেই চুনসুদ্ধ লাস খেয়ে কুমীর মারা পড়ে। খেলে কাজ হয়, কিন্তু যা শয়তান কুমীর, এ কি তা ছোঁবে! হয়তো দূর থেকেই গন্ধ পেয়ে পালিয়ে যাবে।

ফন্দিটা আমিও জানতাম। কিন্তু আমার সেটা পছন্দ নয়। চুন খেয়ে কুমীরের বুকে-পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। গায়ের জ্বালায় সে পাগলের মত খালি ছুটতে থাকে। তখন তাকে নজরে রাখা কঠিন ব্যাপার। তার পর চুন খেয়েই হোক, আর বন্দুকের গুলিতেই হোক, মরার সঙ্গে সঙ্গে কুমীর নদীর তলায় তলিয়ে যায়। তলভাসা দিয়ে কদ্দূর যাবে তার ঠিক নেই, অনেক সময় তার আর পাত্তাই মেলে না। যদিই বা কোনটা কাছাকাছির মধ্যে ভেসে ওঠে, উঠবে

দু'তিন দিন পরে, প'চে ফুলে। চামড়া প'চে খারাপ হ'য়ে যায়। এমন একটা বিরাট কুমীর মারব, তার চামড়াই যদি টাটকা না পেলাম তবে মেরে কি সুখ, বল ?

দারোগাকে সেই কথা বললাম। তিনি বললেন, কিন্তু টাটকা চামড়া পেতে হ'লে কুমীরকে বঁড়শিতে গাঁথতে হয়। আর না হ'লে কোথাও ডাঙায় বেড় দিয়ে মারতে হয়। দুটোই এর বেলায় অসম্ভব।

আমি বললাম, সেইখানেই যে মুশকিল। নইলে বিষই যদি দেব তো চুন কেন, একেবারে পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়ালেই তো পারি। আপনাদের নারায়ণগঞ্জে কেমিস্টের দোকান নেই ?

দারোগা বললেন, থাকলেই বা তারা সায়ানাইড বেচবে কেন আপনাকে। সে পেতে হ'লে কলেজ ল্যাবরেটরিতে যেতে হবে। তার জন্যে অবশ্য আটকাবে না, চান তো বলুন, আমরা একটা অফিশিয়াল চিঠি দিয়ে দিচ্ছ প্রিন্সিপ্যালের নামে।

আমি বললাম, আচ্ছা, সে ভেবে দেখি, যদি দরকার হয় তখন চেয়ে নেব। আপনি লঞ্চ কবে পাঠাচ্ছেন, তাই বলুন।

দারোগা বললেন, সাহেবকে এখন গিয়ে বলব। লঞ্চ দু'খানাই ঘাটে আছে জানি, খুব সম্ভব কালই পেয়ে যাবেন। আমার কিন্তু মশাই একটি আবদার আছে। আমি আপনার সঙ্গে যাব।

লোকটিকে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। পুলিস হ'লেও তার বুদ্ধি আছে। বললাম, নিশ্চয় নিশ্চয়, সে আর বলতে হবে কেন ! আমি তো আরও আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ছুটি পাবেন তো ?

দারোগা বললেন, তা পাব।

আমি বললাম, তবে আর কি ! আর এমনিতেও তো লঞ্চে অফিসার কেউ একজনকে থাকতেই হবে। নইলে অচেনা বাইরের লোকের হাতে আপনারাই বা লঞ্চ ছেড়ে দেবেন কেন ?

না না, সে কি কথা ! আপনারা তো আর অচেনা নন। ইত্যাদি

ইত্যাদি ব'লে এক রাশ বিনয় প্রকাশ ক'রে দারোগাবাবু বিদায় নিলেন।

পরদিন ভোর হতে না-হতে লঞ্চ এসে হাজির। দারোগা তো এসেছেনই, সঙ্গে এসেছেন খোদ পুলিস সায়েব। বললেন, বড় শিকারী ব'লে আপনার নাম শুনেছি, এবাবে স্বচক্ষে দেখতে এলাম।

আমি বললাম, এতে আর দেখবার কি আছে সায়েব, এ শুধু আমাকেই লজ্জা দিলে। বাঘ ভালুক মারায় আনন্দ আছে, সেখানে শক্তির পরীক্ষা হয়। খাবারে বিষ দিয়ে মারা, সে তো ছ্যাঁচড়ামো ক'রে মারা।

সায়েব বললে, এ কুমীর নয়, শয়তান। শয়তানের সঙ্গে শয়তানি করায় পাপ নেই।

আমি বললাম, সে কথা আমিও মানি, নইলে এতে আমি রাজি হতাম না। মানুষের প্রাণ যেখানে বিপন্ন, সেখানে নীতি বড় কথা নয়। সে যাক, এখন চল, জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

খালাসীরা জিনিসপত্তর নিতে এল। সায়েব বললে, এ কি চৌধুরী, বন্দুক কই?

আমি বললাম, নোব না। ও বন্দুক আমার বহুকালের সঙ্গী। ওকে দিয়ে আমি হীন কাজ কখনও করি নি, আজও করব না। আর বন্দুকের দরকারও হবে না কিছু।

সায়েব হেসে বললে, তোমরা বাঙালীরা বড্ড বেশি সেন্টিমেন্টাল। আমি কিন্তু ছাড়ব না তাই ব'লে। বাগে পেলেই তাকে গুলি করব। কম ভোগানটা ভুগিয়েছে!

আমি বললাম, বা রে আবদার! এত কষ্ট ক'রে মারব কুমীর, আর, তুমি না-হক গুলি ছুঁড়ে তার চামড়া জখম ক'রে দেবে। সে হবে না।

সায়েব বললে, আচ্ছা আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে।

জিনিসপত্র সব তৈরিই ছিল। আর কি-ই বা জিনিস।

বারান্দার এক কোণে একটা মরা ছাগলকে চট ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। দারোগাবাবু তার পেটটা টিপে-টুপে দেখলেন। বললেন, কি, চুনই দিলেন শেষ পর্যন্ত ?

আমি বললাম, উপায় কি, বলুন।

তিনি বললেন, কেন, আপনার সেই পটাশিয়াম সায়ানাইড কি হ'ল ? পেলেন না ?

আমি বললাম, পাগল, না ক্ষ্যাপা। সের-বরাদ্দে ও জিনিস পায় কখনও ?

সায়েব বললে, চৌধুরী, এ সরু লাকলাইন কি হবে ? কুমীরকে কাঁধে ঝুলিয়েই নিয়ে আসবে নাকি ?

আমি বললাম, দড়ি একটা থাকা ভাল। সময়ে অসময়ে গলায় দেওয়া যায়।

মাঝনদীতে গিয়ে ছাগলটাকে জলে ছেড়ে দিলাম, বেশ ভাসতে লাগল। তার সঙ্গে একটা লম্বা সরু দড়ি লাগিয়ে সেই দড়ির মাথায় ছোট্ট এক টুকরো কলাগাছ বেঁধে দিলাম। টোপ খেয়ে কুমীর ডুব দিলে তখন এইটে ফাত্না হবে।

সব ঠিকঠাক ক'রে লঞ্চ দূরে এনে লাগিয়ে বাইনোকুলার হাতে ক'জনে ব'সে চেয়ে রইলাম।

আধ ঘণ্টা গেল। এক ঘণ্টা। দেড় ঘণ্টা। কুমীরের সাড়া নেই। আমরা ঠায় ব'সে আছি।

প্রায় দু' ঘণ্টা যখন পার হয়, হঠাৎ আমার হাঁটুতে ঠেলা দিয়ে দারোগাটি বললে, দেখুন দেখুন! চেয়ে দেখলাম, অনেক দূরে নদীর বাঁকে জলের ওপর দুটি কাচের মারবেল ভেসে উঠেছে। কুমীর। সকালবেলা, তায় ভাঁটা। নদী একেবারে পাটির মতন পালিশ। সেই পালিশ জমির ওপর দুটি চকচকে কাচের গুলির মত কুমীরের চোখ জেগে রয়েছে—তার শরীর মাথা সব জলের তলায়, চোখ দুটি

খালি জলের ওপরে। প্রথম দেখে মনে হ'ল, একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। তার পর দেখলাম, না, কাছে এগোচ্ছে। ধীরে ধীরে —এত ধীরে যে প্রথমটা ঠাহর হয় না। তার পর একটু কাছে এলে দেখলাম, তার গতি ক্রমেই বাড়ছে, সোজা সেই মরা ছাগলটাকে লক্ষ্য ক'রে সে ছুটেছে। শেষের দিকে সে একেবারে তীরবেগে ছুটল। কুমীর ভাসা কখনও দেখেছ ? দেখো। বড় সুন্দর জিনিস। স্থির টলটলে জলের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে তুটি চোখ ; তার নীচে ছুটেছে তার বিশাল দেহ। তবু জলের কোথাও এতটুকু স্পন্দন নেই, জল নড়ছে না।

ছাগলের একেবাবে কাছে গিয়ে সে মুখ তুললে। সেই বিকট মুখ আগেব দিন একবাব দেখেছিলাম। একটুখানি সে থামলে, মনে হ'ল, ছাগলটাকে যেন শুঁকে দেখলে। তাব পব এক গ্রাসে তাকে প্রায় মুখে পুরে নিয়ে ডুব মারলে।

আমি সারেংকে বললাম, এঞ্জিন চালু কর। খালাসীরা যে যার জায়গায় তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

মিনিট দশ-বারো কাটল। তার পর নদীর মধ্যে একটা প্রলয় কাণ্ড শুরু হ'ল। বোঝা গেল. বিষ ধরেছে। ডুবে ভেসে ল্যাজ আছড়ে ঝাপিয়ে কুমীর নদীটাকে একেবারে তোলপাড় ক'রে তুললে।

এক-এক বার ভেসে ওঠে, ল্যাজ আছড়ায়, বোঁ বোঁ ক'রে চক্কর দিয়ে ঘুবতে থাকে, আবার ডুব দিয়ে এক দিকে ছুট লাগায়। ছুটলেই আমরাও লঞ্চ চালিয়ে পেছনে ছুটি, চোখের আড়ালে না যায়। ফাত্‌নাটা আছে তাই পেছু নিতে কষ্ট নেই। ভেসে উঠলে দূরে গিয়ে লঞ্চ থামাই। এদিকে লঞ্চের বাঁশি অবিশ্রাম বাজছে—লোককে সাবধান করতে, কেউ যেন না জলে নামে, কেউ যেন না নৌকো খোলে। এই উন্মত্ত কুমীরে সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই। নদীর তুই পার লোকে লোকারণ্য।

একবার কুমীর লঞ্চের একেবারে গা ঘেঁসে ভেসে উঠল, লঞ্চ নিয়ে

আমরা দূরে পালিয়ে গেলাম। তখন দেখলাম, কুমীর কেবলই দমকা নিশ্বাস ফেলছে আর হাঁ ক'রে ক'রে জল খাচ্ছে। তার ভেতরে খুব একটা যন্ত্রণা চলছে, সে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

দারোগা বললে, চুনের কাজ শুরু হয়েছে। চুনের জ্বলুনিতে কুমীর জল খায়, জলে চুনে মিশে গরম হয়ে গিয়ে তার ভেতরটাকে একেবারে পুড়িয়ে দেয়।

কুমীর আবার ডুবল। আবার খানিক দূরে গিয়ে ভেসে উঠল। আবার ডুবল। আবার উঠল। দেখলাম, তার জোর ক্রমেই ক'মে আসছে। শেষবার যে ডুবল, আর ওঠে না।

সায়েব বললে, চৌধুরী, ওর হয়ে গেছে। চল ফিরি।

আমি বললাম, দাঁড়াও, আর একটু দেখি।

পনেরো মিনিট—কুড়ি মিনিট। তার পর আস্তে আস্তে কুমীর আবার ভেসে উঠল। এখন আর সে ল্যাজ আছড়াচ্ছে না, একটু একটু নাড়ছে মাত্র। আমরা দূর থেকে দেখতে লাগলাম। ক্রমে তার সমস্ত দেহ জলের ওপর ভেসে উঠল। উঃ, কি বিশাল চেহারা, আর তার মুখের দিকে তাকালে তো আত্মাপুরুষ শুকিয়েই যায়।

একটু একটু ক'রে সেই বিরাট দানব জলের ওপর জেগে উঠতে লাগল—আস্তে, আস্তে, আস্তে।

সায়েব হঠাৎ বিকট এক চীৎকার ক'রে আমার জামা খাম্‌চে ধরলে। বললে, দেখছ চৌধুরী, দেখছ! আমি তখুনি বলেছিলাম, এ শয়তান, মানুষ নয়, শয়তান! নইলে শুনেছ তুমি আর কখনও, কুমীর জলের ওপর দিয়ে হাঁটে?

বাস্তবিক কুমীর তখন জল ছেড়ে ওপরে উঠে পড়েছে। গোটা দেহটা শূন্যে, থাবা চারখানা আর ল্যাজটা জলের ওপরে বসানো—ঠিক যেন নদীর কঠিন মেঝের ওপর সে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কুমীর আরও ওপরে উঠতে লাগল। তার থাবা ল্যাজও জল

থেকে আলগা হয়ে গেল। সায়েব তখন ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। বললে, ও কি চৌধুরী, ও যে উড়ছে! এ কি সত্যিই কুমীর, না ড্র্যাগন?

তার কথার জবাব দেবার আমার তখন সময় নেই। সারেংকে বললাম, ওর কাছে লঞ্চ নিয়ে যাও।

সায়েব সারেংকে জাপটে ধ'রে বললে, না না, পালাও, পালাও!

আমি জোর ক'রে তাকে টেনে সরিয়ে দিলাম। ধমকে বললাম, এখন গোল ক'রো না। সারেং, চালাও।

সারেংও তখন ভয়ে কাঁপছে। হাতজোড় ক'রে বললে, হুজুর!

আমি তাকে এক ঠেলা মারলাম, সে কাত হয়ে প'ড়ে গেল। আমি নিজে হালের চাকা ধ'রে লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। লঞ্চ আস্তে আস্তে কুমীরের দিকে চলল।

বাজারে আজকাল জাপানী রবারের পুতুল উঠেছে, দেখেছ? সেই যে, পাতলা রবার-শীটের পুতুল—বাঘ, কুকুর, মানুষ, ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ছিপি এঁটে দিতে হয়? কুমীরের সমস্ত শরীর তখন ফুলে টনটনে হয়ে ঠিক সেই রকম দেখতে হয়েছে। সায়েব ঠিকই বলেছিল, ড্র্যাগন। একছেয়ে সোনালি-হলদে রঙ, সারা গায়ে বড় বড় আঁশ, ফুলে টাইট হয়ে মুখ থেকে ল্যাজের ডগা অবধি একদম সোজা শক্ত হয়ে গেছে, রোদ্দুর প'ড়ে ভিজে চামড়াটা আরও বেশি জ্বলজ্বল করছে। জল থেকে হাত দেড়েক ওপরে শূন্যে স্থির হয়ে ভাসছে সেই বিরাট দেহ, থাবা থেকে ল্যাজ থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ছে, —একটা দৃশ্য বটে। যেন কাঁচা সোনার জেপেলিন জল ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠছে, স্বর্গের দিকে উড়ে যাবে ব'লে।

সায়েব মরিয়া হয়ে আমার হাত চেপে ধরলে। আমি এক ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। কাজের সময় কাঁদুনি আমি সইতে পারি নে।

লঞ্চ তখন কুমীরের একেবারে পাশে এসে পড়েছে। চাকা ঘুরিয়ে আমি লঞ্চের মুখ ফিরিয়ে দিলাম। সারেংকে বললাম, চাকা ধর।

সারেং কথা বললে না, মড়ার মত হাত বাড়িয়ে চাকা চেপে ধরলে। আমি লাকলাইনেব গুছিটা হাতে তুলে নিলাম। বারকতক শূন্যে দুলিয়ে ল্যাসোর মত ক'রে তার একটা দিক ছুঁড়ে দিলাম। দড়ি কুমীরের পেটের ওপর দু-তিনটে পাক জড়িয়ে টাইট হয়ে গেল।

সারেংকে বললাম, লঞ্চ ফেরাও। পারে চল।

পারে ওদিকে মানুষের ভিড়ে মহামারি কাণ্ড। কুমীর শূন্যে উঠতে উঠতে তখন লঞ্চের ছাত ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। সমস্ত দেহটা তার স্থির, ল্যাজটা শুধু একটু একটু কাঁপছে।

লঞ্চ ধীরে ধীরে পারের দিকে চলল। জোরে যাবার জো নেই, দড়ি ছিঁড়ে যাবে; তাতে খালাসীরা সব ভয়ে আড়ষ্ট, বয়লারের আগুন নিবু-নিবু। আস্তে আস্তে লঞ্চ এগোচ্ছে, তার পেছনে শূন্যে ভেসে আসছে সেই সোনার জেপেলিন।

ঢের ঢের পুলিস-সায়েব দেখেছি ভাই, এত বড় গাধা আর দুটি দেখি নি। পারে পৌঁছতে তখন সামান্য বাকি। আমি চেয়ে দেখছি, কোন্ জায়গাতে লঞ্চ লাগালে সুবিধে হবে। হঠাৎ পেছনে দুদ্দুম্ ক'রে জোড়া বন্দুকের শব্দ, আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্বুম্-ক্কড়্ড়াৎ-বুম্ ক'রে এক প্রচণ্ড আওয়াজ। চমকে পেছন ফিরে দেখি, সর্বনাশ! আমি অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলাম, এই ফাঁকে সায়েব বন্দুক তুলে একেবারে দুটি নলই ঝেড়ে দিয়েছে কুমীরের পেট সই ক'রে। ভীষণ বাজের মত শব্দ হয়ে অত বড় কুমীর ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গেল, তার পর আমার চোখের সামনেই টাল খেয়ে ঝপাং ক'রে নদীর জলে পড়ল। পড়তে পড়তে তার একখানা থাবা লঞ্চের ছাতে লেগে গিয়েছিল, লঞ্চ ভয়ানক দুলে উঠল, কাত হয় আর কি! টাল সামলে নিয়ে আবার যখন চাইলাম, তখন কুমীর নদীর জলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সে সময় মনের কি অবস্থা হয়, ভাবতে পার ? সায়েবের কাঁধ ধ'রে ক'ষে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, কে বলেছে তোমাকে গুলি ছুঁড়তে ?

সায়েব তখন বন্দুক ফেলে দিয়ে মেঝেয় ব'সে পড়েছে। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে মদ্দা-হাঁসের মত গলা ক'রে বললে, আই অ্যাম্ সরি। চৌধুরী আই অ্যাম্ সরি।

এর পরে আর কি বলব তাকে! লঞ্চ ভিড়িয়ে আমি পারে নেমে পড়লাম। মনটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সেখান থেকে চ'লে এলাম। এমন একটা ট্রফি - থাকলে লোককে গর্ব ক'রে দেখাতে পারতাম। এ কি কম আপসোসের কথা।

দারোগাবাবুটি স্টেশনে এসে দেখা ক'রে গেলেন। লোকটিকে বড় ভাল লেগেছিল। অতগুলো মানুষের মধ্যে এক তিনিই মাথা স্থির রেখেছিলেন। দুঃখ ক'রে বললেন, আপনার মন তো খারাপ হতেই পারে।

আমি বললাম, এত ভয় পায়, একে সায়েব বলে ? ছিঃ!

দারোগাবাবু বললেন, কি আর বলব, বলুন!

তারপর বললেন, যদি মনে কিছু না করেন, একটি কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে ?

আমি বললাম, কি ?

তিনি বললেন, ড্র্যাগন-ট্র্যাগন বাজে কথা। কিন্তু কুমীরটা শূন্যে উড়ল কি ক'রে ?

আমি বললাম, থাক মশাই, কেলেঙ্কারি যদ্দুর হবার তা হয়েছে। আর ও কথা টেনে বাড়িয়ে লাভ নেই।

আমরা বলিলাম, কিন্তু সত্যি, কুমীর উড়ল কি ক'রে ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, সে শুনে তোমরা ছেলেমানুষরা কি করবে ?

আমরা বলিলাম, না, বলুন।

কান্তি চৌধুরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, বেশ; তোমাদের বলছি। আমার তো কথা ছিল কুমীরটা ডুবে না যায়? আগের দিনে সেই যে জালিয়াৎকে সে খেয়েছিল, তাই থেকে ফন্দিটা আমার মাথায় আসে। ছাগলের পেটে আমি চুন পুরে দিই নি। দিয়েছিলাম অনেকখানি জমাট সালফিউরিক অ্যাসিড।

তাতে কি হ'ল?

শোনই। সালফিউরিকের জ্বলুনিতে কুমীর জল খেয়েছে। সেই ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড, আর তার পেটে ছিল এক রাশ মেকি সিকি দু'আনি—তার মানেই দস্তা। দুয়ে মিলে হয় হাইড্রোজেন গ্যাস। এবার বুঝলে?

আমি বলিলাম, কিন্তু অমন সেয়ানা কুমীর, সালফিউরিকের গন্ধ টের পেলে না!

কান্তি চৌধুরী চটিয়া বলিলেন, বোকার মত কথা ব'লো না। পাঁড়াগেয়ে কুমীর, চুনের গন্ধ সে চিনতে পারে। সালফিউরিক অ্যাসিড সে বাপের জন্মে দেখেছে, যে চিনবে?

গণ্ডারের গুণ্ডামি

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

ছেলেরা আজকাল দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলে। ভুল করে। ভগবান দিয়েছেন জিনিস, রাখলেই কাজ দেবে—এ কথাটা মনে রাখা উচিত।

আমরা বলিলাম, আপনিও তো দাড়ি কামান।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, আমি কামাই দায়ে প'ড়ে। তোমাদের তো আর তা নয়। দেখছ তো কি বেয়াড়া দাড়ি আমার, যেমন কড়া তেমনই বাড়। সকালে বিকেলে দু'বার ক'রে ক্ষুর চালাই, তাতেও নিস্তার নেই। অথচ এই দাড়ির জন্যেই একবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম।

অনেক দিন আগের কথা। কলেজ ছেড়ে সদ্য বেরিয়েছি। জলপাইগুড়ির ওপর দিকে এক গ্রামে গেলাম, বন্ধুর বিয়ের বরযাত্রী হয়ে।

বিকেলবেলায় গিয়ে সেখানে পৌঁছলাম। গোধূলি-লগ্নে বিয়ে। মেয়ের বাড়ির কাছেই একটা বাড়িতে আমাদের বাসা দিয়েছিল। বিয়ে সারা হ'য়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন বাসায় এসে জুটলাম, রাত তখন এগারোটা প্রায়।

বিয়ে-বাড়িতে ও-সময়ে কারু ঘুমোবার কথা নয়। দলবল বেশির ভাগই তাস বা পাশা পেড়ে বসল। আমার ওসব আসে না, আমি ফরাশের একপাশে শুয়ে ডিটেকটিভ নভেল খুললাম।

সব জায়গাতেই কাজের বাড়িতে দু-একটা ছেলে জুটে যায়, যারা হয়ত বিশেষ কোন আত্মীয় নয়, অথচ খেটেখুটে চৌচাপটে সমস্ত কাজকম্ম ক'রে দিচ্ছে। এই রকমের একটি ছেলে ওখানেও

দেখলাম। তার নাম হরিদাস, পদবীটা ভুলে গেছি। আমাদেরই মতন হবে বয়স, পাতলা দোহারা হাসিখুশি মানুষটি। আর কি আসাধারণ পরিশ্রম করতে পারে, সে একটা দেখবার বস্তু। গিয়ে অবধি দেখছিলাম, সমস্ত জায়গায় সমস্ত কাজে চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবাই সব কাজে বলছে—ডাক হরিদাসকে। বিয়ে-বাড়ির হ্যাঁপার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের তদারকও সেই এসে এসে ক'রে যাচ্ছিল।

আমি চুপচাপ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি, হরিদাস এসে হাজির। বললে, কি হচ্ছে ?

বললাম, একটু লেখাপড়া করছি। সময়টা কাটাতে হবে তো।

হরিদাস বইখানা হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখলে। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে বললে, ইংরিজী—এসব বুঝিও না ছাই। আপনাদেরই জীবন সার্থক। আচ্ছা, আপনি পড়ুন, আমি যাই।

আমি বললাম, বসুন না, পালাবার তাড়া কেন !

সে বললে, তাড়া অবশ্য আপাতত কিছু নেই, ঘণ্টাখানেক এখন ছুটি আছে। কিন্তু থেকে তো খালি আপনার পড়াটাই নষ্ট করব।

আমি বললাম, ভারি তো নভেল পড়া। সময় কাটছিল না ব'লে তাই। নইলে শুয়ে শুয়ে বই পড়া আমার পোষায় না।

হরিদাস হাসল। বললে, কেন মিছে বিনয় করছেন। বই পড়া আপনাদের পোষায় না তো কি পোষায় আমাদের ?

আমি বললাম, বিনয় করি নি, সত্যিই এ আমার ভাল লাগে না।

হরিদাস বললে, কি ভাল লাগে তা হ'লে ?

আমি বললাম, আমার কাজ হচ্ছে ডানপিটেগিরি ক'রে বেড়ানো। সাঁতার, কুস্তি, নৌকো-বাওয়া, জানোয়ার-মারা—এই ক'রেই তো কাটাই।

হরিদাস বললে, এতগুলো পরীক্ষা পাস করেছেন বুঝি এই ক'রেই ?

আমি বললাম, পরীক্ষা পাস করতে মুরোদ লাগে না, লাগে মুখস্থ। সে সবাই করতে পারে।

হরিদাস হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, আরও একটা জিনিস লাগে—পয়সা। সেটা সবার থাকে না।

বুঝলাম, না জেনে তার মনে কোথাও একটু দুঃখ দিয়ে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, আচ্ছা, আপনাদের এদিকে কি রকমের জীবজন্তু পাওয়া যায় ?

হরিদাস বললে, কি জীবজন্তু ? শিকাবেব ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

হরিদাস বললে, আপনার বন্দুক আছে ? এনেছেন ?

আমি বললাম, বন্দুক আছে বটে, তবে সঙ্গে আনি নি।

সে বললে, আনলেন না কেন ?

আমি বললাম, বাঃ, এসেছি বিয়ের বরযাত্রী, একদিনের জন্যে। বন্দুক নিয়ে আসব কি করতে ? লাভের মধ্যে লোকে দেখে বলবে, চাল মারছে।

হরিদাস বললে, বন্দুক আনেন নি তবে আর জানোয়ারের খবর শুনে কি করবেন ? পাওয়া যায় অবিশ্যি অনেক রকমই—চিতা, ভালুক, হরিণ। তার পর বললে, কালই যাবেন আপনারা, না ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, কাল বিকেলে। আপনাদের দেশটা দেখা হ'ল না। আমার আবার বাতিক আছে, যেখানেই যাই, জায়গাটা একটু ঘুরে না দেখে ছাড়ি না। তা এখানে এসে অবধি তো ঘরেই ব'সে কাটল। যা বুঝছি, কালকেও বেরোনো হবে না।

হরিদাস বললে, আর বেরোবেনই বা কোথায়! অজ পাড়াগাঁ, দেখবার মত কিছুই নেই।

আমি বললাম, তবু ? আচ্ছা, অনেক জায়গায় তো পাড়াগাঁয়ে পুরোনোকালের রাজবাড়ি মন্দির-টন্দির থাকে। এখানে সেসব কিছু নেই ?

হরিদাস বললে, দেখতে তো পাই না। তারপর একটু ভেবে বললে, এক থাকবার মধ্যে আছে বুড়োশিবের মন্দির, সে এখান থেকে প্রায় ছ' ক্রোশ। পথটা অবশ্য খুবই সুন্দর, ঘন বনের মধ্য দিয়ে সরু পথ চ'লে গেছে, দুধারে মস্ত মস্ত গাছ—ভারি চমৎকার লাগে যেতে। আমি অনেকবার গেছি।

আমি বললাম, তা হ'লে চলুন না, কাল সকালে উঠে সেইটেই দেখে আসি। কোথায় সেটা, কোন্ গ্রামে?

হরিদাস বললে, গ্রামে নয়, বনের মধ্যে। এখান থেকে প্রায় সিধে উত্তর দিক। কিন্তু আজকাল তো যাওয়া মুশকিল। বর্ষাকালে কেউ যায় না।

আমি বললাম, কাদার জন্যে বলছেন? তাতে আটকাবে না, কাদা ভাঙতে খুব পারি। আর, গাড়ি পাওয়া যায় না?

হরিদাস বললে, এদেশে গাড়ি মানে টমটম। কিন্তু আজকাল গাড়ি চলবে না। যদি কাদা হ'য়ে থাকে, চাকা ব'সে যাবে। বনের মধ্যে অবশ্য কাদা প্রায় হয় না, তবু বলা তো যায় না কিছু।

আমি বললাম, ব'য়ে গেছে, না হয় হেঁটেই যাব। ছ' ক্রোশ মানে তো বারো মাইল? ঘণ্টায় তিন মাইল ক'রেও যদি হাঁটি, তাতেও চব্বিশ মাইলে আট ঘণ্টা। ভোর চারটেয় উঠে বেরোলে একটার মধ্যে খুব বাড়ি ফেরা যাবে।

হরিদাস বললে, সত্যি যেতে চান?

আমি বললাম, নিশ্চয়। চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে ছাতের রঙই যদি খালি দেখব, তার জন্যে অ্যাদ্দুর ব'য়ে আসবার দরকার? ছাত তো বাড়িতেই দেখা যায়।

হরিদাস বললে, হেঁটে নয়, যেতে হ'লে যেতে হয় ঘোড়ায়। তার চেষ্টা দেখতে পারি।

আমি বললাম, ঘোড়া পাওয়া যায়?

হরিদাস বললে, ঘোড়া মানে কি আর আরবী ঘোড়া! দিশী টাট্টু।

আমি বললাম, তা হোক, কাজ তো চ'লে যাবে। আপনি ব্যবস্থা করুন।

হরিদাস বললে, বেশ। কিন্তু এখন এত রাত্রে ব্যবস্থা করা যাবে না, কাল সকালে। বেরোতে কিন্তু বেলা হয়ে যাবে তা হ'লে।

আমি বললাম, হ'লই বা। ঘোড়া তো ছুটবেও মানুষের চেয়ে বেশি। তা হ'লে সেই কথা রইল। মনে রাখবেন।

হরিদাস চ'লে গেল।

পরদিন সকালে হরিদাস ঠিক এসে হাজির। বললে, ঘোড়া তৈরি।

আমি বললাম, আমিও। কোথায় ঘোড়া ?

হরিদাস বললে, গাঁয়ের মধ্যে ঘোড়ায় চাপে না, লোকে রাজপুত্তুর বলে। ঘোড়া আছে গাঁয়ের বাইরে একজনের,—আমাদের পথেই পড়বে। এইটুকুন হেঁটে গিয়ে 'ওখান থেকে নিয়ে নোব।

বেশ কথা। পথে ক্ষিদে পাবে ব'লে কিছু লুচি আর চিনি খবরের কাগজে মুড়ে রেখেছিলাম। সেইটি হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘোড়ায় চেপে গ্রাম ছাড়িয়ে যখন বনের সীমানায় পৌঁছলাম, বেলা তখন প্রায় সাড়ে আটটা। দুর্গা ব'লে বনের ভেতর ঢুকে পড়লাম দু'জনে।

অপূর্ব ঘোড়া। তারা কদমে চলে না, হেঁটেই চলে, খুব তাড়াহুড়ো দিলে দুল্‌কি অবধি ওঠে।

আমি বললাম, ও হরিদাসবাবু, এ কি রকম ঘোড়া আপনাদের দেশের ?

· হরিদাস বললে, এই রকমই। এরা তো মানুষ বয় না বেশি, টমটম টেনেই বেড়ায়। তাই চলতিও এমনি হয়ে যায়।

আর খানিকদূর গিয়ে বুঝলাম, ঘোড়ার সে চলন তাদের দোষ নয়—গুণ, ঠেকে-শেখা বিদ্যে। কাঁচা মাটির রাস্তায় কদম চলে না,

তায় আবার বর্ষাকাল, পেছল রাস্তা। ঘোড়া তাই বুঝেই সাবধান হয়ে চলে।

বনের দৃশ্য সেখানকার সত্যিই চমৎকার, দেখবার মত। দু'ধারে দেখতে দেখতে চলেছি, ঘোড়াও আপন খুশিতে হেঁটে চলেছে। ওদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে, সেদিকে আমাদের খেয়াল নেই।

বনের মাইল দুই আন্দাজ ভেতরে ঢুকে দেখি, আর এক বিপদ। বর্ষাকালে এ পথে লোকজন চলে না—জল পেয়ে সমস্তটা পথ জুড়ে এক হাত উঁচু ঘাস গজিয়েছে। সেই ঘাসে ঘোড়াব পা জড়িয়ে যায়। ঘোড়া মোটে জোরে চলতে পাবে না।

যতই তাকে তাড়া দিই, সে ততই গজেন্দ্রগমনে চলে। পথ ছেড়ে বনের মধ্যে দিয়ে যাব, সে উপায়ও নেই, চারা গাছের জঙ্গল চারদিকে। আমি বললাম, দূর ছাই, এর চাইতে পায়ে হেঁটে আসাই ভাল ছিল।

হরিদাস বললে, না। পায়ে হেঁটে এলে এতক্ষণে ক'বার সাপের কামড় খেতে হ'ত তার ঠিক আছে?

বছরখানেক হ'ল ব্যাঙ্গালোরের জঙ্গলে সেই শঙ্খচূড়ের ছোবল খেয়ে এসেছি। সেই কথা মনে প'ড়ে গেল। বললাম, থাক, সাপের কামড়ে প্রাণ দেবার শখ নেই। কিন্তু এভাবে গেলে তো পৌঁছুতেই সন্ধ্যে হবে।

হরিদাস বললে, সন্ধ্যে না হ'লেও বিকেল হবে ঠিকই। তাব চেয়ে আসুন ফেরা যাক। এই ক'টা মাস বাদে শীতকালে তখন আসবেন, বেশ ভাল ক'রে সব দেখিয়ে দোব।

আমি বললাম, ফিরে যাব? ঘাসের ভয়ে? সে কথা আমার কুষ্টিতে লেখে না। আজ যদি নাই ফিরতে পারি, সেখানে রাত কাটানোর জায়গা নেই?

হরিদাস বললে, জায়গা আর কি, সেই মন্দিরের ভেতরে ব'সেই রাত কাটাতে হবে। অনেকে এমন থাকেও। হয়তো

অসময়ে গিয়ে আটকা প'ড়ে যায়, মন্দিরে রাত কাটিয়ে পরদিন ফিরে আসে।

আমি বললাম, তবে আর কি। চলুন এগিয়ে, যা থাকে বরাতে। ফেরা-টেরা হবে না।

হরিদাস বললে, চলুন।

চললাম।

আরও মাইল দুই।

কিন্তু যতই যাই, ঘোড়ার পা ততই আর চলতে চায় না। হরিদাসকে বললাম, ঘোড়াটা যেন খোঁড়াচ্ছে মনে হয়। নাল টাল খুলে গেল না তো?

হরিদাস বললে, আমারটাও খোঁড়াচ্ছে। দুটোরই নাল একসঙ্গে খুলতে পারে না। একটু সাফ জায়গা পেয়ে দেখতে হবে, কি হ'ল।

খানিকদূর গিয়ে খোলা জায়গা মিলল, সেখানটায় কি জানি কেন ঘাস গজায় নি। ঘোড়া দাঁড় করিয়ে নেমে তার পায়ের দিকে চেয়েই চক্ষুস্থির! দুটি ঘোড়ার আটখানি পা-ই ক্ষুর থেকে হাঁটু অবধি চার ইঞ্চি ক'রে মোটা হ'য়ে গেছে—ইয়া লম্বা লম্বা জোঁকে চামড়া একদম ঢাকা।

আমি আঁতকে উঠে বললাম, ওরে সর্বনাশ!

হরিদাস বললে, হেঁটে আসতে চেয়েছিলেন না? হেঁটে এলে এতক্ষণ থাকতেন কোথায়?

আমি বললাম, আর যেথাই হোক, ইহলোকে নয়। কিন্তু এখন উপায়?"

হরিদাস বললে, উপায় করছি, দাঁড়ান।

ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে হরিদাস পকেট থেকে দেশলাই বার করলে। কিছু টাটকা শুকনো পাতা কুড়িয়ে ঘোড়ার পায়ের কাছে জড়ো ক'রে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। আমাকে বললে, ঘোড়ার মুখ ধ'রে রাখুন, দৌড়ে না পালায়।

আগুন জ্ব'লে উঠল, আঁচ লেগে জোঁকগুলো ঘোড়ার পা ছেড়ে

টুপ টুপ ক'রে খ'সে পড়তে লাগল। ঘোড়া কিন্তু একটুও লাফাল না। দেখে বুঝলাম, তারা বরং আয়েসই পাচ্ছে। জোঁকে ধরলে ভয়ানক চুলকোয় কিনা ; আগুনের তাতে আরাম লাগে।

জোঁক ছেড়ে গেল, এবার রক্ত বন্ধ করার পালা। ঘোড়ার সব ক'খানা পা বেয়ে ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছে! রক্ত বন্ধ না হ'লে ঘোড়া মারা পড়বে। অথচ কি দিয়ে বন্ধ করি! জোঁকের কামড়ে দিতে হয় চুন ; কিন্তু আমরা কেউ পান খাই না, চুন সঙ্গে নেই। হরিদাস ছেলেটার দেখলাম, বুদ্ধি অনেক দিকে খেলে। বললে, চিনি আছে না আপনার মোড়কে ?

আমি বললাম, তা আছে। কিন্তু চিনি খাবেন কেন হঠাৎ ?

হরিদাস বললে, আমি নয়, ঘোড়া খাবে। বার করুন।

চিনি নিয়ে হরিদাস ঘোড়ার পায়ে চাপড়ে চাপড়ে লাগিয়ে দিলে। ক্রমে রক্ত অনেকটা বন্ধ হ'ল। তখন খানিকটা কাদামাটি নিয়ে খুব ক'রে সে ঘোড়ার পায়ে মাখিয়ে দিলে হাঁটু পর্যন্ত। বললে, কাদা ফুঁড়ে আর ছিনে জোঁক ঢুকতে পারবে না। ভাগ্যিস বা কাটে নি কোথাও। তা হ'লে আর এতে কুলোত না।

ঘোড়াকে সুস্থ ক'রে আবার চললাম। কিন্তু ঘোড়াকে আর দৌড় করানো গেল না। হরিদাস বললে, তাড়াহুড়ো ক'রে লাভ নেই, জোরে চলতে গেলেই আবার রক্ত ছুটবে।

ভাল কথা। বেলা ওদিকে বারোটা বাজে ; আদ্ধেক পথ জোর এসেছি। আমি বললাম, এ রেটে গেলে তো পৌঁছতেই রাত হবে।

হরিদাস বললে, তা হবে না ; আর খানিক পরে পথ ভাল আছে।

কিছু দূর এগিয়ে সত্যিই একটু ভাল পথ পাওয়া গেল। ভাল মানে আর কিছুই নয়, পাহাড়ে জমি সেখান থেকে শুরু হয়েছে, কাদা আর ঘাস দুটোই কম। ঘোড়াও যেন একটু স্বস্তি পেলে ; নিজে থেকেই একটু চাল বাড়িয়ে দিলে।

কিন্তু বিপদ যেন সেদিন আমাদের সঙ্গে আড়ি ক'রেই লেগেছিল।

বেলা তখন প্রায় তিনটে, মন্দির আর মাইলখানেক দূরে।

সামনে একটা বাঁকের পর থেকে রাস্তাটা একদম সোজা চ'লে গেছে।

হরিদাস বললে, সেই সোজা রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে একেবারে মন্দিরের দোরগোড়ায়।

ধীরে ধীরে আমরা যাচ্ছি। ঘোড়ারও পরিশ্রম হয়েছে, আমাদেরও কাহিল অবস্থা, তাড়াতাড়ি করবার মত উৎসাহ কারুই নেই। আগে আগে যাচ্ছে হরিদাস, পেছনে আমি।

বাঁকটা ফিরেই হরিদাস রাশ টেনে ঘোড়া থামালে। বনের মধ্যে এক জায়গায় তাকিয়ে বললে, এই সেরেছে!

আমিও তার পাশে গিয়ে থামলাম। বললাম, কি হ'ল আবার?

হরিদাস আঙুল দিয়ে এক জায়গায় দেখিয়ে বললে, দেখেছেন?

দেখলাম, সে জায়গাটায় গাছের চারাগুলো সব ভাঙা, কয়েকটা গাছের গুড়ির বাকল উঠে গেছে, যেন কোন ভারী জিনিস তার ওপরে ঘষা হয়েছে। দেখে বললাম, কি, হাতী?

হরিদাস বললে, তার চেয়ে ভীষণ জীব। গণ্ডার।

গণ্ডার! উত্তম প্রস্তাব। পকেট হাতিয়ারের মধ্যে একখানা পেন্সিল-কাটা ছুরি। বললাম, গণ্ডার আছে এখানে, বলেন নি তো?

হরিদাস বললে, থাকে না। ওপরকার তরাই থেকে মাঝে মাঝে নেমে আসে।

আমি বললাম, মানুষ মারে?

হরিদাস বললে, পেলে কি আর ছেড়ে দেয়। পালের ভেতর যেগুলো গুণ্ডা, সেইগুলোই তাড়া খেয়ে পাল ছেড়ে নেমে আসে কিনা। মানুষ ঘোড়া গরুর দেখা পেলেই হ'ল, আর রক্ষে নেই।

আমি বললাম, এখন উপায়? দেখে তো মনে হচ্ছে, এ দাগ অল্পক্ষণ আগেকার। দেখছেন না, গাছের গায়ে এখনও কষ শুকোয় নি।

হরিদাস বললে, ওটা হচ্ছে গণ্ডারের গা ঘষার দাগ। দাগ

দেখেই বুঝতে পারছেন, কতখানি উঁচু জীব।

আমি বললাম, কাছাকাছি আছে নাকি কে জানে!

হরিদাস বললে, খুব কাছে নেই। তা হ'লে ঘোড়ারা গন্ধ পেত। তবুও এখানে আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই। ঘোড়াকে ছোটান, লাগান চাবুক।

সারাদিনের মধ্যে চাবুকটাকে কাজে লাগাই নি। এবার লাগালাম। চাবুক খেয়ে ঘোড়া ছুটল। দশ মিনিটের মধ্যে মন্দিরের সামনে থামল।

হরিদাস বললে, এবার নিশ্চিন্ত। যদি এখানে এসেই পড়ে, মন্দিরে ঢুকে পড়া যাবে! আর এলে ঘোড়াও গন্ধ পাবে, ব্যারোমিটার খাড়াই রইল।

মন্দিরের সামনে একটা বেল-চারা। তার গায়ে ঘোড়া বেঁধে দু'জনে নেমে পড়লাম।

হরিদাস বলেছিল ঠিকই। রাস্তাটা সোজা উত্তর দিকে চ'লে এসেছে, আর মন্দির দক্ষিণমুখো—দেখে মনে হয়, যেন রাস্তাটা সোজা এসে মন্দিরেই ঢুকে পড়েছে। তাতে মন্দিরের থেকেও মোটেই উঁচু নয়, রাস্তা থেকেই সোজা মন্দিরে ঢুকে পড়তে হয়। সিঁড়ি বা রোয়াকের বালাই নেই।

মন্দিরের সামনে ছোট একটুখানি উঠোন, বোধ হয় পূজো দিতে যাবা আসে, তারাই সাফ ক'রে ক'রে রাখে। পাশে পেছনে গভীর জঙ্গল।

মন্দিরটা দেখে তার বয়স ঠাহর করতে পারলাম না। গায়ের পলস্তারা খ'সে পড়েছে, ইট দেখা যাচ্ছে। পাতলা ইট, দেড় ইঞ্চির বেশি পুরু নয়। মন্দিরটি ছোট্ট, চৌকো; পুরোনো কালের খড়ের চালের মত তার ছাতটা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। মজবুত গড়ন, আজকাল ও রকম গড়নই হয় না। মন্দিরে একটিমাত্র দরজা, তার কবাট নেই। দরজাটি হাত সাড়ে-চার খাড়া, হাত আড়াই চওড়া।

জানলা-টানলা কিছু নেই। মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখলাম, ঠাকুরটি আরও চমৎকার। আবছা আলোয় ভাল দৃষ্টি চলে না; দেশলাই জ্বেলে দেখলাম, মন্দিরের ঠিক দোরের সোজা মেঝেয় খাত কেটে কুণ্ড বানানো হয়েছে, তার মাঝখানে দেবমূর্তি। নাক-মুখ-হাত-পা-ওয়ালা প্রতিমা নয়—গোল একটি পাথরের কুঁদো। তার পায়ে শুকিয়ে আছে সিঁন্দুর-বিভূতি-চন্দনের দাগ। চারপাশে বেলপাতা আর ফুলের স্তূপ, শুকিয়ে প'চে গন্ধ ছাড়ছে।

দেখে বললাম, শিবমূর্তি তো সিঁদুর চন্দন কেন?

হরিদাস বললে, ওই তো মজা। এর নাম বুড়ো শিব, কিন্তু আসলে এটি যে দেবতার মন্দির কেউ জানে না। ভক্তদের অসুবিধে নেই, যে যা মনে ক'রে খুশি হয়, সে তেমনই ক'রে এর পূজো করে। কেউ দেয় শিব ব'লে বেলপাতা, কেউ দেয় শক্তি ব'লে জবা ফুল, কেউ দেয় নারায়ণ ব'লে তুলসী। ইনি আপত্তি করেন না, সকলের পূজোই সমান খুশি হয়ে খেয়ে যান। সেদিক থেকেই ইনিই খাঁটি দেবতা—একেবারে নির্বিকার নির্গুণ ব্রহ্ম। খান না কেবল একটি জিনিস—এখানে জীববলি হয় না।

আমি বললাম, কিন্তু মন্দিরে পূজারী পুরুত কাউকে তো দেখছি না!

হরিদাস বললে, ওইটি হচ্ছে এখানকার আর একটি বিশেষত্ব, এ মন্দিরে পুরুত নেই। এখানে তো দেখছেনই নিবিড় বন, জনমানব এখানে থাকে না। মন্দির সারা বছর খোলাই প'ড়ে থাকে, লোকজন যার যখন ইচ্ছে আসে, পূজো দিয়ে যায়। কোন জাতের বাছবিচেরও নেই, নিয়ম-পদ্ধতিরও কড়াকড়ি নেই।

মন্দির তো দেখা হ'ল, এবার প্রাণ বাঁচাবার পালা। ক্ষিদেয় তখন পেট চুঁই চুঁই করছে। বাণ্ডিল খুলে লুচি চিবোতে বসলাম। খাব ব'লে চিনি এনেছিলাম, সে লেগেছে ঘোড়ার পদসেবায়। বাকি

ছিল শুকনো লুচি, তাই কোন রকমে চিবিয়ে গলাধঃকরণ ক'রে পিত্তি ঠাণ্ডা করলাম। তারপর চিন্তা, এবার ফেরা যায় কি ক'রে।

ঘড়ি দেখলাম, চারটে বেজে গেছে। পথে সেই গণ্ডার, তায় অন্ধকারে পথ হারাবার ভয়। বাঘ-ভালুকও বেরোনো অসম্ভব নয়। অতএব সে রাত্রে ফেরবার কথা উঠতেই পারে না।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ওসব জায়গায় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে হয় না, একেবারে ধক ক'রে সব অন্ধকার হয়ে যায়—বনের নীচে আলো এমনিই কম থাকে কিনা।

ঘোড়া দুটিকে হারালে চলবে না, তখন তাদের ওপরেই ভরসা। ঘোড়াদের টেনে মন্দিরের ভেতর নিয়ে এলাম। ক্ষুদে মন্দির, এতগুলো জীবের জায়গা হওয়াই মুশকিল। মন্দিরের দুটি দিক তাদের ছেড়ে দিলাম, আর এক দিকে আমরা দু'জনে গুঁড়ি মেরে ব'সে পড়লাম। ঘুমোলে হবে না, বনের মধ্যে কখন কি জন্তু এসে হাজির হয়, কে জানে।

আমি বললাম, হরিদাসবাবু, দুজনেই জেগে থেকে লাভ নেই, পালা ক'রে ঘুমিয়ে নিন। সারাদিন ধকলটা তো কম যায় নি শরীরের ওপর দিয়ে।

হরিদাস হেসে বললে, ধকল তো আজ একদিন নয়, ক'দিন ধ'রেই যাচ্ছে। কিন্তু ঘুমুতে হবে না, ভয় নেই।

আমি বললাম, কিন্তু খালি খালি জেগে ব'সে থাকবেন কি ক'রে?

হরিদাস বললে, কিচ্ছু ভাবতে হবে না, সে যাদের রাখবার তারাই জাগিয়ে রাখবে দেখবেন।

খানিক পরেই টের পেলাম, তার কথা মিথ্যে নয়। অন্ধকার হতে না হতে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে আমাদের ছেঁকে ধরলে।

উঃ, সে কি মশা! যেন কেউ মুঠো ভ'রে ভ'রে মশা গায়ে মুখে ছুঁড়ে মারছে। আর মশাও এই এতবড় এতবড়! সর্বাঙ্গ চাপড়াতে চাপড়াতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাত ব্যথা হয়ে উঠল, তবু পরিত্রাণ নেই।

হরিদাস বললে, বৃথা নিজের হাতের থাপ্পড় খাচ্ছেন কান্তিবাবু, মেরে আপনি দশ বচ্ছরেও শেষ করতে পারবেন না। তার চেয়ে আমি যা বলি তাই করুন।

তার কথামত শার্টটাকে খুলে পেন্টুলুন ক'রে পরলাম, প'রে ধুতিটাকে দু' ভাঁজ ক'রে গায়ে মাথায় জড়িয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলাম। হরিদাসও তাই করলে।

ঘুমের দফা তো সারা, সারারাত ব'সে ঢুলছি, আর থেকে থেকে ঘড়ি দেখছি, রাত আর কত বাকি। ঘড়িটার রেডিয়াম ডায়াল তাই চাদরের ভেতরে ব'সেও দেখা যাচ্ছিল। দেশলাই জ্বালতে হ'লেই হাত বার করতে হ'ত।

এমনি ক'রে কোন রকমে সে রাত কাটল। সকাল হতেই হরিদাস বললে, আর দেরি নয়, এবার টেনে ছুট লাগান। ভাল ভোরোস্পর্শে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, মশাই, আপনি লোকটাই অপয়া।

শুকনো লুচি যেটুকু বাকি ছিল গিলে নিয়ে আবার ঘোড়ায় চাপলাম।

আবার আগে আগে হরিদাস, তার হাত কুড়িক পেছনে আমি। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে দু'জনে চলেছি। কোথা দিয়ে দুশমন বেরিয়ে পড়ে ঠিক কি।

কালকের সেই জায়গাটাতে এসে আমাদের বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল। হরিদাস বললে, এইটুকু পেরোতে পারলে হয়। গণ্ডাররা অনেক সময় একই জায়গায় ঘুরে ফিরে বেড়ায়—জায়গা সহজে ছাড়তে চায় না।

হরিদাস বাঁকের মুখে, পেছনে আমি। আমার চোখ পাশে বনের দিকে। হঠাৎ সামনে থেকে হরিদাস চেঁচিয়ে উঠল, কান্তিবাবু, গাছে উঠুন, শিগগির!

চেয়ে দেখি, সর্বনাশ! হরিদাস মাথার ওপরকার এক গাছের ডাল ধ'রে ঝুলছে, আর তার ঘোড়া টোঁচা দৌড়ে পালাচ্ছে।

কি হ'ল বোঝবার আগেই আমার ঘোড়াও থেমে দাঁড়াল, তারপর অস্থির হয়ে লাফালাফি শুরু করল, থামাতে পারি না। হরিদাস ঝুলতে ঝুলতেই চেঁচিয়ে বললে, বাঁচতে চান তো ডাল ধরুন, ডাল!

আমার তখন ভাববার সময় নেই। ঘোড়া ওদিকে দুই পায়ে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেছে, প'ড়ে যাই আর কি। চোখ বুজেই ওপর দিকে হাত বাড়ালাম, একটা গাছের ডাল হাতে ঠেকল, সেইটাকেই দু' হাতে ধ'রে ঝুলে পড়লাম। ঘোড়া তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আর তারপরই বাঁক ঘুরে দেখা দিলে গণ্ডার।

তার চেয়ে বড় গণ্ডার দেখি নি এমন নয়, কিন্তু অমন হিংস্র মূর্তি আর দেখি নি। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জায়গাটাকে যেন তোলপাড় ক'রে তুললে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে একবার আমার ঘোড়াটাকে তাড়া করলে, কিন্তু সে তখন নাগালের বাইরে। তাকে ধরতে পারবে না বুঝে গণ্ডার ফিরে এল। আমরা যেখানটায় ঝুলছি, সেইখানেই ঘোরাঘুরি শুরু করলে। রাগে ক্ষেপে উঠেছে, সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

হরিদাস ততক্ষণে ডাল বেয়ে গাছের ওপর উঠে গেছে। আমাকে বললে, দোল খেয়ে উঠে পড়ুন! দেরি করবেন না!

আর দেরি করবেন না! আমার তখন অবস্থা কাহিল। গাছে চড়তে আমি দক্ষ কোনও কালে নই; দোল খেয়ে উঠে পড়া সে যতটা সহজ ভাবে, আমার কাছে মোটেই তত সহজ নয়। তায় আবার কপালগুণে আমি ধ'রে ফেলেছি এক চারাগাছের ডাল, আমার সওয়া দু'মণ ওজনের ভারে সে গাছ নুয়ে পড়েছে আর লকলক ক'রে কাঁপছে, হাত ঠিক রাখাই মুশকিল। তার ওপর আবার সোনায় সোহাগা, গাছের গুড়িটা আমার পেছন দিকে।

হরিদাস বললে, ভাবছেন কি কান্তিবাবু, উঠে পড়ুন।

আমি ঝুলতে ঝুলতেই প্রাণপণ চেঁচিয়ে বললাম, উঠব কি ক'রে?

হরিদাস বললে, কব্জি ঘুরিয়ে পেছন ফিরুন, ফিরে পা তুলে ডালে বাধিয়ে দিন।

তার কথামত ঘুরে-টুরে কোনমতে পেছন তো ফিরলাম। তারপর একখানা হাত বাড়িয়ে সামনে আর একটা ডাল ধরতে যাচ্ছি, এমন সময় গাছের গুড়িতে এক ধাক্কা।

গণ্ডার ছুটে এসে গাছের ওপর পড়েছে। সমস্ত গাছটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে আমারও হাত গেল ফসকে, ধপাস ক'রে আমি প'ড়ে গেলাম।

পড়বি তো পড় একেবারে গণ্ডারের পিঠের ওপর। প'ড়েই মনে হ'ল, মাটিতে পড়লে আর রক্ষে নেই। ভাগ্যিস উপুড় হ'য়ে পড়েছিলাম, হাত পা ছড়িয়ে কোন রকমে টাল সামলে টিকে গেলাম। তারপর কোন রকমে উঠে তার পিঠে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলাম।

হাতীর পিঠটা থলথল করে, আর ক্রমাগত দুলতে থাকে, তাই হাতীর খালি পিঠে বসাই যায় না। গণ্ডারের এক সুবিধে, তার চামড়াটা টাইট আর খসখসে, পিছলে পড়ার ভয় থাকে না। কিন্তু ধন্য বলতে হবে তার চামড়াকে। অত বড় জীবটা পিঠের ওপর রয়েছি, গণ্ডার যেন টেরই পেলে না।

রাগে সে তখন ফুলছে। একবার এদিকে খানিকটা ছুটে যায়, আবার ফিরে ওদিকে ছোটে, কখনও বা এক জায়গায় গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, আর মুখ তুলে বাতাস শোঁকে। বুঝলাম সে আমার গন্ধ পেয়েছে, কিন্তু গন্ধটা কোন্ দিক থেকে আসছে ঠিক করতে পারছে না। ভাগ্যগুণে চমৎকার জায়গা পেয়ে গেছি; পিঠের ওপরে আমি আছি, সেখানে তার চোখ যায় না। এখন যদি কোন রকমে পিছলে মাটিতে প'ড়ে যাই, তবে আর রক্ষে নেই। এই জানোয়ারের হাতে পাঁচ মিনিটও প্রাণ বাঁচবে না।

গণ্ডারের ঘাড়ের চামড়া দু' ভাঁজ হ'য়ে থাকে, সেই ভাঁজের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে খিমচে ধ'রে প্রাণপণে সেঁটে ব'সে রইলাম।

প্রায় ঘণ্টা দুই ধ'রে গণ্ডার সমানে লাফালাফি করলে। তারপর পথের মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে গেল। নড়ে না চড়ে না, খালি মুখ তুলে তুলে এক-একবার বাতাস শোঁকে।

সে জায়গাটা ফাঁকা, মাথার ওপর গাছপালা কিছু নেই।

হরিদাস ওদিকে এ ডাল ও ডাল ক'রে আমার যতটা সম্ভব কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছে। মুখে বলেছিল, আমরা মুখ্যু; দেখলাম, সেটা তার নেহাৎ বিনয়। লেখাপড়া হয়তো না জানতে পারে, কিন্তু তার বুদ্ধি খেলে না এমন বস্তুই নেই। মাথার ওপর এসে বললে, কান্তিবাবু, মশায়, কেমন আছেন? বেশ বাহনটি পেয়ে গেছেন দেখছি!

কিছুতে ঘাবড়ায় না, বিপদের মুখে এ রকমের সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমার মনটা খুশি হয়ে উঠল। বললাম, বাহন তো ভালই, তবে বাগ মানতে চাইছে না, এই যা!

হরিদাস বললে, মানবে, মানবে, ক্রমশ মানবে। দুটো চারটে দিন যাক, তারপরই দেখবেন পোষ মেনে এসেছে। কি বলিস রে?

আমি বললাম, পোষ মানাবার মন্তরটাই যে জানি না।

হরিদাস বললে, মন্তর আর কি। একটু যত্ন ক'রে দানা-টানা খাওয়াবেন, আর গলার কাছটা মাঝে মাঝে চুলকে দেবেন। ওটা ভারি পছন্দ করে।

আমি বললাম, দানাই নেই মোটে।

হরিদাস বললে, কেন, লুচিগুলো কি হ'ল? সব সাবড়েছেন?

বললাম, সব।

হরিদাস বললে, তা হ'লে আর কি করবেন, ছেড়ে দিন, চ'রে খাক। তবে সাবধান, দেখবেন যেন প'ড়ে না যান। হাতছাড়া হয়ে গেলে কিন্তু আর ফিরে পাবেন না, দামী মাল।

আমি বললাম, রাজাসন যখন পেয়েছি একবার, মাটিতে পারতপক্ষে পা ছোঁয়াচ্ছি না। কিন্তু এর পরের অবস্থা?

হরিদাস বললে, সে পরের কথা পরে। আপাতত দু-চার ঘন্টার মধ্যে ও নড়ছে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।

আমি বললাম, নড়বে না?

হরিদাস বললে, না। ওদের ধারণা, না ন'ড়ে-চ'ড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলে ওদের মানুষ চিনতে পারে না, গোলাপ ফুল ব'লে ভুল করে। তাই অমন ঠায় দাঁড়িয়ে গেছে, মানুষ না জেনে কাছে এলে তখন মারবে। আপনি তা হ'লে ব'সে থাকুন, আমি ততক্ষণে একটু ঘুমিয়ে নিই।

আমি বললাম, ঘুমোবেন মানে?

সে বললে, ঘুমোব না তো কি করব ব'সে ব'সে। দেহ আর টানছে না, হাতেও কাজ নেই।

আমি বললাম, যদি প'ড়ে যান?

সে বললে, প'ড়ে অমনি গেলেই হ'ল? কাপড় দিয়ে নিজেকে বেঁধে নিচ্ছি ডালের সঙ্গে।

আমি বললাম, বেশ তো স্বার্থপর লোক মশাই! আমার বুঝি ঘুম পাচ্ছে না?

সে বললে, কি করব! আপনাকে তো বলেছিলাম, উঠে আসুন। তা না, আপনি গেলেন গণ্ডার ধরতে। তা যাক, এখন যা বলি শুনুন। গণ্ডার আবার যখন চলবে, মাথার ওপর ডাল পেলেই তাই ধ'রে গাছে উঠে পড়বেন, বুঝলেন?

আমি বললাম, বলা তো সোজা, করে কে! গাছে কি চড়েছি নাকি কোন জন্মে?

হরিদাস বললে, ঠেকায় পড়লে সবই পারে। গণ্ডারেই কি আগে চড়েছিলেন? যাক, আর বকাবেন না মশাই, আমি ঘুমোলাম। আর দেখবেন, ইতিমধ্যে যদি বাহন পোষ মানে, একা ফেলে যেন বাড়ি চ'লে যাবেন না। বিপদের সঙ্গী ব'লে মনে ক'রে ডেকে নেবেন কিন্তু।

সত্যি, দু' মিনিটের মধ্যে তার নাকের ডাক কানে এল। ধন্য ছেলে! এদেরই বাঁচা সার্থক।

সারাটি দিন একই ভাবে কাটল। গণ্ডার নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে, তার পিঠের ওপর আমিও তেমনই ঠায় ব'সে।

হরিদাস গাছে ব'সে ঘুমোচ্ছে, আর এক-একবার জেগে আমার সঙ্গে একটু গল্প করছে।

এর মধ্যে আমি একবার বললাম, আচ্ছা, বাড়ি থেকেই বা আমাদের খুঁজতে কেউ এল না কেন?

হরিদাস বললে, হয়তো বুঝেছে, আমরা এতক্ষণ বাঘের পেটে চ'লে গেছি, খুঁজতে এসে আর লাভ নেই।

সমস্তটা দিন কাটল। আবার সন্ধ্যে হয়ে এল। ক্ষিদেয় অনিদ্রায় উৎকণ্ঠায় তখন সমস্ত শরীর মন যেন অবশ হয়ে গেছে। দু' দিন ধ'রে স্নান নেই, কামানো নেই, সারাটা গা আর মুখে যা জ্বলুনি ধরেছে, সে অসহ্য। তার ওপর রাত হতেই আবার কালকের মত মশা। এবার যেন আরও বেশি। সে তবু ঘরের মধ্যে ছিল, এ একেবারে খোলা বন—চারিদিকের হাওয়ায় মশার ডাকে ঝমঝম ক'রে শব্দ হচ্ছে। গণ্ডারের গায়ে ব'সে রস মেলে না তারা জানে, কাজেই সমস্তটা আক্রমণ যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে। তাড়াবার চেষ্টা করব যে, হাত ছাড়বার উপায়ও নেই।

হরিদাস ওপর থেকে বললে, ও কান্তিবাবু, মশায় খাচ্ছে না তো?

আমি বললাম, বেড়ে আছেন মশাই। আপনাকে খায় না?

হরিদাস বললে, দোতলায় মশা থাকে না। আসুন না উঠে।

বললাম, আসছি। আপনি একটু চা করতে বলুন তৎক্ষণ।

ব'সে আছি, ব'সে আছি, আর ব'সে ব'সে ঝিমুনি আসছে।

তিন দিন ধ'রে বিশ্রাম নেই, কত আর সয়! মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছি, কাঁটা যেন আর নড়ে না।

রাত তখন দশটা প্রায়, আমি চোখ বুজে ঝিমোচ্ছি। হঠাৎ হ্যাঁক

ক'রে এক বিকট আওয়াজ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি। কি হ'ল বোঝবার আগেই হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলাম, গণ্ডারের পিঠে মুখ গুঁজে। থুতনিতে যা একখানা গুঁতো খেলাম, মনে হ'ল, যেন ভেঙেই গেল হাড়। উঠে ব'সে থুতনিতে হাত বোলাচ্ছি, ওপর থেকে আওয়াজ এল, কি হ'ল, ও মশাই ?

বললাম, কি জানি, ভূমিকম্প বোধ হয়।

হরিদাস বললে, ভূমিকম্প নয়, হাঁচি। বাহনের নাকে মশা ঢুকেছে। নাকটা চুলকে দিন, নইলে আবার হাঁচলে প'ড়ে যাবেন।

বললাম, নাক হাতে পাচ্ছি না। আপনি একটু দিয়ে যান না দয়া ক'রে।

হরিদাস বললে, কাল সকালে দোব'খন, এখন আমার ঘুম পাচ্ছে।

আবার ব'সে আছি। গণ্ডারের বুদ্ধি ছিল বলতে হবে, আর হাঁচলে না। ওই ঝাকুনি আর দু-চারটি হ'লেই গিয়েছিলাম।

রাত ক্রমে পুইয়ে এল। মাথাব ওপর গাছপালা নেই, চেয়ে দেখলাম, আকাশে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে।

দিন হ'লেও তবু বাঁচা যায়। আলো আরও একটু বাড়ল। বনের তলায় তখন একটু একটু দৃষ্টি চলে। ডেকে বললাম, ও হরিদাসবাবু!

হরিদাস ওপর থেকে বললে, ঘুমুচ্ছি, ডাকবেন না। আপনার খবর কি, ঘুম-টুম বেশ হ'ল ?

বললাম, হ'ল একরকম।

হরিদাস বললে, বাহন কি বলছে ?

বলতে বলতেই হঠাৎ গণ্ডারেরও যেন ঘুম ভাঙল। কি তার হ'ল কে জানে, হঠাৎ চার পা তুলে সে তিড়িং ক'রে এক লাফ মারলে, তারপর চোঁ-চাঁ নাক-বরাবর দৌড় মারলে। আমি প্রাণপণ ক'রে তার পিঠের ভাঁজ খামচে ধরলাম। হরিদাস চেঁচিয়ে বললে, হুঁশিয়ার,

হাত ছাড়বেন না।

গণ্ডার অত জোরে ছুটতে পারে, আগে জানতাম না। মাথা নীচু ক'রে মুখটা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে সে সোজা রাস্তা ধ'রে ছুটেছে। পিঠের ওপর আমি ব'সে আছি, আর মাঝে মাঝে দু'ধার থেকে সরু সরু গাছের ডাল চাবুকের মত শপাং ক'রে এসে গায়ে লাগছে।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই মন্দিরের কাছে এসে পড়লাম। গণ্ডার তখনও মাথা নীচু ক'রে ছুটছে, সামনে মন্দিরটা তার প্রায় চোখেই পড়ে নি। হঠাৎ আমার মনে হ'ল, হয়তো বাঁচবার উপায় হ'ল। মনে মনে বললাম, দোহাই বাবা বুড়ো শিব, এবার বাঁচলে বুঝব তোমার মাহাত্ম্য।

বাবা বুড়ো শিবের মাহাত্ম্য ছিল। তিনি তার প্রমাণ দিলেন।

গণ্ডারের গোঁ বিখ্যাত জিনিস। সেই গোঁ গণ্ডার নিজেও সামলাতে পারলে না, পথের শেষেই মন্দিরের দোর—সোজা গিয়ে সে দোর দিয়ে মন্দিরে ঢুকে পড়ল।

আমি পেছন দিকে লাফিয়ে পড়লাম, প'ড়েই আর ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে টেনে দৌড় লাগালাম। খানিকটা এসে দেখি, হরিদাস দৌড়ে আসছে। আমাকে দেখেই সে একবার থমকে দাঁড়ালে, তারপর ছুটে এসে দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, বাঁচালেন মশাই, দড়ির পয়সাটা বেঁচে গেল!

আমি বললাম, কেন?

সে বললে, কেন, বোঝেন না? আপনাকে আমিই বুদ্ধি দিয়ে নিয়ে এসেছি, বাড়ি গিয়ে মুখ দেখাতাম কি ক'রে!

দেখলাম, তার দুই চোখে জল ভ'রে এসেছে।

আমি চেয়ে আছি দেখে তার খেয়াল হ'ল, চোখ মুছে একটু হেসে বললে, বাহন কোথায় গেল?

বললাম, মন্দিরে। শিবপূজো করছে।

হরিদাস আমার পিঠ চাপড়ে বললে, সাবাস! থাক ওইখানে

বেটা প'চে। মন্দিরের ভেতরে জাম হয়ে গেছে তো? এখন বুদ্ধি ক'রে পেছন হেঁটে বেরোতে পারে তো বেরোবে, না হয় ওইখানেই ম'রে থাকবে। চমৎকার ফাঁদ হয়েছে।

আমি বললাম, এবার বাড়ি চলুন।

হরিদাস বললে, আমি তো তবু ঘুমিয়েছি, আপনি চলতে পারবেন? তার চেয়ে এক কাজ করুন না, গাছে চ'ড়ে একটু ঘুমিয়ে নিন।

আমি বললাম, আর ঘুমোয় না। চলুন আমি যেতে পারব।

সেই বনের পথে ছুটতে ছুটতে আছাড় খেতে খেতে দুজনে ফিরলাম। প্রায় চার পাঁচ মাইল এসে দেখা হ'ল মস্ত একটা দলের সঙ্গে। তারা আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে।

তাদের সঙ্গে বাড়ি এসে পৌঁছলাম। এসে দেখি, আমি নিখোঁজ ব'লে দলবল সবাই সেইখানে আটকে রয়েছে। সেই রাত্রেই বাড়িমুখো রওনা হলাম।

হরিদাস ছেলেটার আর খবর পাই নি। বেঁচে আছে কি মরেছে, তাও জানি না। কিন্তু বড় চমৎকার লেগেছিল তাকে। বন্ধু করতে হয় তো ওই রকম লোককে।

আমরা বলিলাম, কিন্তু আপনি যে বললেন, দাড়ির জন্যে প্রাণ বাঁচল, তা হ'ল কই?

কান্তি চৌধুরী চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, কি শুনলে তবে এতক্ষণ ধ'রে? নাঃ, তোমাদের কিছু বলাই ঝকমারি। মাথার ভেতরে একেবারে কিচ্ছু নেই, আস কেন আমাকে মিছিমিছি বকাতে?

আমরা কাতর হইয়া বলিলাম, সব যদি বুঝব, তবে আর আপনার কাছে শুনতে আসব কেন, নিজেরাই তো ভেবে নিতে পারতাম। বলুন না!

কান্তি চৌধুরী প্রীত হইয়া বলিলেন, বেশ, শোন। গণ্ডার দৌড়ে

গিয়ে মন্দিরে ঢুকল ব'লেই তো বেঁচে গেলাম ? কিন্তু বল তো, গণ্ডার অমন করে দৌড় দিলে কেন ?

আমরা বলিলাম, বুঝি না।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, গণ্ডারের পিঠে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম, মুখে ছিল দু' দিনের দাড়ি, সেই দাড়ির খোঁচা লেগে। তা হ'লে দাড়ির দরুণই বেঁচে গেলাম বলব না ?

আমরা বলিলাম, কিন্তু আপনি তো প'ড়ে গেলেন রাত দশটায়, আর গণ্ডার দৌড়ল সকালবেলা ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দৌড়োয়। এ কি তোমাদের ফিনফিনে কলেজে-পড়া চামড়া পেয়েছ ? এর নাম গণ্ডারের চামড়া, এতে রাত দশটায় খোঁচা লাগলে টের পেতে ভোর ছ'টাই বাজে।

বাইসন ও বায়োস্কোপ

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

নীলগিরিতে বদলি হয়ে ছিলাম বছর তিনেক। শিকারের পক্ষে খাসা জায়গা। বাঘ, ভালুক, হরিণ, মোষ—এসব তো রয়েইছে, এ ছাড়াও আর একটি জীব আছে, যা ইণ্ডিয়ার আর কোথাও নেই—বাইসন। এই বাইসন নিয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল আমি ওখানে থাকতে। এটা অবশ্য ঠিক আমার শিকারের গল্প নয়, কারণ সে বাইসন আমি নিজের হাতে মারি নি। তবু সবসুদ্ধ ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত অলৌকিক যে, সে না শুনলে তোমাদের কিছুই শোনা হ'ল না।

একটি কথা গোড়াতেই ব'লে নিই। একটা ধারণা অনেকের মনে থাকে দেখেছি, বাইসনকে তারা বলেন, বন-মোষ। কথাটা ভুল। বাইসন মোষ নয়; যদি বলতেই হয়, তবে বরং একে বলা উচিত বন-গরু। ইণ্ডিয়ার অনেক জায়গাতে বলে 'গয়াল'। সংস্কৃতেও বাইসনের নাম 'গবয়', ওটা গো থেকে হয়েছে।

আকৃতিতে গরুর জাতভাই হ'লেও প্রকৃতিতে কিন্তু বাইসন মোটেই গরুর মত নয়। বলতে কি, অমন দুর্দান্ত জীব কমই আছে পৃথিবীতে। এমন যে বনের রাজা সিংহ, সেও বাইসন দেখলে লেজ গুটিয়ে পালাবার পথ পায় না। এক জব্দ হয়েছে তারা মানুষের কাছে, সেও বন্দুক আবিষ্কার হবার পরে। ইউরোপে এক সময়ে বাইসনের মেলা ছিল—রাতারাতি দল বেঁধে এসে গাঁ-কে গাঁ ভেঙে-চুরে ছারখার ক'রে দিয়ে যেত। ইউরোপে এখন একটাও বাইসন নেই। ওর বংশকে ঝাড়ে-মূলে শেষ ক'রে দিয়ে তবেই তারা ঘর করছে। তা না হ'লে, এত বড় সিভিলিজেশন আর গ'ড়ে তুলতে হ'ত না, বাইসনের গুঁতোতেই

সব ছত্রখান হয়ে যেত। বাইসনের বড় আড্ডা এখন আমেরিকা, সেখানে তারা যেদিকটায় থাকে, তার ত্রিসীমানায় মানুষের বাস নেই।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আর হিংস্র বাইসন ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির। এখন তাদের বংশ লোপ হয়ে গেছে। আজকাল বড় বাইসন আমেরিকাতেই মেলে। কিন্তু আমাদের নীলগিরির বাইসনও খুব কম যায় না তাই ব'লে। আমি যেটার কথা বলছি, সে তো দস্তুরমত একটা বিরাট ব্যাপার ছিল।

তিন মাসের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছিলাম, মেয়ের বিয়ে দিতে। দূর দেশ, তায় পথঘাট খাবাপ, লটবহর টেনে দেশে আসাটা হামেশা হয়ে উঠত না। তাই আমরা বাঙালী যে-ক'জন ছিলাম, এক বছর দেড় বছরের ছুটি জমিয়ে নিয়ে একেবারে আসতাম।

দেশ থেকে ফিরে যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম, সেদিনটা ভারি বাদলা। লোকজনের সঙ্গে একটু দেখা-সাক্ষাৎ করতে বেরোব, সে একেবারে অসম্ভব। অথচ সেটি আমার ছুটির শেষ দিন—শনিবার, সোমবারে আমাকে জয়েন করতে হবে। একটি মাত্র দিন মধ্যে।

সকালবেলাটা তবু যা হোক ক'রে কাটল, দুপুরবেলায় আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠলাম। বললাম, ধুত্তোর, কাঁহাতক এমন ব'সে থাকা যায়! দাও তো রেন্‌কোটটা বার ক'রে, একটু ঘুরে আসি।

গিন্নী বললেন, তা বটে! কাল সারাটি রাত এসেছ রেলে ঠাণ্ডা লাগিয়ে, তার ওপর এখন বিষ্টিতে ভিজে জ্বর বাধাও! ওসব হবে না।

আমি বললাম, কি পাগল, অসুখ হতে আমার দেখেছ কখনও? আর এতকাল পরে এলাম, একবার দেখা করতে যাব না, লোকগুলো কি ভাববে?

গিন্নি বললেন, ভাবুক গে যা খুশি। এই বাদলায় কোথাও যাওয়া-টাওয়া চলবে না, সোজা কথা।—ব'লে দুম দুম ক'রে পা ফেলে চ'লে গেলেন।

আমার গিন্নীটির এই একটি মজা দেখেছি। এমনিতে এমন

বুদ্ধিমতী, অথচ এক এক সময় যেন ছেলেমানুষের মত অবুঝ হয়ে যান। বেরোনো হ'ল না, মিছে ঝগড়াঝাঁটি বাড়িয়ে কি লাভ। সারাটা দুপুর ধ'রে অঝোর ধারায় বিষ্টি চলল, আমিও ইজিচেয়ারে শাল মুড়ি দিয়ে বই প'ড়ে প'ড়ে কাটালাম।

বিকেলের দিকে বিষ্টিটা ক'মে এল। চেয়ে দেখলাম, আকাশ একটু পরিষ্কার হয়ে এসেছে। চাকরকে ডেকে বললাম, ওরে বিশু, খানিকটা কড়া ক'রে চা এনে দে তো বাবা, খেয়ে একবার একটু বেরোই।

বিশু আমার অনেক কালের চাকর। তার জিম্মাতেই বাড়ি রেখে দেশে এসেছিলাম। চা সে এনে দিলে, দিয়ে বললে, কিন্তু এখন সন্ধ্যের মুখে বেরোবেন না, ফিরতে রাত হ'য়ে যাবে।

আমি বললাম, কেন, তোমাকেও গিন্নীমা মন্তর দিয়েছেন নাকি?

সে বললে, ঠাণ্ডার জন্যে বলছি না। একটা গরু বেরিয়েছে।

আমি বললাম, গরু বেরিয়েছে কি?

সে বললে, এ গরু নয়, পাহাড়ী গরু। ওই যে বিশন না কি বলে।

আমি বললাম, বাইসন?

সে বললে, হ্যাঁ। তাই এসেছে।

বাইসন এসেছে কি রে বাবা? বাইসন সে অঞ্চলে আছে জানি কিন্তু তারা থাকে মাঠে—লোকালয় থেকে অনেক দূরে। শহরে আসবে কোত্থেকে?

বিশু বললে, তা কি জানি, দিন সাতেক হ'ল, তার একটা এসে শহরে ঢুকেছে। সারা রাত দৌরাত্ম্যি ক'রে বেড়ায়। ভয়ে কেউ সন্ধ্যের পরে ঘর থেকে বেরোয় না।

একদম বাজে কথা। বাইসন একটা কোন গতিকে ছিটকে এসে শহরে ঢুকেছিল, এ পর্যন্ত যদি বা মেনে নিই, সাত-সাতটা দিন সে শহরের মধ্যে টিকে আছে, এমন হতেই পারে না। শহর ভর্তি মানুষ আছে, পুলিস আছে তবে কি করতে?

বললাম, আচ্ছা আচ্ছা, তুই এখন পালা।

বিশু বললে, বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু আমি মিছে কথা বলি নি। ওই তো জগদীশবাবু আসছেন, ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না!

জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলাম, সেখানকার একটি ভদ্রলোক বাড়িতে ঢুকছেন।

বিশু দোর খুলে দিয়ে চ'লে গেল। জগদীশবাবু এসে ঘরে বসলেন।

জগদীশবাবুদের আদ্‌বাড়ি রঙপুরের দিকে, তিন পুরুষ ধ'রে নীলগিরিতেই ডমিসাইল হয়ে গেছেন। ওখানে একটা বায়োস্কোপের বাড়ি খুলে ব্যবসা চালাচ্ছেন, তিনিই তার মালিক ম্যানেজার সব। আমার সঙ্গে সাধারণ রকম আলাপ-পরিচয় ছিল, যেমন লোকের সঙ্গে লোকের হয়ে থাকে। ব'সে বললেন, ছেলেদের মুখে শুনলাম, আপনি এসেছেন, তাই একবার এলাম। কখন পৌঁছলেন এসে?

আমি বললাম, আজই সকালবেলা। বাদলার জন্যে বেরোতে পারি নি, নইলে আমারই উচিত ছিল একবার ঘুরে আসা।

বিশু চা দিয়ে গেল। জগদীশবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, কিন্তু আপনি আজ এসে পড়ায় আমি ভারি বল পেয়ে গেছি। সেই কথাটাই বলতে এলাম। চলুন না, আজ একবার ছবি দেখে আসবেন।

আমি বললাম, ছবি মানে, বায়োস্কোপ? এই বাদলায়?

জগদীশবাবু বললেন, বাদলাতেই তো মজা।

আমি বললাম, মাপ করবেন মশাই। ও মেমসায়েবের ঠ্যাঙ দেখা আমার সয় না। আমি বুঝি, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, গণ্ডার। ব'সে ব'সে খালি মেমের নাচ আর চোখ-ঘুরুনি দেখা কি ভদ্রলোকের পোষায়?

জগদীশবাবু বললেন, আহা, আগে থাকতেই ঘাবড়াচ্ছেন কেন। মেমসায়েবের ছবি নয়, বাঘ-ভাল্লুকেরই মেলা—'আফ্রিকা স্পীক্‌স'। কেমন, যাবেন তো?

'আফ্রিকা স্পীক্‌স' আমি আগেও দেখেছি। বড় ভাল বই, অনেক কিছু শেখবার জিনিস আছে। তোমরা যে না দেখেছ, এবার এলে দেখো। সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে তার মধ্যে আবার একটা জায়গা —আফ্রিকার নান্দী আর মাসাই জাতেরা কি রকম ক'রে সিংহ মারে, তার ছবি। নাম শুনে সেই জায়গাটা আবার দেখবার ইচ্ছে হ'ল। বললাম, আচ্ছা, 'আফ্রিকা স্পীক্‌স' হ'লে যেতে পারি, আপত্তি নেই।

শুনে জগদীশবাবু যেন স্বস্তি পেলেন ব'লে মনে হ'ল। একটু আশ্চর্যও লাগল। কোন দিন তিনি এ রকম জোর করেন না, আজই আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি এত অস্থির কেন? বললাম, কিন্তু ব্যাপারখানা কি বলুন তো? হঠাৎ আমাকে পাকড়াবার এত তাড়া কেন?

জগদীশবাবু বললেন, আর বলবেন না ভাই, ফ্যাসাদে পড়া গেছে। এখন আপনারা না রাখলে মারা যাই।

বললাম, কিসের ফ্যাসাদ?

জগদীশবাবু বললেন, কদিন ধ'রে একটা সায়েব এসেছে, রাজার গুষ্টির নাকি কে হয়। তাকে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনার আর পুলিস-সায়েবদের ছুটোছুটির আর অন্ত নেই। এখন তিনিটির হঠাৎ শখ হয়েছে সিনেমা দেখবেন, আজ যাবার কথা। অথচ যা দিনকাল পড়েছে, আমার ওখানে থাকতে থাকতে যদি কেউ তাকে গুলি টুলি ক'রে বসে, তবেই আমি গেছি। আপনারা দু'জন থাকলে আমি একটু বল পাই।

আমি বললাম, তার মানে আমাকে তার বডিগার্ড হতে হবে? আমি পারব না মশাই। তার চেয়ে আমার গুর্খা দারোয়ানটাকে নিয়ে যান।

জগদীশবাবু বললেন, ছি ছি, বডিগার্ড হতে যাবেন কেন আপনি? আমার আপনি বন্ধু ব'লেই বলছি, গেলে আমি একটু ভরসা পাব। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি মশাই, আমার হয়েছে উভয়-সঙ্কট—বুঝতে

পেরেছেন? আপনারা না বাঁচালে বিদেশে বাঙালীকে কে বাঁচাবে বলুন? 'না' বললে আমি ছাড়ছি না আপনাকে।—ব'লে ভদ্রলোক উপুড় হয়ে একেবারে আমার হাত চেপে ধরলেন।

লজ্জায় পড়লাম। বললাম, আচ্ছা আচ্ছা, যাব, এখন হাত ছাড়ুন।

জগদীশবাবু উঠে বসলেন, বললেন, বাঁচালেন ভাই, আমার একটা দুর্ভাবনা ঘুচল। আপনাকে বন্দুক নিতে হবে না, কিছু না, শুধু গিয়ে ধারটিতে ব'সে থাকবেন। মানে, কি জানেন, আপনি হলেন একজন নামজাদা লোক, বন্দুকে পিস্তলে আপনার টিপের কথা না জানে এমন মানুষ নীলগিরিতে নেই। আপনাকে উপস্থিত দেখলে আর কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না।

আমি বললাম, বেশ। কিন্তু যাব যে, আপনাদের তো শুনছি নাকি বাইসন বেরিয়েছে শহরে।

জগদীশবাবু হেসে বললেন, এর মধ্যেই শুনেছেন? নাঃ, এ শহরের লোকেদের বুকের জোর আছে, মানতেই হবে।

আমি বললাম, কিন্তু কথাটা কি, খুলে বলুন তো? সত্যি এসেছে বাইসন?

জগদীশবাবু বললেন, আপনিও যেমন! বাইসন শহরের ভেতরে আসে, শুনেছেন কখনও?

বললাম, তবে?

তিনি বললেন, কিচ্ছু না। কদিন হ'ল একটা ষাঁড় বোধ হয় ক্ষেপে গিয়েছিল। রাতের বেলা সে দুদ্দাড় ক'রে বেরিয়েছে, দুটো লোককে জখমও করেছে। শুনেছি, তার একজন নাকি মারাই গেছে হাসপাতালে। বাস্, আর পায় কে, শহরের লোক ভয়ে অস্থির। বাইসন এসেছে, রোজ বিশ-ত্রিশটা ক'রে লোককে ঘায়েল করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি রকমের সব লোমহর্ষণ বুলেটিন মুখে মুখে ছড়াচ্ছে। আরে বাবা, কেউই তো তোরা বেরুচ্ছিস না ঘর ছেড়ে—মারবে যে, বিশ-ত্রিশটা লোক পাচ্ছে কোথায় সে রোজ রোজ?

আমি বললাম, যাক, যাচ্ছি তো, দেখবেন, যেন শেষে বাইসনে খায় না।

জগদীশবাবু বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই, আমি তো থাকব সঙ্গে। নেহাৎই যদি খেতে আসে, অ্যায়সা এক ধমক লাগাব, ছুটে পালাতে পথ পাবে না।—ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসির ধাক্কায় আমার ঘরের ছাত কেঁপে উঠল, ফাট ধরে আর কি।

কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেন নি, গলা নিয়ে গর্ব করতে পারতেন বটে ভদ্রলোক। জীবনে বহু জায়গায় ঘুরেছি, অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি, এমন একখানা জাহাঁবাজ গলা আর দেখলাম না। সে যেন বাজের আওয়াজ, যেমন গম্ভীর, তেমনই ভরাট ; সে গলার একখানা ধমক খেলে বাইসন তো বাইসন, হাতী অবধি উলটে প'ড়ে যায়।

আমিও হেসে বললাম, বেশ, আপনার গলা ধ'রেই ঝুলে পড়লাম। যা করেন কালী।

জগদীশবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, আমি এখন যাই তা হ'লে। ছ'টা আন্দাজ এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।

বিশু ছাতা ধ'রে তাকে গাড়িতে পৌঁছে দিলে। ফিরে এসে আমাকে বললে, আপনি আজ বায়োস্কোপে যাবেন ?

আমি বললাম, ভয় নেই রে তোর, বাছুর আমাকে খাবে না।

সে বললে, করুন যা ভাল বোঝেন। কিন্তু আমার ভাল ঠেকছে না। যে দুটো লোককে মেরেছে, তারা বুনো। বুনোরা মিছে কথা কয় না।

আমি বললাম, জ্বালালে। তোর যদি ভয় ধ'রে থাকে, তুই কাঁথামুড়ি দিগে যা। আমাকে বকাস নি।

ছ'টার সময় জগদীশবাবু এসে আমাকে তুলে নিলেন। স' ছটায় টাইম।

গিয়ে দেখলাম, এমন নামজাদা বই, তবু লোক বিশেষ হয় নি। বাদলা, বাইসনের আতঙ্ক আর সেদিন বিশেষ ক'রে পুলিসের কড়াকড়ি

—তিনে মিলেই দিশী লোকদের উৎসাহ কমিয়ে দিয়েছে বোধ হয়। নীচের হলটায় পাবলিকের বসবার জায়গা, সেখানে বড় জোর জন পঞ্চাশেক লোক ব'সে আছে। ওপরের বক্সগুলো কিন্তু সব একবারে ঠাসা—বড় থেকে চুনোপুটি সায়েব ফিরিঙ্গি কেউ আর আসতে বাকি নেই। মাঝখানে রয়াল বক্সে সেই মূল্যবান সায়েবটি। তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার দুই বডিগার্ড আর দুটো সার্জেণ্ট, সবার বেল্টেই পিস্তল। সায়েবের এক পাশে ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিস-সায়েব। আর-এক পাশে বসলাম আমি আর জগদীশবাবু।

প্রথমে একটা ছোট কমিক। তারপর খানিকটা খেলা-ধূলোর ছবি দেখিয়ে আসল বই শুরু হ'ল।

গোড়ার দিকটায় তেমন কিছু দেখবার নেই, সবই আমার জানা কথা। তারপর ক্রমে সেই সিংহ শিকারের জায়গাটা কাছে এল। আমিও খাড়া হ'য়ে উঠে বসলাম।

নান্দীদের সিংহ শিকারের নিয়মটা অদ্ভুত--যেমন লাগে তাতে গায়ের জোর, তেমনই লাগে বুকের পাটা। সবাই মিলে গোল হয়ে তারা সিংহকে ঘিরে ফেলে, তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘেরটা কমিয়ে ছোট ক'রে আনতে থাকে। অস্ত্র বলতে তাদের সম্বল শুধু বড় বড় বল্লম, আর লতা দিয়ে বোনা ঢাল। সেই ঢালের ওপর বল্লম দিয়ে পিটে তারা বাজনা বাজায়, আর তার তালে তালে গান গায়। গানের আওয়াজে সিংহ ক্ষেপে ওঠে। তারপর লাইন ভেঙে পালাবে ব'লে হঠাৎ লাফ মেরে এক দিকের একটা লোককে পেড়ে ফেলে। সে তক্ষুনি বল্লম ফেলে সিংহকে জড়িয়ে ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বল্লম ছুটে এসে সিংহকে একেবারে ভীষ্মের শরশয্যা বানিয়ে দেয়। সবসুদ্ধ সে একটা দেখবার মত জিনিস।

সমস্ত হলে টুঁ শব্দটি নেই। আমরা ঝুঁকে ব'সে নান্দীদের যুদ্ধযাত্রা দেখছি।

দল বেঁধে ঢাল বল্লম নিয়ে তারা গ্রাম থেকে বেরোল। মাঠের

পারে সিংহ ব'সে ছিল, তাকে গিয়ে ঘিরে ফেললে। সিংহও উঠে দাঁড়াল। নান্দীদের লাইন ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। সিংহ দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলে। তারপর কেশর ফুলিয়ে এক গর্জন ছেড়ে সামনের দিকে ছুটে এল। নান্দীরা বল্লম তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ওদিকে কিন্তু আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। সিংহের গর্জন মিলিয়ে যেতে না যেতে হলের বাইরে থেকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেল।

সে হাঁক জীবনে যে একবার শুনেছে, তার চিনতে ভুল হয় না। বিশুটাই ঠিক বলেছিল—বাইসন।

সঙ্গে সঙ্গে নীচে হলের মধ্যে যেন একটা দমকা হাওয়া ব'য়ে গেল। বাইসনের হাঁক কানে আসতেই লোকগুলো সব তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠল, তারপর সুটসাট, যে যেখান দিয়ে পারে দৌড়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, ভয়ে কারু মুখে কথাটি নেই, অথচ এ ওকে ঠেলে টেনে সরিয়ে ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে—সে যেন পুরোনো কালের একটা সাইলেণ্ট ছবি। আধ মিনিটের ভেতর হল খালি হয়ে গেল।

ছবি কিন্তু ঠিক চলছে। সায়েবরা রয়েছেন, স্পেশাল নাইট, ছবি বন্ধ হওয়ার জো নেই। তাতে এমন নিঃশব্দে চক্ষের পলকে নীচের হল খালি হয়ে গেছে, সেদিকে বোধ হয় সকলের নজরও পড়ে নি।

আমি আবার ছবির দিকে তাকালাম। সিংহ তখন সোজা ছুটে নান্দীরা যেখানে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তার সামনেটায় এসে পড়েছে। সেইখানে এসে সে একবার থেমে দাঁড়াল, পাঁজরায় ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে ভয়ানক গর্জন ক'রে উঠল। আর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পায়ের নীচে হলের ভেতরে পালটা গর্জন উঠল। বাইসন হলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

বাইসনকে সিংহ ভয় করে, জানতাম। কিন্তু বায়োস্কোপের ছবির কি সত্যি প্রাণ আছে? বললে বিশ্বাস করবে না তোমরা, কিন্তু

আমি এক অক্ষর বানিয়ে বলছি না—সত্যিই যেন পাগলা বাইসনকে সামনে দেখে ছবির সেই সিংহেরও ভয় ধরল। সামনের দিকে লাফ মারতে মারতে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম, সে নড়ছে না চড়ছে না, যেন তার সমস্ত দেহ একেবারে জ'মে পাথর হ'য়ে গেছে। চট ক'রে উঠে রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখলাম, আমাদের ঠিক নীচেই বাইসন দাঁড়িয়ে। আবছা অন্ধকারে চেহারাটা ভাল দেখা যায় না ; মনে হ'ল, যেন অন্ধকারের একটি ছোট্ট পাহাড়। নিথর নিস্পন্দ, এক দৃষ্টে ছবির পর্দায় সিংহের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে।

সেকেণ্ড দু'তিন এই ভাবে কাটল। তারপর আমার কানের পাশে জগদীশবাবুর গলাখানা বেজে উঠল, অর্ডার!

গলা বটে! সেই বাজের ধমক খেয়ে সিংহের যেন মূর্ছা ছুটে গেল। সে নিস্পন্দ হ'য়ে গিয়েছিল, আবার ন'ড়ে উঠল।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! ছবির যা গল্প, তাতে তার তখন সামনে লাফ মেরে নান্দীদের ওপর পড়বার কথা। তা না ক'রে সে এক পা এক পা ক'রে পেছু হটতে শুরু করলে। আর তার সে তেজ নেই, সে গর্জন নেই, সামনে বাইসনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে পায়ে পায়ে পেছিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে অনেক দূর পেছনে গিয়ে সে দাঁড়াল, দাঁত বার ক'রে একবার গর-গর ক'রে উঠল। এবার আর আগের মত গর্জন নয়। বরং আওয়াজ শুনে মনে হ'ল গর্জনটাকে সে উলটো ঢোক গিলে গলার ভেতরে ফিরিয়ে নিচ্ছে, যেন বাইসনের কাছে মাপ চেয়ে বলছে, উইথ্‌ড্রন।

কিন্তু বাইসন তার সে কাতর মিনতিতে কান দিলে না। তার আওয়াজ কানে যেতেই সে হাঁক ছেড়ে একেবারে সোজা চার্জ করলে —কামানের গোলার মত সিধে ছুটে গিয়ে স্টেজের ওপর লাফিয়ে উঠে সিংহকে এক প্রচণ্ড গুঁতো বসিয়ে দিলে। ক্রাশ্‌ ক'রে পর্দাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

বক্সে ব'সে মেমসায়েবরা চীৎকার ক'রে উঠল। জগদীশবাবু চেঁচিয়ে বললেন, লাইট।

সঙ্গে সঙ্গে হলের সমস্ত আলো জ্ব'লে উঠল। আমরা সবাই আসন ছেড়ে ছুটে গিয়ে রেলিং ধ'রে দাঁড়ালাম।

নীচে তখন প্রলয়কাণ্ড চলেছে। আলো জ্বলতেই ছবি অদৃশ্য হয়েছে—সিংহকে না খুঁজে পেয়ে বাইসন একেবারে ক্ষেপে উঠল। লাফিয়ে সে স্টেজ থেকে নেমে এল, শিঙে ক'রে চেয়ারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। তার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে কয়েকজন মেম ফিট হয়ে পড়ল, সায়েবরা তাদের নিয়ে ব্যস্ত। ওদিকে বাইসন খালি গাঁক গাঁক ক'রে গজরাচ্ছে আর চেয়ার টুল সব ভেঙে একশা ক'রে দিচ্ছে।

জগদীশবাবু চেয়ে চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, দেউলে ক'রে ছাড়লে।

পুলিস-সায়েব সার্জেন্টদের বললেন, গুলি চালাও।—ব'লে নিজেই পিস্তল বার ক'রে তাকে তাক ক'রে ঘোড়া টানলেন। সার্জেন্ট আর বডিগার্ডদের পিস্তলও ছুটল।

বীভৎস দৃশ্য। হলের মধ্যে আটকা পড়েছে বাইসন—চারিদিকে চেয়ার রেলিং আর গ্যালারির চাপে ভাল ক'রে নড়তে চড়তেও পারছে না, পায়ে পায়ে হোঁচট খাচ্ছে। আর ওপর থেকে চার-পাঁচজন লোক সমানে তার ওপরে গুলি চালাচ্ছে। বাইসনের সারা গা বেয়ে ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছে, তবু পিস্তলের পাঁচ-দশটা গুলিতে কাবু হবার জীব সে নয়। ওর মধ্যেই সে প্রাণপণে ছোটাছুটি করতে লাগল। একবার ছুটে গিয়ে দোরের ওপর পড়লও, কিন্তু সে দোরগুলো খোলে হলের ভেতর দিকে—ভেতর থেকে ঠেলা খেলে তারা চৌকাটের ওপর সেঁটে ব'সে যায়, না ভেঙে তাকে সে ভাবে খোলা সম্ভব নয়।

পালাতে না পেরে বাইসন ধীরে ধীরে হলের মাঝখানে ফিরে এল। অসহায়ের মত ওপর দিকে চেয়ে কাতর গলায় ডেকে উঠল।

কিন্তু বাহাদুর বলতে হবে সায়েববাচ্চাদের—নাগালের বাইরে থেকে ক'জনে মিলে একটা জীবকে মারছে, তাতেই তাদের হাত ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। একটা গুলি বাইসনের গায়ে লাগে তো, দশটা যায় মিস হয়ে।

জগদীশবাবু আমাকে বললেন, কান্তিবাবু, এদের দিয়ে হবে না, আপনি শেষ ক'রে দিন ওটাকে।

আমি বললাম, ছিঃ!

রোমের গ্ল্যাডিয়েটরদের কথা বইতে পড়েছি, কিন্তু এর তুলনায় সেও ঢের ভদ্র জিনিস। সে তবু হ'ত হাতাহাতি লড়াই, সমানে সমানে। আর এ একগুষ্টি মানুষে মিলে একটা জীবকে তিল তিল ক'রে বধ করছে—তার না আছে পালটে মারবার উপায়, না আছে পালাবার পথ খোলা। এর চেয়ে নীচ কাপুরুষতা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। আমি ছুঁড়ব সেই জানোয়ারের ওপর গুলি? আমি, কান্তি চৌধুরী, যার নাম তিনটে কন্টিনেন্টের লোকে জানে! তার আগে বন্দুক ছেড়ে চুড়ি পরব হাতে।

ক্রমে বাইসনের শক্তি ফুরিয়ে এল। লাফালাফি বন্ধ ক'রে সে হলের এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর আরও গোটাকতক গুলি খেয়ে ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়লাম। কাছে গিয়ে তার মুখটাকে দু' হাতে ক'রে তুলে ধরলাম; দেখলাম, তার দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তখনও তার একটু একটু নিশ্বাস বইছিল। তারপরই একটা জোর নিশ্বাস ছেড়ে চারটে পা টান ক'রে দিয়ে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

সায়েবরা নেমে এল। রাজবংশী সায়েব তখনও কাঁপছে। বললে, একেবারে মরেছে তো?

আমি বললাম, এতগুলো বীরপুরুষ যেখানে, না ম'রে যায়? গুলি না লাগলেও শুধু লজ্জায়ই ম'রে যেত।

ব'লে সোজা হল থেকে বেরিয়ে এলাম। বিষ্টিতে ভিজে হেঁটেই বাড়ি ফিরলাম—ওই মহাবীরদের সঙ্গে এক গাড়িতে গায়ে-গা দিয়ে বসতে ঘেন্না হচ্ছিল।

গিন্নি কিন্তু শুনে বললেন, তোমারই তো ভুল। নইলে যাদের দেশের সিংহই অতটা ভয় খেয়ে যায়, তাদের মানুষরা কি করবে ব'লে তুমি আশা করেছিলে?

শুনে মনে হ'ল, কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়, সায়েবদের দোষ নেই। পরদিন গিয়ে সায়েবদের সঙ্গে আবার ভাল ভাব ক'রে এলাম।

কিন্তু আরও পরে জেনেছি, গিন্নীই ঠকেছিলেন। সিংহ সত্যি ক'রে ভয় পায় নি—ছবির সিংহ ভয় পায় না। ওটা হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

•

আমরা বলিলাম, কি?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বাইসনের গর্জন শুনে অপারেটর ভয়ে কল বন্ধ ক'রে ফেলেছিল। তারপর জগদীশবাবুর হাঁকে চটকা ভেঙে তাড়াতাড়ি আবার কল চালিয়েছে। কিন্তু গোলমালে তখন তার মাথার ঠিক নেই, তাই অজানতে কণ্ট্রোল ভুল দিকে ঠেলে ব্যাক-গিয়ার ক'রে দিয়েছে। ফিল্‌ম্‌ও তাই উল্টো-বাগে ঘুরে গেছে, মনে হয়েছে, যেন সিংহই পেছিয়ে যাচ্ছে।

আমি বলিলাম, কিন্তু ফিল্‌ম্‌ কি পেছন দিকে চালানো যায়?

কান্তি চৌধুরী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, যায় কি না যায়, তার আমি কি জানি! পছন্দ না হয় যদি, শুনতে না এলেই পার!

কেউটের কেরামতি

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

সত্যিকার শিকারী যারা হ'তে চাও, তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে জানোয়ার চেনা। জানোয়ারের স্বভাব-চরিত্র রীতি-নীতি পছন্দ-অপছন্দ, সে কোথায় থাকে, কি খায়, কোন্ পথে তার গতিবিধি, এসব যদি ঠিকঠাক জানা না থাকে, তার সঙ্গে লড়াই ক'রে জিতবার আশা করা বৃথা। শিকারও আসলে এক রকমের যুদ্ধ তো! শত্রুর গতিবিধি সুলুকসন্ধান যিনি যত ভাল জানবেন তিনি তত বড় সেনাপতি। তাঁর জয়ও তত সুনিশ্চিত।

আমরা বলিলাম, সেইজন্যেই তো আপনার কাছে আসি, জানোয়ারদের সম্বন্ধে সব কথা শুনতে পাব ব'লে।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বেশ তো, বেশ তো—আমি কি বলেছি বলব না! আমরা হলাম এখন রিটায়ার্ড, যেটুকু যদ্দুর পারি তোমাদের শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যাব, এটাও তো আমাদের একটা বড় কাজ। তা বল না, কার কথা তোমরা শুনতে চাও।

কয়েকদিন আগে পাড়ায় একজনকে সাপে কামড়াইয়াছিল। সেই নামটাই মুখে আসিয়া পড়িল, বলিলাম, সাপের কথা বলুন।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, নাও কথা। পৃথিবীতে কম ক'রেও দু' হাজার রকমের সাপ আছে তাদের কারু সঙ্গে কারু স্বভাব মেলে না। আন্দাজি আমি কার কথা বলব?

আমরা বলিলাম, আমাদের দেশে যেটা সবচেয়ে ভয়ের, তার কথাই বলুন—কেউটে।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বেশ, বলছি। কেউটেকে তোমরা ভয়ানক

বললে, কিন্তু বিষের কথা যদি বল, কেউটের চেয়ে ঢের বেশি বিষাক্ত সাপ অনেক আছে পৃথিবীতে। আমাদের দেশেই কালনাগিনীর বিষ কেউটের প্রায় সাতগুণ।

আমরা বলিলাম, কেউটেই তো কালনাগিনী।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, অনেকে বলে বটে, কিন্তু আসলে তা নয়। কালনাগিনী হচ্ছে কালো করাত সাপ। তারপরে ধর তোমার শঙ্খচূড়। তার কথা আগেই বলেছি। আরেকটি সাপ আছে তার নাম রাসেল্‌স্ ভাইপার, চন্দ্রবোড়ার জলচর ভ্যারাইটি। সুন্দরবনের ধার থেকে শুরু ক'রে প্রায় বোম্বাই অবধি সমুদ্রের জলে এদের বাস, চেহারায়ও বিশেষত্ব আছে—সাঁতার কাটবার সুবিধে হবে ব'লে এর ল্যাজের ডগাটা চ্যাপ্টা, ঠিক বানমাছের মত। বিষের দিক থেকে এরাই ভারতবর্ষের সবচেয়ে মারাত্মক সাপ, এর বিষের তেজ কেউটের প্রায় বারোগুণ।

কেউটেকে আমরা বিষাক্ত ব'লে জানি, কিন্তু কেউটের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব যেটা সে তার বিষের জোর নয়, তার বাবুগিরি। এমন শৌখিন সাপ আর দ্বিতীয়টি নেই। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা ঘরের কাছে ফুলগাছ লাগায় না, রাতের বেলা বাঁশি বাজায় না—বলে, সাপ আসবে। সেই সাপ এই কেউটে। ভাল গন্ধটি, মিঠে আওয়াজটি পেয়েছে কি কেউটে ছুটে গিয়ে সেখানে হাজির হবে; নরম তুলতুলে বিছানাটি পেয়েছে কি তার ভেতরে গিয়ে সেঁধোবে। ফুলের গন্ধ দাঁড়াশও পছন্দ করে, কিন্তু সুরের নেশা আর কোন সাপের নেই।

আমাদের বাড়িতেই একবার এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল। তখন আমার বয়স অল্প, স্কুলে পড়ি। আমরা সবাই দেশের বাড়িতে থাকি; বাবা থাকেন মফস্বলে। প্রত্যেকবার পুজোর সময় বাবা বাড়ি আসতেন, মস্তবড় নৌকো ভ'রে জিনিসপত্তর কাপড়-চোপড় সব নিয়ে আসতেন।

আমাদের ওদিকটাতে কেউটে সাপ সাধারণত বাড়িয়ালে বাসা

বাঁধে না, মাঠেই থাকে। কেবল বর্ষার দিনে যখন মাঠ জলে ডুবে যায়, তখন এরাও উঠে এসে মানুষের বাড়িতে ঢোকে। ওটাই আবার ওদের ডিম পাড়বার সময় কিনা!

সেবার হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এমন এক সাপ এসে বাসা করল। প্রকাণ্ড বড় সাপ। লোকজনের চোখেও পড়ল, কিন্তু ঠিক কোন্‌-খানটাতে তার বাসা তা বার করা গেল না, তাকে মারাও হ'ল না। পাড়াগাঁ অঞ্চলে কেউটেকে লোকে মনসার বাহন ব'লে জানে, বিনা দোষে তাকে মারতে চায় না। আর মারতে হ'লে তাকে কায়দামত পাওয়াও চাই তো।

তবু ছেলেপিলের ঘর, ও-জীবকে নিয়ে বাস করা যায় না। কাকারা বললেন, সাপুড়ে ডেকে ধরাব।

মা কিন্তু রাজি হলেন না। বললেন, আছে থাক্, ক্ষেতি তো করছে না কোনও। সাপুড়ে এসে যদি শেষ পর্যন্ত ধরতে না পারে, তবে তাড়া খেয়ে সাপ ক্ষেপে যাবে, মানুষ কামড়াবে। তার চেয়ে যেমন আছে তাই ভাল।

গোলমালে সাপুড়ে ডাকা হ'ল না। সাপও আছে আমরাও আছি —রাতবিরেতে আলো নিয়ে সাবধান হ'য়ে চলি, সেও কারও সামনে পড়লে স্রুট ক'রে একধারে স'রে যায়—এমনি ক'রে দিন যাচ্ছে।

যেতে যেতে পূজো ঘনিয়ে এল। বাবা বাড়ি এসে পৌঁছলেন চতুর্থীর দিন ভোরবেলা। নৌকো পেছনে আসছে। তাঁর নিজের মস্ত বড় বজরা নৌকো ছিল, সেই নৌকো ক'রে মহালে ঘুরে বেড়াতেন, নৌকো নিয়েই বাড়ি আসতেন।

বিকেলবেলা নৌকো এসে ঘাটে উঠল। লোকজন মিলে মাল খালাস করতে হ'ল রাত প্রায় দুপুর। চারটিখানি তো মাল নয়, তায় বর্ষাকালে পথঘাট পিছল কাদাময়। বাড়ির দরজায় খাল, সেই খালের ঘাটে নৌকো, বাড়ি থেকে ঘাটও প্রায় দুশো গজ হবে।

নৌকোর সর্দার-মাঝি, তার নাম ছিল ইরফান। চাটগেঁয়ে

মুসলমান, ঠাকুরদার আমল থেকে আমাদের বাড়িতে আছে। আমরা ডাকতাম ইরফান-খুড়ো। তখন তার বয়স হয়েছে ষাটের ওপর, কিন্তু তখনও সে জবরদস্ত জোয়ান; ঝড়ের মুখে পাল তুলে দিয়ে বজরার হাল সামলায়।

রাত দশটা হবে, বাবা খেতে বসেছেন, আমরা কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ ইরফান-খুড়ো ছুটে এসে বারান্দায় উঠল, চেঁচিয়ে বললে, একটা আলো দাও শিগগির।

বাবা বললেন, দেখ্ তো কি চায়?

আলো নিয়ে বেরিয়ে দেখি, ইরফান-খুড়ো মেঝেয় ব'সে পড়েছে, ডান হাতের কবজিটাকে বাঁ হাতে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে আছে। বললে, দৌড়ে একটা সরু দড়ি নিয়ে এস। সাপে কেটেছে।

সবাই ছুটে এল। বাবা খাওয়া ফেলে এঁটো হাতেই উঠে এলেন, দড়ি দিয়ে হাতে দুটো তিনটে তাগা বেঁধে দিলেন। একজন আলো নিয়ে ডাক্তারের বাড়ি দৌড়োল।

ডাক্তারের বাড়ি কাছেই ছিল, তিনি তখুনি চ'লে এলেন। খবর পেয়ে রোজাও দু-তিনজন এসে পড়ল। ঘা পরীক্ষা ক'রে তাঁরা বললেন, কামড় সাপেরই বটে, তবে যে কারণেই হোক বিষ ঢালতে পারে নি। তা হ'লেও সাবধানের মার নেই। হাতের তেলোয় সাপ ছুবলেছে—জায়গাটা চিরে ডাক্তার পটাশ পারমাঙ্গানেট দিয়ে ধুয়ে দিলেন। রোজারাও যার যার বিদ্যে মতন ঝাড়ফুঁক করলে। যা যা করবার ক'রে দিয়ে তাঁরা ব'লে গেলেন, আজ রাতটা ঘুমোতে দেবেন না।

ডাক্তারদের ভিড় যখন ভাঙল, আমরা গিয়ে ভিড় করলাম। বাবা বললেন, কি হ'ল বল শুনি। কামড়াল কি ক'রে?

ইরফান বললে, বাড়ির ভেতর আসছিলাম, অন্ধকারে ব্যাটা পড়ল পায়ের তলায়। পড়তেই সেও ফোঁস ক'রে উঠল, আচমকা লাফিয়ে সরতে গিয়ে আমারও গেল পা পিছলে। বাঁ হাতে ভর ক'রে

ব'সে প'ড়েই আবছা মতন দেখতে পেলাম, সাপ আমার প্রায় মাথা-মুখ সই ক'রে ছোবল এঁচেছে। তাড়াতাড়িতে কি আর করি, ডান হাতে থাবা মেরে ছোবল আটকে দিলাম, তাই হাতের তেলোয় কামড় পড়ল। ব'লে একটু হেসে বললে, রাত্তিরে কেউ ঘুমোতে পারলে হয়, দাঁতের ব্যথায় বাছা আজ সারারাত চ্যাঁচাবে। দাঁড় মেরে-মেরে হাত হয়েছে লোহা, এতে দাঁত ফোটানো কি ওর কম্ম!

বাবা বললেন, একটা আলো নিয়ে খুঁজে দেখতে হয়।

ইরফান বললে, সে কি এখনও ব'সে আছে? কামড় দিয়েই চোঁ-চাঁ দৌড় মেরেছে। নইলে আমাকে তো কামড়েছিলই, তাকে মুঠো ক'রে ধ'রে নিয়ে আসতাম না!

বাবা বললেন, যাক, কাল দেখতে হবে। কিন্তু হঠাৎ বাড়ির মধ্যে সাপ এল কোথা থেকে?

আমরা বললাম, এবারেই এসে বাসা করেছে। আগেও কদিন চোখে পড়েছে।

বাবা বললেন, অথচ কেউ তাকে মারতে চেষ্টা কর নি! ভাল বুদ্ধি!

কাকারা বললেন, চেষ্টা তো করেছি, বাগে পাই নি।

বাবা বললেন, যাক, কাল সকালে উঠেই পাশের গাঁ থেকে মালদের ডেকে আনবে। এই জানোয়ার নিয়ে বাস করা চলবে না।

অনেক রাত ক'রে শুয়েছি, পরদিন আমার যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা হয়ে গেছে। ঘুম ভেঙেই কানে এল উঠোনে একটা চ্যাঁচামেচি চলেছে—সাপ, সাপ!

লাফিয়ে উঠে বাইরে এলাম। দেখি, খুড়তুতো ভাই-বোন হাত ছড়িয়ে সবাইকে দেখাচ্ছে, এই এ-ত বড়, এত বড় সাপ! তারা সকালে উঠে বাগানে ফুল তুলতে গিয়েছিল, শিউলিফুলের গাছে সাপকে দেখে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

বাবা. বললেন, চল তো দেখি কোথায় সাপ। ব'লে একটা লাঠি তুলে নিলেন। ইরফান নৌকোর একটা সরু লগি নিয়ে সঙ্গে চলল। আমরা দূরে দূরে থেকে পেছনে চললাম।

বাগানে ঢুকে দূব থেকেই চোখে পড়ল, সত্যি শিউলি গাছের ডালে সাপ ঝুলে আছে। প্রকাণ্ড সাপ। ল্যাজ দিয়ে সে ডাল জড়িয়ে ধরেছে, ধ'রে প্রায় সমস্ত দেহকে লম্বা ক'রে দিয়ে ঝুলে পড়েছে। মাটি থেকে হাত দেড়-দুই ওপরে তার মুখ।

বাবা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থেমে দাঁড়ালেন। একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, এ কি ব্যাপাব!

ইরফানও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সেও বললে, কি যেন হয়েছে। দাঁড়ান, দেখে নিই, আগে কাছে যাবেন না।

আমরাও দেখছিলাম, সাপেব ভাবভঙ্গী যেন কেমন ঠেকছে। লম্বা হ'য়ে সে ঝুলে পড়েছে। যেন তাব গায়ের জোড়গুলো সব আলগা, যেন গায়ে মোটে জোব পাচ্ছে না। থেকে-থেকে তার সমস্তটা দেহ কেঁপে মুচড়ে উঠছে, আর মুখ হাঁ ক'রে সাদা সাদা জলের মতন কি কতগুলো বার ক'রে ফেলছে।

দেখে-টেখে ইরফান বললে, দেখে তো মনে হয় অসুখ করেছে। তবু ও-জাতকে বিশ্বাস নেই—দোল খেয়ে এসে ছুবলে দেবে কি না কে জানে।

বাবা বললেন, কিন্তু আজ একে না মেরে আমি ছাড়ছি না। তুমি স'বে যাও, আমি দেখছি।

ইরফান বললে, একা পারবেন না, তার চেয়ে আমি যা বলি করুন। আমার লগিটা লম্বা আছে, এই দিয়ে আমি দূর থেকে ওকে এক বাড়ি হাঁকড়াব, এক বাড়িতে কোমর ভেঙে গেলে তখন মারতে কষ্ট হবে না। আপনিও লাঠি নিয়ে তৈরি থাকুন। কি জানি যদি এক বাড়িতে কাবু না হয়, বা উল্টে তাড়া ক'রে!

বাবা লাঠি নিয়ে দাঁড়ালেন, ইরফান তার লগি ঘুরিয়ে সাপের

মাঝখান বরাবর বাড়ি কষালে। সাপের আয়ু মনে হ'ল যেন এমনিই ফুরিয়েছিল। বাড়ি খেয়ে সে আর মাথাও তুললে না। ডাল থেকে তার ল্যাজ খ'সে গেল, টুপ ক'রে সে মাটিতে পড়ল। বাবা কাছে গিয়ে ঘা দু-চার লাঠি বসিয়ে তাকে একদম শেষ ক'রে দিলেন।

লাঠির ডগায় ক'রে সাপকে নিয়ে সবাই উঠানে ফিরে এলাম, সেখানে সাপকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আরেক দফা হৈ-হৈ হ'ল। তারপর ক'জনে মিলে খালধারে গিয়ে হরিধ্বনি ক'রে তাকে পুড়িয়ে ফেললে। পাড়াগাঁর লোকে বলে, কেউটে সাপ ব্রাহ্মণ, তাকে মারলে সৎকার করতে হয়, নইলে পাপ। আসল কথা হচ্ছে, অনেক সময় লাঠির বাড়িতে সাপ ঠিকমত মরে না, কিছুক্ষণ মরার মত হ'য়ে থেকে পরে আবার বেঁচে ওঠে। তাই পুড়িয়ে ফেলবার ব্যবস্থা।

যাক, সাপ তো মরল। কিন্তু অমন ক'রে কেন মরল, সেটা কেউ বলতে পারে না। কালকে রাত্রে যে সাপ তরতাজা ঘুরে বেড়িয়েছে, মানুষ কামড়েছে, রাত না পোয়াতে তার ম'রে যাবার মত কি হ'ল? কেউ এক কথা বলে, কেউ আরেক কথা বলে—এ বলে, ইরফানের পায়ের তলায় প'ড়ে তার পিঠ ভেঙে গিয়েছিল; ও বলে, আগে থেকেই নিশ্চয় ওর অসুখ করেছিল, নইলে অমন শান্ত সাপ হঠাৎ খিটখিটেই বা হবে কেন, মানুষ কামড়াবে কেন!

কিন্তু বাবা বললেন, ওসব কিচ্ছু নয়, অন্য কোন কারণ আছে।

কারণ খুঁজেও বলতে গেলে বাবাই বার করলেন। ইরফানকে ডেকে বললেন, একটা কথা বল তো সত্যি ক'রে! তুমি আফিম খাও?

ইরফান চ'টে যায় আর কি! বললে, আফিমচির মত চেহারা আমার? তামাক পর্যন্ত খাই নে। কেন? আফিম খাই কে বলেছে আপনাকে?

বাবা বললেন, বলে নি কেউ। সাপটার কি হ'ল, তাই

ভাবছিলাম। আফিম্‌চিকে কামড়ালে সাপ ম'রে যায় বলে, জান তো। তুমি যদি তাই খেতে, তবে একটা মানে বোঝা যেত।

ইরফান একটুক্ষণ ভাবলে। তারপর বললে, হয়েছে, আমি বুঝেছি।

বাবা বললেন, কি ?

ইরফান বললে, আফিম তো নয়, কাল উঃন্নি রেঁধেছিলাম।

তখন ব্যাপার বোঝা গেল। উঃন্নি চাটগেঁয়ে কথা, ওর মানে হচ্ছে শুঁট্‌কিমাছ। তার গন্ধ বিখ্যাত বস্তু। সেই গন্ধ ছিল ইরফানের হাতে, ছোবল মারতে গিয়ে সাপের নাকে গন্ধ লেগেছে। তারপরে বোধহয় গন্ধের ধাক্কা সামলাতেই বেচারি ছুটে গিয়ে ফুলগাছে চড়েছিল।

কিন্তু তাতেও কুলোল না, স্রেফ বমি ক'রেই সে ম'রে গেল।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

হাত একবার এসে গেলে তারপর আর বাঘই বল, গণ্ডারই বল, মারা কিছু শক্ত নয়। আদতে শক্ত হচ্ছে আরম্ভ করাটা। গোড়ার ট্রেনিং যার কাঁচা থেকে যাবে, সে হাজার বছর বন্দুক ঘাড়ে ছুটোছুটি ক'রেও শিকারী হতে পারবে না। সে রকম লোকের শিকার করা মানে লটারি খেলা—দেখলাম বাঘ, ছুড়লাম গুলি, লাগল তো বাঘ মরল, না লাগল তো নিজে মরলাম। ওকে শিকার বলে না। সত্যিকার শিকারী যে হবে, তাকে জীবজন্তুর চলাফেরা আচার-ব্যবহার পছন্দ-অপছন্দ সব নখদর্পণে জেনে নিতে হবে; জানতে হবে কখন তাকে কি অবস্থায় পাওয়া যায়, কোথায় গুলি বসাতে পারলে সে মরে। তা নইলে অদৃষ্টের ওপর হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে ঘোড়া টানা, সেটা ছেলেমানষি তো বটেই, শিকারীর নিজের পক্ষেও বিপজ্জনক। এইজন্যেই বলে, বই প'ড়ে শিকার শেখা যায় না, শেখা যায় শিকারের গল্প। শিকার শিখতে হয় গুরুর কাছে। আসলে শিকার ব্যাপারটা ক্ষাত্রধর্মের অঙ্গ কিনা, একটা সাধনার সামিল। তাই খাঁটি গুরুর সাক্ষাৎ যে পেয়ে যায়, সে তাঁর আশীর্বাদে শিকারী ব'লে নাম পায়; আর সেটি যে না পায়, তার শিক্ষাও হয় না। বাঘ হয়তো তার হাতেও দৈবাৎ দুটো একটা মরে, কিন্তু তাই ব'লে শিকারী তাকে বলা চলে না।

আমার যাঁর কাছে বাঘ মারার হাতে-খড়ি হয়, তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য পুরুষ, যাকে বলে—গুরুর মত গুরু। অমন গুরুর দেখা পেয়েছিলাম ব'লেই কান্তি চৌধুরী আজ কান্তি চৌধুরী। আর তা

যদি না পেতাম, তবে হয়তো কান্তি চৌধুরীর নামও কেউ জানত না দেশে। চাকুরে ছিলাম, চাকরি করতাম, পেন্‌শন পেতাম, তারপর একদিন ম'রে যেতাম ডিসেন্টি্র বা কালাজ্বর হয়ে, লোকে টেরও পেত না। আজ যদি কান্তি চৌধুরী মরে, দেশে একটা জানাজানি হবে, দশজনে বলবে, একটা লোকের মত লোক মরেছে। এ সমস্তই আসলে তাঁর আশীর্বাদ। অথচ তার-সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল একেবারে হঠাৎ, যাকে বলে, দৈবের খেলা। বাঘ মারতে আমারও সেই প্রথম যাওয়া। সেই গল্প তোমাদের বলছি।

কলেজ ছেড়ে তখন বেরিয়েছি, চাকরিতেও ঢুকেছি কিছুদিন। শিকারের নেশা তখন জ'মে গেছে, কিন্তু হাতে-কলমে বিদ্যের দৌড় হরিণ আর বরা অবধি। বাঘ মারবার শখ প্রাণে এসেছে কিছু কিছু, এক-আধবাব ছোটখাটো বাঘকে কায়দা করবার চেষ্টাও কবেছি, কিন্তু বন্দুক ঘাড়ে ক'রে কাদাকিচড় ভাঙা আর রাত জেগে মাচানে ব'সে চোখ লাল করাই সার হয়েছে, রাত পোয়ালে ঝিমুতে ঝিমুতে আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির ছেলে বাড়িতে ফিরে এসেছি। বাঘ মারতে পারাটাতে তখন দেবদুর্লভ ঘটনা ব'লেই জেনে রেখেছিলাম। সেই কাণ্ড একদিন আমার কাছে ডালভাতের সামিল হয়ে যাবে, এ কথা তখন ভাবতেও পারতাম না।

আপিসে দিন চারেক ঈস্টারের ছুটি ছিল, ভাবলাম এই ফাঁকে একবার যেদিকে হোক বেরিয়ে পড়া যাক। আপিসের একটি বন্ধু, আমাদেরই বয়সী, বললেন, চলুন আমার দেশে, রঙপুর। দেশেও যাওয়া হবে, বেড়ানোও হবে।

আমি বললাম, দেশে তো আপনার যাওয়া হবে বুঝলাম, কিন্তু আমার বেড়ানোটা হচ্ছে কোথায় মশায়? রঙপুরে তো শুনেছি খালি তামাকের চাষ, তামাক-ক্ষেতে গিয়ে কি শুঁয়োপোকা মারব?

সে ভদ্রলোকের নাম যতীনবাবু, যতীন বোস। তিনি বললেন,

আরে ভাই, চলুনই না আগে, তারপর দেখা যাবে কত জানোয়ার মারতে পারেন আপনি।

আমি বললাম, তার মানে? মারবার মত জন্তুজানোয়ার সত্যি আছে নাকি আপনাদের দেশে?

যতীনবাবু বললেন, বলছি তো গিয়েই দেখবেন। বন্দুক কামান আপনার যা যা নেবার আপনি গুছিয়ে নেবেন, জন্তুজানোয়ারের ভার আমার।

আমি বললাম, বেশ।

রেল-স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি, তারপর নৌকো, তারপর আবার গরুর-গাড়ি, এমনি ক'রে চলতে চলতে সন্ধ্যে নাগাদ তাঁদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। ভোর সকালে ট্রেন থেকে নেমেছি, সারাদিন গরুর গাড়ির ঝাঁকানি খেয়ে আর গাড়োয়ানের চ্যাঁচানি শুনে দেহের মনের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সে কহতব্য নয়। বাড়ি পৌঁছে সে রাত্রে আর বাড়ির লোকজনদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় করবার মত উৎসাহ রইল না, কোনমতে চান সেরে নাকে মুখে দুটি গুঁজে শুয়ে পড়লাম, এক ঘুমেই রাত কাবার।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা হয়ে গেছে। উঠে মুখ হাত ধুয়ে বাইরে বৈঠকখানা-ঘরে এসে বসলাম। সেখানে ইতিমধ্যে বেশ আড্ডা জ'মে উঠেছে, বাইরের লোকও অনেক এসেছে। আমি ঢুকতেই যতীনবাবু বললেন, কি শিকারী, বাঘ মারতে যাবেন? যান তো বলুন, ব্যবস্থা করি।

আমি বললাম, আছে নাকি?

যতীনবাবু বললেন, তাই তো বলছে এরা। বাঘ আছে, গরুও নাকি মেরেছে। কই হে, এগিয়ে এস তো, বাবুকে বল কি রকম বাঘ তোমাদের; বাবু মেরে দিয়ে যাবেন।

দোরের কাছ থেকে একটি মানুষ ঘরের ভেতরে এগিয়ে এল।

রোগা পাতলা কালো চেহারা, মাথার সাদা চুল দেখলে মনে হয়, একটা শরের ডাঁটার মাথায় ফুল ধরেছে। শুনলাম, সে নাকি গুণী লোক, সে অঞ্চলে শিকারের যা কিছু সুলুক-সন্ধান সব সে রাখে। সামনে এসে সেলাম ক'রে উবু হয়ে মেঝেতে বসল, বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আছে বাঘ।

আমি বললাম, কি বাঘ, গো-বাঘা?

সে বললে, আজ্ঞে না, বড়।

বড় বাঘ মানে রয়াল বেঙ্গল। শুনে লোভও হ'ল, সঙ্কোচও হ'ল। এর আগে যা তাড়া-টাড়া করেছি, সে লেপার্ড বা প্যান্থার। রয়ালের সাক্ষাৎ-সন্ধানও পাই নি, তাকে ঘাঁটানোর মত সাহসও হয় নি। বললাম, বড় বাঘ তো সবাই আগে বলে, শেষে মেরে দেখা যায় বাঘডাঁশা। তুমি নিজের চোখে দেখেছ?

সে বললে, দেখি নি তো কি ভূতের গল্প বানিয়ে বলতে এসেছি নাকি? আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই!

আমার মেজাজ চ'ড়ে গেল। যতীনবাবু তাড়াতাড়ি আমার গা টিপে দিলেন। কানে কানে বললেন, আরে করছেন কি! ভয়ানক টাচি লোক, ওরকম ক'রে বলবেন না ওকে।

আমি বললাম, মানে? দিস ইজ ইম্‌পার্টিনেন্স।

যতীনবাবু বললেন, হি ক্যান অ্যাফোর্ড টু শো ইট। জীবনে কখনও মিছে কথা কয় নি ও, তাই ও কথা কেউ বললে ক্ষেপে যায়। আর সারাটা জীবন বাঘের পেছনে ঘুরে ঘুরে মেজাজটিও বানিয়েছে বাঘেরই মতন, রাগলে আর রক্ষে নেই। নইলে কাজের সময় দেখবেন, অমন সঙ্গী বেশি মেলে না।

আমি আর কিছু বললাম না। রাগ সামলে নিয়ে তাকে বললাম, কি দেখেছ, বল শুনি। চক্কর ছিল তার গায়ে?

সে বললে, আজ্ঞে না, চক্কর থাকলে আর বড় বাঘ বলব কেন! বড় মানে, গায়ে ডোরা কাটা। চেহারাও মন্দ নয়, ল্যাজ নিয়ে

আপনার সাড়ে ছ' হাত খুব হবে।

যতীনবাবু বললেন, কোথায় দেখলে তাকে এনায়েৎ? বল তো সব খুলে।

এনায়েৎ বললে, দেখলাম আজ্ঞে, রাস্তার ওপরই বলতে হবে। দেশে ছিলাম না তো কদিন, বোনের বাড়ি গিয়েছিলাম। সেদিন ফিরে আসছি, পথে রাত হয়ে গিয়েছে। কালীতলার সাঁকোটা পেরিয়ে বকুলগাছের নীচ দিয়ে আসতে যাব, দেখি, গাছের তলায় গুঁড়ির গায়ে লেপ্টে কে ব'সে রয়েছে। প্রথম ভাবলাম, কোন খারাপ লোক। হাঁক দিয়ে বললাম, কে ব'সে ওখানে? বলতেই ব্যাটা হুপ ক'রে এক লাফ দিয়ে রাস্তার এধারে এসে বেতঝাড়ের তলায় ঢুকে গেল। চাঁদের আলো খানিকটা ছিল তখন, সেই আলোয় দেখে নিলাম চেহারাটা। হ্যাঁ, সাড়ে ছ হাত ঠিক হবে।

আমি বললাম, তারপর কি করলে?

এনায়েৎ বললে, করব আর কি, বাড়ি চ'লে এলাম। আগের দিন তো আর নেই। খানসায়েবই শিকার ছেড়ে দিলেন, কাকে নিয়ে আর কি করব। শিকার-খেলা আর হবে না এ জন্মে।

আমি বললাম, খানসায়েবটি কে যতীনবাবু?

যতীনবাবু বললেন, এখানকারই একটি লোক। ওহে এনায়েৎ, সে বাঘের খোঁজ এনে দিতে পার?

এনায়েৎ বললে, এনে হবে কি? মারবে কে? খানসায়েব তো আর বন্দুক ধরবেন না।

যতীনবাবু বললেন, এই বাবু মারবেন। শিকার খেলবেন ব'লেই এ দেশে এসেছেন উনি, খুব পাকা শিকারী। পারবে শিকার করিয়ে দিতে?

এনায়েৎ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হ'ল, যেন চোখ দিয়ে আমাকে মেপে মেপে দেখলে, আমি কাজের যোগ্য লোক কি না। তারপর বললে, বেশ, দোব।

যতীনবাবু বললেন, হ'লে কিন্তু আজকালের মধ্যেই, পরশুদিন আমরা চ'লে যেতে চাই। পারবে? বোঝ।

এনায়েৎ বললে, জানোয়ারের চাল, পরের হাতে কারবার। তবু ভরসা তো করি, পারব। পরশুই যাবেন নাকি আপনারা?

যতীনবাবু বললেন, হ্যাঁ. ছুটি নেই।

এনায়েৎ বললে, ভ্যালা এক ছুটির ধান্দা হয়েছে যা হোক। আপনাদেরও যেমন, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—দেশে থাকুন, জমি-জিরেত দেখুন, আরামে খান-দান, মজা করুন, তা নয়, কোথায় বিদেশে বিভুঁয়ে গিয়ে সায়েবের পা না চাটলে কর্তাদের বড়লোকি দেখানো হয় না!

কথার ঢঙ দেখে আমার গা জ্ব'লে উঠল। খানিক কড়া কথাই হয়তো শুনিয়ে দিতাম তাকে, যতীনবাবুর এক দাদা আমার কানে কানে বললেন, কিছু মনে করবেন না আপনি। ওর কথার রকমই ওই, আমরা তো আমরা, আমাদের বাবা-কাকাদের সঙ্গেও অমনি ক'রে কথা কয় ও।

আমি বললাম, স'য়ে যান কেন আপনারা? একদিন ধমক খেলেই আর দ্বিতীয় দিন সাহস করবে না।

তিনি বললেন, ওরে বাপ! ওকে ঘাঁটাবে এমন সাহস কারু নেই। আসল কথা কি জানেন, গ্রামের অনেক শত্রু ও নিকেশ করেছে, একা হাতে শুধু বল্লম নিয়ে বুনো ভালুক, বুনো বরা মেরেছে অনেকবার। আমাদের দেখছেনই তো বনের মধ্যে বাস, জন্তু জানোয়ার নিয়ে নিত্যি কারবার। তার হাত থেকে যে বাঁচিয়ে রাখছে, সে মেজাজ দেখালেও সইতে হবে বই কি!

এনায়েৎ তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। যতীনবাবু বললেন, ওই কথা রইল তা হ'লে?

এনায়েৎ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বিকেল নাগাদ এসে খবর দিয়ে যাব আমি।—ব'লে সেলাম ক'রে চ'লে গেল।

খেতে ব'সে যতীনবাবুর বাবা বললেন, শিকারে সত্যি যাচ্ছ নাকি তোমরা ?

যতীনবাবু বললেন, খোঁজ যদি পাই, যাব। দেখি, এনায়েৎ কি খবর আনে।

তাঁর বাবা বললেন, এনায়েৎ যখন ব'লে গেছে, সে ঠিকই আনবে খবর। এনায়েৎ বাজে কথা কয় না।

আমি বললাম, এনায়েৎ লোকটি কে ?

যতীনবাবুর বাবা বললেন, ও লোকটা হচ্ছে আমাদের একজন আশ্রিত প্রজা। ওদের বংশের ব্যবসাই ওই, জানোয়ারের স্থলুক-সন্ধান রাখা, শিকারের স্কাউট বলতে পারেন এদের। এনায়েতের বাপকে আমার বাবা অন্য জায়গা থেকে এনে বসিয়েছিলেন এইজন্যে। তখনকার দিনে জমি রাখা সোজা কথা ছিল না তো, বাঘ-ভালুকের সঙ্গে লড়াই ক'রে তবে জমি চষতে হ'ত, ফসল বুনতে হ'ত। এখন তো জঙ্গল নেই-ই বলতে গেলে। এখানে ছিল গহন বন, সেই বন কাটাবার সময় এনায়েতের বাবাকে আমার বাবা নিয়ে আসেন। এনায়েৎ ছেলেবেলা থেকে এই কর্মই শিখেছে। আর কোনও কাজ জানেও না ও। একটি মুসলমান তালুকদার আছেন এখানে, এখন বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু এককালে সত্যি খুব বড় শিকারী ছিলেন। এনায়েৎ চিরকাল তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শিকার ক'রে বেড়াত। তিনি এখন শিকার ছেড়ে দিয়েছেন। আমরাও বড় একটা কেউ যাই না, যতীনই বাড়ি-টাড়ি এলে কালেভদ্রে একদিন বেরোয়। এনায়েতের হয়েছে মুশকিল, কাজও নেই, ব'সেও থাকতে পারে না, অভ্যাসের বশেই খুঁজে খুঁজে জেনে রাখে, কোথায় কোন্ জানোয়ার আছে।

আমি বললাম, ইনিই বুঝি খানসায়েব ? এনায়েৎও এঁর নাম করছিল তখন।

যতীনবাবুর বাবা বললেন, করবার কথা, তাঁর হাতেই একরকম ও মানুষ হয়েছে বলতে গেলে। আর লোকটিও চমৎকার। যতীন,

এঁকে একবার নিয়ে যাও না তাঁর কাছে।

আমি বললাম, বেশ তো, আজই বিকেলে যাওয়া যাবে এনায়েৎ এলে।

বিকেলবেলা এনায়েৎ এসে খবর দিলে, বাঘ আছে। গাঁয়ের বাইরে একটেরে এক মজা দীঘি আছে, তার ওপরে তারাগাছ আর নলখাগড়ার বন, দীঘির পাড়ে এক দিকে বড় বড় গাছের জঙ্গল, আরেক • দিকে হোগলা-বন। সেইখানেই বাঘ আড্ডা গেড়েছে। কাদের একটা বাছুরও নাকি মেরেছে সেইদিনই।

যতীনবাবু বললেন, তবে আর কি, চল, বেরিয়ে পড়ি।

এনায়েৎ বললে, এখন যাবেন কোথায়? বন ঠেঙিয়ে তাকে বার করা যাবে না। যা নলখাগড়ার বন হয়েছে, বাঘ যদি একবার তার তলায় ঢুকে জলে ডুবে ঘাপটি মারে, ঠেঙারুর বাবার সাধ্যি নেই তাকে খুঁজে বার করবে। ও আদার বেঁধে মাচান ক'রে মারতে হবে, তার ব্যবস্থা কাল।

যতীনবাবু বললেন, বেশ, কাল সকালেই তা হ'লে আসবে তুমি। কিন্তু কাল পর্যন্ত দেরি করব, এর মধ্যে যদি বাঘ জায়গা ছেড়ে চ'লে যায়?

এনায়েৎ বললে, যাবে না। গাঁয়ে এখনও খবর চাউর হয় নি, লোকেও গরু বাছুর সামলাচ্ছে না, এইখানে থাকলেই তার সুবিধে। আর তার থাকবার মত এমন সুবিধের জায়গাও মাইল দশেকের ভেতর আর নেই। খুব জোর তাড়া না খেলে আর সে ঠাঁই ছেড়ে নড়ছে না।

আমি বললাম, বেশ, তুমি ব্যবস্থা কর। লোকজন যা দরকার নিয়ে যাও।

যতীনবাবু বললেন, সে বলতে হবে না, সেসব ওর জানা আছে, ও-ই ব্যবস্থা ক'রে নেবে 'খন।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম, বাঘ মারাটাকে যতখানি বৃহৎ ব্যাপার ব'লে আমি তখন ভাবতাম, এরা দেখলাম মোটেই তা ভাবে

না। যতীনবাবুকে জানতাম আপিসের নিরীহ চাকরে, চুপচাপ আসেন যান কাজকর্ম করেন, তাঁর ভেতরে যে আবার এ বস্তু আছে, তা কথাবার্তায় চালচলনে কোনদিন টেরও পাইনি। তাঁর বাবাও দেখলাম নির্বিকার—ছেলে বললে, বাবা, বাঘ মারতে যাচ্ছি; বাপ বললেন, যাও, মোজাটা প'রে যেয়ো, নইলে মশায় কামড়াবে। পরে অবিশ্যি এরকম নির্বিকার অবস্থা আমারও এসে গিয়েছে, কিন্তু তখন, সত্যি বলছি, দেখে শুনে আমার বুকের ভেতর দুড়দুড় করতে লাগল। খালি মনে হ'তে লাগল, এবার শক্ত ঘানিতে পড়েছি। খুব তো বাহাদুরি ক'রে এসেছি শিকার করতে, অথচ এসে দেখছি, এরা সবাইই সে বিদ্যেয় ওস্তাদ, একা আমিই আনাড়ী। কেলেঙ্কারী যদি কিছু ক'রে ফেলি, তবে আর মুখ ঢেকে এখান থেকে পালাবার উপায় থাকবে না। বলব কি ভাই, সে রাত্তিরে আমার ঘুমই হ'ল না ভাল ক'রে, খালি জেগে জেগে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, হে মা কালী, তোমার নাম নিয়ে ঝুলে পড়লাম, শেষরক্ষা তুমিই ক'রো।

দুপুরবেলা এনায়েৎ এসে জানালে, মাচানের জায়গা ঠিক হ'য়ে গেছে, মাচান করতে লোকও লাগিয়ে দিয়ে এসেছে সে। বললে, টাকা দিন, তাদের মাইনে দিতে হবে, আর আদার কিনতে হবে।

যতীনবাবু বললেন, দিচ্ছি। আদাব কি কিনবে?

এনায়েৎ বললে, দেখি, বাছুব একটা কার কাছে পাই।

আমি বললাম, বাছুর কেন, পাঁঠা নেই? তাই একটা পাও কি না দেখ।

এনায়েৎ আমার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে। বললে, পাঁঠা খাবে না। কই, দিন টাকা।

মনে হ'ল তার কথার মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব রয়েছে। আমার সর্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠল, ধমকে বললাম, না, খাবে না, তোমাকে ব'লে পাঠিয়েছে! বাছুর-টাছুর মারা হবে না, যা বলছি তোমাকে তাই কর। পাঁঠা কিনে নিয়ে এস।

এনায়েৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালে, আগের দিন যে রকম ক'রে আমাকে দেখেছিল, ঠিক তেমনই ক'রে যেন চোখ দিয়ে আমাকে মেপে মেপে দেখলে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, বেশ, তাই আনব।

যতীনবাবু টাকা বার ক'রে দিলেন। টাকা বাজিয়ে গুনে নিয়ে এনায়েৎ চ'লে গেল, আর একটিও কথা কইলে না। যতীনবাবু বললেন,.একটু অফেণ্ডেড হয়েছে ও।

আমি বললাম, হোকগে। একটু ধমক খাওয়া দরকার ওর, বড্ড বেশি ইম্পার্টিনেণ্ট।

বিকেলবেলা যতীনবাবু বললেন, খানসায়েবের ওখানে যাবেন বলছিলেন, যাবেন?

আমি বললাম, চলুন।

খানসায়েবের বাড়িটা এদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। খানসায়েব বাড়িতেই ছিলেন, আমাদের নাম শুনে তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে এলেন, অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন।

এক-একজন লোক থাকে, তাদের দেখলেই মনে শ্রদ্ধা আসে। এই ভদ্রলোককে দেখেই মনে হ'ল, কাজের লোক বটে। লম্বা ফরসা চেহারা, সুন্দর মুখের কাট, টিকোলো নাক, সত্যিকার সুপুরুষ যাকে বলে। তায় আবার চেহারার দিকে ভদ্রলোকের নজরও আছে দেখলাম—বাবরি চুল, লম্বা দাড়ি, সমস্ত পেকে সাদা ধবধব করছে, অপূর্ব সুন্দর দেখতে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য দেখলাম তাঁর চোখ দুটি—বড় বড় টানা টানা চোখ, চোখের দৃষ্টিটি ভারি কোমল, ভদ্রতা আর বিনয় যেন ঝ'রে পড়ছে চোখ থেকে। অথচ এই চোখকেই আবার দেখেছি এক মুহূর্তে আগুনের মত জ্ব'লে উঠতে। বন্দুক হাতে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি বদলে যেত, চোখের কোণ সামান্য কুঁচকে যেত, চোখের মণি উঠত তীক্ষ্ণ হ'য়ে, মনে হ'ত যেন সে চোখের

দৃষ্টি মানুষের গা ফুঁড়ে পেছনকার দেওয়াল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

খানসায়েব আমাকে বললেন, আপনাদের কথা শুনেছি। আজই যাচ্ছেন মাচানে?

আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল না হোক, পরশুতক কলকাতায় ফিরতেই হবে। কাজেই যা করার আজ কালের মধ্যে।

খানসায়েব বললেন, করার আর আছে কিই বা এমন! বাঘ কাছে এলে সময় লাগবার কথা নয়। এক সাবধান থাকতে হয়, চোট খেয়ে সে না পালিয়ে যেতে পারে। সেইটি হ'লেই মুশকিল, চোট-খাওয়া বাঘ বড্ড উৎপাত করে।

আমি বললাম, দেখা যাক, আশা তো করি কায়দা করতে পারব।

খানসায়েব যতীনবাবুকে বললেন, মাচান করতে গেল কে, এনায়েৎ?

যতীনবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, সে থাকতে আর কে করবে?

খানসায়েব বললেন, তা বটে। কাজটা বোঝে ও।

আমি বললাম, কিন্তু কথাবার্তা বড় খারাপ, মান রেখে কথা কয় না।

খানসায়েব হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, এরই মধ্যে টের পেয়ে গেছেন সেটা?

তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, মুখফোঁড় একটু বটে। বাঘ-ভালুকের সঙ্গে থেকে থেকে ওর মেজাজটাই বাঘমার্কা হয়ে গেছে, নইলে মনটি ভাল। আমি কিন্তু ভারি স্নেহ করি ওকে, যদিও ক্যাঁটক্যাঁট ক'রে কথা শোনাতে আমাকেও রেয়াত করে না।

আমি বললাম, কি জানি! আমি তো আজ দিলাম এক ধমক লাগিয়ে।

খানসাবেব একটু হেসে বললেন, ওইটি করতে নেই। যাদের নিয়ে শিকার করবেন, তাদের চটিয়ে দিলে চলবে কেন? ওরা বুনো জাত, খুব মাজাঘষা ভদ্রলোকি কথা বলবে, এটা ওদের কাছে আশা করাই ভুল।

আমি আর কথা বললাম না। চ'লে আসবার সময় খানসায়েব বললেন, মাচানে যাচ্ছেন কখন ?

যতীনবাবু বললেন, সন্ধ্যের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে, ধরুন ন'টা নাগাদ।

খানসায়েব বললেন, অত তাড়াতাড়ি না করলেও হয়। ডোরাদার বাঘ গভীর বনের জীব, হঠাৎ লোকালয়ে এসে পড়েছে, চারদিক নিঃঝুম না হ'লে বাসা ছেড়ে বেরোবে না। সে বেরোত গোবাঘা হ'লে, তাদের ভয় কম। আচ্ছা, এস তা হ'লে, কাল সকালে নিশ্চয়ই খবর পাব বাঘ মরেছে।

আমরা বললাম, আশা তো করি।

খেয়ে-দেয়ে বন্দুক কম্বল আর বোতলে ক'রে চা নিয়ে আমরা গিয়ে মাচানে বসলাম, রাত তখন দশটা বেজে গেছে। আমি, যতীনবাবু আর এনায়েৎ। আমাদের হাতে বন্দুক, এনায়েৎ বন্দুকের ওপর আবার একটা বল্লম নিয়ে এসেছে। মাচানে চ'ড়ে কম্বল দিয়ে গা পা বেশ ক'রে মুড়ে আমরা দুজনে বসলাম, তা না হ'লে একতিল টেকবার উপায় নেই। এক তো সে অঞ্চলে শীতের আমেজ তখনও বেশ রয়েছে, তার ওপর মশা। মাচানটি দেখলাম, বেশ চমৎকার হয়েছে। নড়াচড়া করতে কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। সেদিক দিয়ে এনায়েতের কাজ একেবারে পাকা। পাঁঠা একটা এনায়েৎই জোগাড় ক'রে এনেছিল। সে বিরাট পাঁঠা। তার যেমন চেহারা তেমন গলা, তেমনই গায়ের গন্ধ। পাঁঠাটাকে সামনেই একটু ফাঁকা জায়গাতে খোঁটায় বেঁধে দিয়ে এনায়েৎ এসে মাচানে উঠল।

অন্ধকারে একা একা পাঁঠাটার বোধ হয় মন-কেমন করছিল। খোঁটায় বাঁধতে-না-বাঁধতে সে ভ্যা-ভ্যা ক'রে চারদিক বাজিয়ে তুলল।

এনায়েৎকে হেসে বললাম, মালটি জোগাড় করেছ ভাল। এর যা

গলা আর যা গন্ধ ছেড়েছে, বাঘ তিন মাইলের ভেতর থাকলেও ছুটে এসে হাজির হবে।

ভেবেছিলাম, এনায়েৎ খুশি হবে। সে কিন্তু মোটেই খুশির ভাব দেখালে না। ঘোঁত ঘোঁত ক'রে বললে, মাচানে ব'সে কথা কইবেন না। ভুল আমারই, আমি আর কথা না ক'য়ে চুপ ক'রে গেলাম।

রাত বাড়তে লাগল। চারদিক নিস্তব্ধ, কোথাও সাড়াশব্দ নেই, খালি পাঁঠার চীৎকার, আর মশার ডাক। কম্বল জড়িয়ে জবুথবু হয়ে তিনজনে ব'সে রইলাম। কান খাড়া ক'রে আছি, কোন নতুন শব্দ কানে আসে কি না—একটু নল-পাতার খসখসানি, একটু বা শুকনো কাঠি ভাঙার শব্দ। বাঘের চলতে তার বেশি শব্দ হয় না, সেইটুকু শব্দ পেলেই সতর্ক হয়ে উঠতে হয়। কিন্তু কোথায় শব্দ, কোথায় কি! পাঁঠার মনে পাঁঠা ডেকে যাচ্ছে, বাঘেব সাড়াশব্দ নেই। এদিকে পাঁঠার চ্যাঁচানির ঠেলায় কান ফেটে যাবার জোগাড়।

অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে আমরা যথাসাধ্য চেয়ে আছি। এনায়েৎ মাচানে উঠে একধারে গুঁড়ি মেরে ব'সে পড়ল, তারপর আর তার সাড়াশব্দ নেই। অমন নিস্তব্ধ হ'য়ে না ন'ড়ে-চ'ড়ে মানুষ থাকতে পারে, জানতাম না। হিংসে হ'ল লোকটার ওপর, শ্রদ্ধাও হ'ল। বুঝলাম, মুখ তার যতই খারাপ হোক, সাধনা তার মধ্যে আছে।

একটা কথা আছে, বাঘের ভয় প্রথম দিন। কথাটা সত্যি। প্রথম শিকার করতে গিয়ে মন যেরকম চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, পরে আর কখনও তেমন হয় না। সেদিন রাত্রে আমার যা অবস্থা হ'ল, সে ব'লে বোঝানো যায় না। থেকে থেকে কেন জানি না চমকে যাচ্ছি, একটু পাতার শব্দ, একটু পোকার ডাক কানে যেতেই লাফিয়ে উঠছি, বন্দুকের গায়ে হাতের মুঠোটা নিজে থেকেই আঁট হয়ে ব'সে যাচ্ছে, সমস্ত নার্ভগুলো যেন ঝমঝম ক'রে বাজছে। সে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যতীনবাবু নড়ছেন না, চড়ছেন না, একই ভাবে ঠায় ব'সে

আছেন। এনায়েৎ সেই একই ভাবে গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে, সে যে পৃথিবীতে কিছু দেখতে শুনতে পাচ্ছে এমন কোন লক্ষণই নেই। পাঁঠাটারও শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, সমানে ডেকে যাচ্ছে। তার চ্যাঁচানির চোটে মাথা ধ'রে গেল আমার। আর হাওয়ার দমকা যখনই আসে, সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের বিকট গন্ধ, সে গন্ধে নাড়ী-ভুঁড়ি উলটে আসে। এক-একবার এমন রাগ হতে লাগল, ইচ্ছে হ'ল, বন্দুক চালিয়ে দিই ব্যাটাকে সাবাড় ক'রে, নাই বা হ'ল শিকার করা। কিন্তু ধৈর্য দেখলাম আমার সঙ্গীদুটির। যতীনবাবুর কানে তার ডাক যাচ্ছে, এমন কোন লক্ষণই দেখতে পেলাম না। এনায়েতের তো কথাই নেই, সে একেবারে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। দেখে বুঝলাম, এ ধ্যান বাঘ না এলে আর ভাঙবে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল। রাত কত বোঝবার উপায় নেই। ঘড়িতে টিকটিক শব্দ হয় ব'লে এনায়েৎ ঘড়ি নিয়ে যেতে দেয় নি, বাঘেদের নাকি শ্রুতিশক্তি অত্যন্ত বেশি। আকাশে চাঁদ নেই, তাঁরার দিকে চেয়ে সময় ঠাহর করা আমার বিদ্যের বাইরে। যতীনবাবুকে একবার ঠেলে জিজ্ঞেস করলাম, রাত কত এখন আন্দাজ?

যতীনবাবু ফিসফিসিয়ে বললেন, অনেক, চুপ করুন। বুঝলাম, তাঁর কাঁধেও শিকারীর ভূত ভর করেছে।

ব'সে ব'সে শেষে আমার মুখে চোখে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগল। বুঝলাম, রাত শেষ হয়ে এসেছে। সারারাত জাগার পরে সেই হাওয়া লেগে আমার হঠাৎ কেমন ঝিমুনি এল, ব'সে ব'সেই আমি চোখ বুজলাম। বোধ হয় পাঁচ মিনিটও যায় নি, এমন সময় যতীনবাবুর হাতখানা নিঃশব্দে এসে আমার হাতের ওপর চেপে বসল। চমকে চোখ চেয়ে বললাম, কি?

যতীনবাবু হাত বাড়িয়ে আকাশের একটা দিক দেখিয়ে দিলেন। দেখলাম, আকাশে বড় একটা তারা দপদপ ক'রে জ্বলছে আর তার

চারপাশের আকাশ হঠাৎ কেমন ঝাপসা সাদা মতন দেখাচ্ছে। বললাম, কি ?

যতীনবাবু বললেন, ভোর হয়ে গেছে, আর ব'সে থেকে লাভ নেই।

এনায়েৎ তখনও সেই একই ভাবে ব'সে। যতীনবাবু হাত বাড়িয়ে তার হাঁটুতে সামান্য একটু ধাক্কা দিলেন। সে চোখ না খুলেই বললে, রাত পুইয়েছে ?

যতীনবাবু বললেন, তার মানে ? তুমি কি ঘুমুচ্ছিলে নাকি ?

এনায়েৎ চোখ মেললে। চট ক'রে একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, ঘুমোব না তো কি করব ?

তিনজনে মই বেয়ে নেমে এলাম। পাঁঠাটা তখনও সমানে চ্যাঁচাচ্ছে। এনায়েৎ তার দড়িটা খুলে হাতে নিলে। মানুষের সাড়া পেতেই তার চ্যাঁচানি থেমে গেল।

আমি বললাম, যা যন্ত্রণা দিয়েছে সারা রাত, চল্, আজ তোকে আমরাই কেটে ভোগে লাগাব।

বাড়িতে আসতেই যতীনবাবুর বাবা বললেন, সারা রাত জেগেছ, আগে চান ক'রে কিছু খেয়ে নাও, তারপর শুয়ে পড়।

আমরা চান করতে গেলাম। চান ক'রে কিছু জল খেয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখি, খানসায়েব স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন। আমরা বললাম, এত ভোরে ?

খানসায়েব বললেন, খবর নিতে এলাম কি হ'ল। বাঘ এল না চারে ?

আমি বললাম, না। অথচ ও ব্যাটা ডিউটি ফাঁকি দেয় নি। সারা রাত যা চেঁচিয়েছে, বাঘ নেহাৎ কালা না হ'লে তার তিন মাইল দূর থেকে শুনতে পাবার কথা।

খানসায়েব একটু হাসলেন। তারপর বললেন, তারপর, আজও যাচ্ছেন তো ?

আমি বললাম, রক্ষে করুন, আমার শখ মিটেছে। আমি আজকেই পালাচ্ছি কলকাতায়।

খানসায়েব একটুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হ'ল, যেন তাঁর চোখের দৃষ্টি বুক ফুঁড়ে আমার মনের মধ্যে পর্যন্ত ঢুকে গেল। তারপর বললেন, কেন ?

'কেন'র কোন জবাব ছিল না। আসল কথা, আমার কেমন বিরক্তি লেগে গিয়েছিল। বেশ বুঝছিলাম, আমাকে অভদ্রায় ধরেছে, এ যাত্রা আর কাজে সুবিধা হবে না। বললাম, এমনিই।

খানসায়েব বললেন, তা হ'লে আজকের দিনটা থেকে যান। শিকার করতে গিয়ে না ক'রে ফিরতে নেই। ওতে স্বভাব হালকা হ'য়ে যায়।

আমি বললাম, কিন্তু আজ গেলেই যে পাব তাকে তার তো কোন ঠিক নেই।

খানসায়েব হেসে বললেন, আছে, আমিই এনে দোব তাকে। আমি বাঘের মন্তর জানি, এনায়েৎ বলে নি আপনাকে ? তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, ভয় নেই, আমিও সঙ্গে থাকব।

আমার অভিমানে বাধল। বললাম, ভয় আমার নেই। কিন্তু সত্যি বলছেন আপনি যাবেন ?

খানসায়েব বললেন, যাব। সেই কথাই বলতে এসেছি। কাল বাঘ পাবেন না আমি জানতাম।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কি ক'রে ?

খানসায়েব বললেন, আছে আছে, বাঘেরা এসে ব'লে যায় আমাকে। বললাম না, আমি মন্তর জানি।

যতীনবাবু বললেন, সত্যি যাবেন আপনি ?

খানসায়েবের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, আমাকে মিথ্যে বলতে দেখেছ কখনও ?

যতীনবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, সে কথা বলি নি। কিন্তু

আপনি তো শিকার ছেড়ে দিয়েছেন জানি, হঠাৎ আবার খেয়াল হ'ল যে ?

খানসায়েব বললেন, হ'ল। নইলে বিদেশী মানুষ, শখ ক'রে এসেছেন, শুধু হাতে ফিরে গেলে দেশের বদনাম হবে না? তারপর জানলা দিয়ে দূরের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কের মত বললেন, শামলীটাকে মেরেছে কাল।

যতীনবাবু বললেন, শামলী মানে? আপনার সেই কালো বাছুরটা ?

খানসায়েব বললেন, হ্যাঁ। আমার ভাগনিকে দিয়েছিলাম। কাল রাতে গোয়ালে ঢুকে মেবে রেখে গেছে।

এমন ক'রে তিনি কথা ক'টা বললেন, যেন তাঁর নিজের মেয়েরই মৃত্যুর কথা বলছেন।

আমরা কেউ কথা কইলাম না। খানসায়েব অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপব মুখ ফিরিয়ে শান্ত গলায় বললেন, এনায়েৎ কোথায়?

যতীনবাবু বললেন, বাড়ির দিকে গেছে বোধ হয়, ডেকে পাঠাচ্ছি। সে যা খুশি হবে শুনে!

খানসায়েব ধীরে ধীরে বললেন, তা হবে।

এনায়েৎকে ডেকে পাঠাতে হ'ল না, সে নিজেই এসে হাজির হ'ল একটু পরে। খানসায়েব শিকারে যাবেন শুনে সে খুশির চোটে আমার পর্যন্ত পায়ের ধূলো নিয়ে ফেললে। বললে, হুজুর, তবে বন্দোবস্ত কবি ?

খানসায়েব বললেন, কর।

এনায়েৎ আনন্দে ডগমগ হয়ে বললে, মাচান তো সাজানোই আছে, খালি আদার একটা ভাল দেখে আনলেই হয়।

পাঁঠাটার ওপর আমি চ'টে গিয়েছিলাম, তার সম্বন্ধে তাই কিছু বললাম না। খানসায়েব বললেন, হ্যাঁ, বাছুর নয়, শূয়োরছানা একটা কিনে নিয়ে আয় ডোমপাড়া থেকে। এনায়েৎ চ'লে গেল।

খানসায়েবও উঠে পড়লেন, বললেন, চলি, রাত্রে আবার দেখা হবে।

রাত দশটায় আবার গিয়ে মাচানে উঠলাম—আমি, খানসায়েব, যতীনবাবু আর এনায়েৎ। এনায়েতের উৎসাহটা মাচান দেখেই বোঝা গেল। কাল ছিল খালি বাঁশের চালা বাঁধা, আজ তার ওপর সে গদি বানিয়েছে, তোষক দিয়ে কাঁথা দিয়ে নরম ক'রে দিয়েছে, যেন বসতে না লাগে। শূয়োরছানাটাকে খোঁটায় বেঁধে দেওয়া হ'ল, তারপর এক মিনিটের মধ্যেই তার চ্যাঁচানি শুরু হ'ল।

বাপ রে, সে কি চ্যাঁচানি! কানের ভেতর যেন ছ্যাঁদা ক'রে ঢুকে যায়! পাঁঠার ডাক এর চাইতে ভাল ছিল। আমি বললাম, জ্বালালে! খানসায়েব আমার উরুতের ওপর আঙুলের চাপ দিয়ে বললেন, চুপ। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মাচানে চড়ার পর এই ক' মিনিটের ভেতর তাঁর চেহারা একদম বদলে গেছে, যেন একেবারে অন্য মানুষ। মাচায় ওঠবার একটু আগেও বেশ হেসে হেসে কথা বলছিলেন, এখন আর তাঁর মধ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। হাতে বন্দুক, ঠোঁট দুটি সরু হয়ে এঁটে বসেছে, নাকের ডগাটা সরু দেখাচ্ছে, সেই অন্ধকারেও দেখছি তাঁর চোখের মণি তীক্ষ্ণ হয়ে জ্ব'লে উঠেছে যেন দুটি হীরের টুকরো, তাতে ধারই আছে শুধু, কোমলতা নেই। সে যেন সেই পাকাদাড়ি খানসায়েব নন, যেন কোন সন্ন্যাসী ধ্যানে বসেছেন, আর কোন দিকে ফিরে তাকাবার মত এক মুহূর্ত সময়ও তাঁর নেই। দেখে বুঝলাম, কিসের জোরে তিনি অতবড় শিকারী হয়েছেন, কিসের জন্য এনায়েৎ তাঁকে দেবতা বানিয়ে পূজো করে। নড়াচড়া ক'রে তাঁর ধ্যান ভেঙে দেবার সাহসই হ'ল না মোটে, মনে মনে তাঁকে প্রণাম ক'রে যেমন ছিলাম ঠায় ব'সে রইলাম। বসবার সময় তাড়াতাড়িতে ডান পাটা বেকায়দায় চেপে ব'সে ছিলাম, কষ্ট হচ্ছিল, তবু একটু ন'ড়ে সেটাকে সোজা ক'রে নিতেও কেমন ভয় হ'ল। ইচ্ছে হ'ল, চুলোয় যাক বাঘ, তাঁর দিকেই তাকিয়ে ব'সে থাকি। ভাগ্যে থাকলে বাঘ অনেক দেখা যাবে, এমন ধ্যানের মূর্তি হয়তো জীবনে আর

দেখতে পাব না। পাছে তাঁর ধ্যান ভাঙে, সেই ভয়ে তাও পারলাম না, জোর ক'রে মুখ ফিরিয়ে অন্ধকার বনের দিকেই চেয়ে রইলাম। ব'সে ব'সে একটা জিনিস বেশ লক্ষ্য করলাম, নার্ভাস টেন্‌শন সেদিনও লাগছে, কিন্তু আগের দিনের মত অতটা নয়। আগের দিনের অভিজ্ঞতার জন্যেই সেটা ক'মে গেল, না খানসায়েব সঙ্গে আছেন ব'লে মনে মনে ভরসা পেলাম ব'লে, কিছুই বুঝলাম না। পরে অবশ্য জেনেছি, ভয় বা নার্ভাস টেন্‌শন যাই বল, সেটা প্রথম প্রথমই জোর হয়, ক্রমে অভ্যাস হয়ে গেলেই কেটে যায়, তারপর আর তার চিহ্নও থাকে না।

শূয়োরছানাটা একভাবেই চ্যাঁচাচ্ছে। আধঘন্টাখানেক পরে হঠাৎ তার চ্যাঁচানি থেমে গেল, বার দুই কুঁই কুঁই ক'রে আওয়াজ করলে, তার পরই একদম চুপচাপ। তখন লক্ষ্য হ'ল, চারদিক আশ্চর্য রকম নিঃঝুম হয়ে গেছে, একটা ফড়িং ওড়ার শব্দ পর্যন্ত হচ্ছে না কোথাও। যতীনবাবুর একখানা হাত নিঃশব্দে আমার গায়ে এসে লাগল। ইঙ্গিত বুঝতে দেরি হ'ল না—বাঘ এসেছে। তখন বুঝলাম, শূয়োর-ছানার চুপ করার মানে কি; বুঝলাম, এনায়েৎ কেন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পেরেছিল কাল—পাঁঠা যতক্ষণ চ্যাঁচাচ্ছে, ততক্ষণ সেও জানতে পারছে, বাঘ ধারে কাছে নেই।

আরও মিনিটখানেক এমনি কাটল। সে এক অদ্ভুত প্রতীক্ষার মুহূর্ত—উত্তেজনায় মনে হ'ল, যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তারপর খানসায়েবের একটি হাত আলগোছে আমার হাতে এসে ঠেকল। তাকিয়ে দেখলাম, বনের কিনারে দুটি মার্বেলের মত আলো স্থির হয়ে আছে। বাঘ! দেখেই গায়ের মধ্যের সমস্ত রক্ত এক ঝলকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার ঘুরে চ'লে এল। আমি বন্দুক তুলে নিলাম। তুলে নিশানা করলাম। দেখলাম, নিশানা করতে পারছি না। ভয়ে নয়, ভয় পাই নি, কিন্তু উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপছে, নিশানা ঠিক হচ্ছে না। তবু প্রাণপণে হাত শক্ত ক'রে বন্দুক তুলে ধরলাম।

ঘোড়া টানতে যাব, এমন সময়ে খানসায়েবের ধ্যান ভাঙল, মুখ ফিরিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমিও তাকালাম। এক সেকেণ্ড মাত্র, সেই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি আমার মনের তলা পর্যন্ত দেখে নিলেন। নিঃশব্দে হাত তুলে আমার বন্দুকসুদ্ধ হাতটাকে একটু ছুঁয়ে দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিলেন, তারপর নিজের বন্দুক তুলে ধরলেন। আর এক সেকেণ্ড, তারপরই খট—দ্রুম ক'রে আওয়াজ। বাঘের তরফ থেকে কিন্তু কোন জবাবই এল না। খালি দেখলাম, সে মার্বেলদুটি আর সেখানে নেই। একবার খালি একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম, যেন মাটির ওপর কে কি ঘষছে। তারপর সব চুপচাপ।

বন্দুকের আওয়াজ হতে না হতে আরেকটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। এনায়েৎ 'আল্লা' ব'লে হাঁক দিয়ে বল্লম হাতে মাচা থেকে লাফিয়ে পড়ল। প'ড়ে একেবারে এক দৌড়ে যেখানে বাঘের চোখদুটো জ্বলছিল, সেই দিকে ছুটে গেল। যতীনবাবু ডাকলেন, এই! এনায়েৎ জবাব দিলে না। আমার সঙ্গে টর্চ ছিল, আমি টর্চ জ্বাললাম। তার আলোতে দেখলাম, এনায়েৎ মরা বাঘের একটা পা ধ'রে টানাটানি করছে। আমরা সবাই মাচান থেকে নেবে এলাম। যতীনবাবু বললেন, না দেখেশুনে অমন ক'রে লাফিয়ে পড়লে তুমি, বাঘ যদি জ্যান্ত থাকত?

এনায়েৎ ভ্রূক্ষেপও করলে না, বেশ সহজভাবেই বললে, হুজুর গুলি ছুঁড়লে বাঘ জ্যান্ত থাকে না।

খানসায়েব বললেন, নে নে, হয়েছে। এখন বাড়ি চল্, হিম লাগছে।

আমি বললাম, বাঘটা?

খানসায়েব বললেন, ও আর এই রাত্রে কি হবে! থাক প'ড়ে, কাল সকালে নেওয়ানো যাবে। বাঘকে কেউ ছোঁবে না।

বাঘের কাছে গিয়ে টর্চ জ্বেলে তাকে দেখলাম। বন্দুকের গুলি ঠিক দুই চোখের মাঝখানে বিঁধেছে, ঢুকে মাথাটাকে সুদ্ধু ফাটিয়ে

চৌচির ক'রে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মেপে দেখলাম, ঠিক সাড়ে ছ' হাত হ'ল। এনায়েতের নজরের বাহাদুরি বলতে হবে।

বাঘকে সেইখানে ফেলে রেখে আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম। শূয়োরছানাটাকে খালি খুলে নিয়ে এলাম। ওখানে রেখে এলে শেয়ালে মেরে ফেলবে।

খানসায়েবের বাড়ি পার হয়ে তবে এ বাড়িতে আসতে হয়। বাড়ির সামনে এসে খানসায়েব থামলেন, বললেন, আমি তবে এবার বিদায় নিই। আপনি কবে যাবেন ?

আমি বললাম, কাল ভোরেই। আপনার সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না।

খানসায়েব শান্তস্বরে বললেন, খোদার যদি ইচ্ছে থাকে, হবেই আবার। তারপর আমার হাত দুটি ধ'রে বললেন, বুড়োকে মনে থাকবে তো ?

আমি বললাম, নিশ্চয় !

খানসায়েব একটু হাসলেন, বললেন, অত জোর ক'রে বলতে নেই কথা।

আমি বললাম, একশো বার বলব। আজ যা দেখলাম, তাতে আপনাকে শিকারের গুরু ব'লে স্বীকার করতে পেলে ধন্য হয়ে যাব আমি।

খানসায়েব বললেন, সে কি কথা ! আপনাদের নতুন বয়স, কত সায়েব-সুবোর সঙ্গে কারবার মেলামেশা—আমার চাইতে ঢের বড় বড় গুরু পাবেন আপনি। আর গুরুতে কিচ্ছু হয় না এতে, এর জন্যে চাই নিজের সাধনা। বুড়োর এই কথাটি মনে রাখবেন, আখেরে কাজ দেবে। তারপর একটু থেমে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, একটি কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে ?

আমি বললাম, বিলক্ষণ, অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ?

খানসায়েব বললেন, বুড়োদের কথা মিষ্টি হয় না কিনা ! আপনার

এই প্রথম বাঘ মারা, নয় ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

খানসায়েব বললেন, বড় বাঘ মারতে আর যানও নি কখনও ?

আমি বললাম, না।

খানসায়েব বললেন, তা হ'লে আমার একটি উপদেশ শুনে রাখুন, খুব ভাল ক'রে সব না জেনেশুনে এ খেলা খেলতে যাবেন না। এ বড় বিপদের খেলা। আজই আমি না সঙ্গে থাকলে মারা পড়তেন, সেটা টের পেয়েছেন ?

আমি বললাম, পেয়েছি। কিন্তু সত্যি, কেন এমন হ'ল বুঝলাম না। মনে ভয় নেই, অথচ হাত কাঁপছে—এরকম হয় জানা ছিল না।

খানসায়েব বললেন, ওটা হয় নার্ভাস টেন্‌শনের ফলে, আবার একটু অভ্যাস হ'লেই কেটে যায়। ওতে দ'মে যাবার কিছু নেই, নার্ভ আপনার ভাল আছে, যা দেখলাম।

আমি বললাম, কিন্তু কাল বাঘ এলে তো বিপদে পড়তাম দেখছি।

খানসায়েব বললেন, পড়তেন না। বাঘ কাল আসতই না।

আমি বললাম, তা বটে, বাঘ কাল অন্য জায়গায় ছিল। কিন্তু নাও তো থাকতে পারত ?

খানসায়েব হেসে বললেন, তার জন্যে নয়। রয়াল বেঙ্গল পাঁঠা খায় না, গন্ধ পায়। ও খায় গোবাঘারা।

যতীনবাবু বললেন, তার মানে ? এনায়েৎ জানত না এ কথা ?

এনায়েৎ জবাব দিলে না। খানসায়েব বললেন, এই বাঁদর, জেনে-শুনে ইচ্ছে ক'রে পাঁঠা কিনেছিলি তুই ?

এনায়েৎ তাঁর দিকে পিছন ক'রে দাঁড়ালে। বিড়বিড় ক'রে বললে, জানলে কি হবে, যা ধমকের চোট! ভাবলাম, হবেও বা, কলকাতায় হয়তো বাঘেরা পাঁঠাই খাচ্ছে আজকাল।

কথা বলবার মত মুখ ছিল না। বললাম, তা হ'লে যাই এবার, খানসায়েব ?

খানসায়েব বললেন, যাই বলে না, আসুন।

আমি হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। খানসায়েব আমাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধ'রে, তক্ষুনি আবার ছেড়ে দিয়ে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন, আর পেছন ফিরে তাকালেন না পর্যন্ত। যতীনবাবু বললেন, ছেলে মারা গিয়ে অবধি খানসায়েব কেমন যেন হ'য়ে গেছেন।

আমরা বলিলাম, তারপর ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, তারপর আর কি! বাড়ি ফিরে এলাম, এনায়েৎ তার বাড়ি চ'লে গেল। ভোরবেলা লোকজন পাঠিয়ে বাঘকে নিয়ে এসে চামড়া খোলা হ'ল। গাঁয়ের লোকে তার দাঁত, নখ, চর্বি সব নিয়ে গেল। সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে সেই দিনই কলকাতায় রওনা হলাম, পরদিন এসে অফিস করলাম।

আমরা নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইলাম। কান্তি চৌধুরী বলিলেন, কি, হ'ল কি, বল না শুনি ?

আমরা ইতস্তত করিয়া বলিলাম, ধ্যেৎ, এটা যেন কি রকম—

কান্তি চৌধুরী বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, শুনতে ভাল হ'ল না, এই তো ?

আমরা মরিয়া হইয়া বলিলাম, আপনার আগের গল্পগুলোয় যেমন একটা বেশ মজার ইয়ে থাকত—

কান্তি চৌধুরীর মুখভঙ্গী আরও বিকট হইল। বলিলেন, এটাতে তেমন মজার ইয়ে নেই, না ? কি শুনতে আস সব, জিজ্ঞেস করি, শিকার, না মজার প্যাঁচ ? যত বেল্লিকের দল! যা পালাঃ, হনুমানদের আমি গল্প বলি না।

আমরা পলাইয়া আসিলাম।